শিল্পরূপময় বাঁকুড়া

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৯১

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ
প্রবীর সেন

প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ
ওয়েলনোন প্রিন্টার্স
কলকাতা ৯

মুদ্রাকর
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২ বিডন রো
কলকাতা ৬

অতীতের
'সজল ছায়া'র বাসিন্দা
কবি ও সহকর্মী
আনন্দ বাগচী
শ্রীকরকমলে

নিবেদন

শিল্পের এক রূপ যেমন রঙে ও রেখায়, তেমনি আর এক রূপ সুরে ও তালে। শিল্পের রূপ যেমন মাটি পুড়িয়ে মন্দির টেরাকোটায়, তেমনি পাঁচমুড়ার ঘোড়ায়। বিভিন্ন স্থানের মেলাও এক বিশেষ শিল্পরূপ। মানবমিলনের বিশেষ চরিত্ররূপ এক-একটি মেলায় দেখা যায়। কুম্ভমেলা, সাগরমেলা, জয়দেবকেঁদুলি মেলা, তারকেশ্বর গাজনমেলা রূপে রূপে ভিন্ন ভিন্ন এবং শিল্প। শব্দ ও অর্থ সাজিয়ে তেমনি শিল্পরূপের আর এক বিচিত্রতা। পত্র-পত্রিকার বৈচিত্র্যেও বাঁকুড়া সমৃদ্ধ।

বাঁকুড়া জেলার পথে বিপথে গ্রামেগঞ্জে এমনি কত রূপময়তা ছড়িয়ে আছে। দেখতে দেখতে জানতে জানতে কলম হাতে নিয়েছি। কিছু লিখেছি। বেশ কিছু এখনো লেখা হয়নি। বাঁকুড়াকে ভালোবেসেছি। রূপে ও স্বরূপে রূপময় বাঁকুড়াকে। এই গ্রন্থেও রইলো সেই ভালোবাসার স্বাক্ষর। আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি বাঁকুড়া অনন্ত রূপময়ী। যাঁরা বাঁকুড়াকে ভালোবেসে দেখতে চাইবেন তাঁদের কাছেই এই গ্রন্থ পৌঁছে দিতে চাই।

গবেষণার বিধিনির্ধারিত শুষ্ক নিয়ম হয়তো সর্বক্ষেত্রে মান্য করা হয়নি। নতুন কোন আবিষ্কারের সূত্র তুলে ধরার ইচ্ছাও আমার নেই। আমি শুধু জানতে চেয়েছি এবং জানাতে চেয়েছি।

প্রতিটি প্রবন্ধ পড়বার সময় প্রথমেই দেখে নিতে হবে কত সালে প্রকাশিত হয়েছে প্রবন্ধটি। বিংশ শতাব্দীর সাত ও আটের দশক জুড়ে বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা বহমান, তাই আমাদের প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্যের পরেও নতুন তথ্য এসে গেছে অনেক ক্ষেত্রে। যথা-সম্ভব পাদটীকায় সেইসব নতুন তথ্যসংবাদ যোজনা করা হয়েছে, মূল প্রবন্ধের কাঠামো না ভেঙে।

কোন কোন বিষয়ে আলোচনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। একই বিষয় সূত্রাকারে কখনো এসেছে, কখনো সেই সূত্রকে বিশদ আলোচনার সামগ্রী করা হয়েছে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে।

কিছু কিছু বাক্যনির্মাণে 'বাঁকুড়ি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বিষয় বর্ণনারই প্রয়োজনে।

যেসব পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, সেইসব পত্র-পত্রিকার সম্পাদককে শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাই। ডঃ পল্লব সেনগুপ্তর প্রেরণা ও আমার স্ত্রীর সহযোগিতা অবিস্মরণীয় হয়ে রইলো এই গ্রন্থের সঙ্গে। যেসব ছাত্রছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ী এইসব প্রবন্ধ রচনায় ও ক্ষেত্রগবেষণায় সাহায্য করেছেন, তাঁদেরও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। অনুপকুমার মাহিন্দারকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ (বাঁকুড়া) আমার নেপথ্য প্রেরণা, তাঁদের জন্য আমার শ্রদ্ধা। আলোকচিত্র তুলে দিয়েছেন পার্থ কুণ্ডু, অনুপ গাঙ্গুলী এবং সুনীতি মান্না। এঁদের ভালোবাসা জানাই।

বাংলা বিভাগ
খৃস্টান কলেজ বাঁকুড়া

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

দু-একটি কথা, বই শুরু করার আগে

বন্ধুবর অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ সামন্ত মাঝে-মাঝেই বাঁকুড়া জেলাকে তাঁর দ্বিতীয়-জন্মভূমি হিশেবে বলে থাকেন। এ কথা শুধুমাত্র মুখের নয়—একান্তভাবেই আন্তরিক। সেই ধাত্রীমাতার ঋণ শোধ নয়, স্বীকার করার আবেগেই রবীন একের-পর-এক বই লিখে চলেছেন বাঁকুড়ার জীবন এবং সংস্কৃতি নিয়ে। যতদূর মনে হচ্ছে এটি তাঁর এই ধারায় তৃতীয় বই (না-কি চতুর্থ ?)—আগের বইগুলির মধ্যে 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা' তো সাহিত্য-শিল্পের রসিকদের কাছে বিশেষভাবেই সুখ্যাত এবং সমাদৃত হয়েছে।

রবীনের বিশেষ পরিচয়: তিনি কবি, গবেষক, সাহিত্যের অধ্যাপক এবং লোকসংস্কৃতিবিদ্‌ও। এদের মধ্যে কোন্‌টি যে তাঁর মুখ্য আর কোন্‌গুলি গৌণ তা গত তিরিশ বছরেও বুঝে উঠতে পারা যায়নি। নিজে লোকসংস্কৃতির এলাকার আশেপাশে উৎসুক, অপটু পদক্ষেপে ঘোরাফেরা করি বলেই হয়ত, রবীনকে ফোকলোরিস্ট হিশেবেই ভাবতে বেশি ভাল লাগে। বলা বাহুল্য এই বইয়ের সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে এক স্থিতধী, সন্ধিৎসু এবং বিদগ্ধ লোকসংস্কৃতিবেত্তার অম্বিষ্ট ক্ষেত্রসমীক্ষণের লব্ধফল। বাইশটি নিবন্ধের মধ্যে মাত্র চারটি বাদে আর সব কটিই এই পর্যায়ের অন্তর্গত প্রত্যক্ষে, অথবা পরোক্ষে। লোকজীবনের কৃষ্টিকলার বিচিত্র সব-ধারাগুলিতেই তাঁর সমান উৎসাহ এবং অনুধ্যান—তা সে পরকুলের মেলায় শোনা রঙের (অর্থাৎ প্রেমের) গানই হোক, কিংবা ভাদুগানের কল্পনায়-বাস্তবে মেশামেশি হোক, বা টেরাকোটাই হোক, লৌকিক দেবতাদের সুখদুঃখের দুনিয়াই হোক অথবা মন্ত্রযান, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, যা-ই কিছু হোক না কেন! পুরাতত্ত্ব এবং পুরাণবৃত্তেও রবীনের অধিকার অনায়াস, তারও প্রমাণ রেখেছেন তিনি এই বইয়ের মধ্যে।

সব দিক থেকেই এই বইয়ের মধ্যে যে-জিনিষটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হল তন্নিষ্ঠ একটি মনের সামগ্রিক প্রকাশ। রবীন গ্রামে-গ্রামে ঘুরেছেন, এক মেলা থেকে আরেক মেলায় গেছেন, লোকশিল্পীদের সঙ্গে মিশেছেন একান্ত আপনজনের মতো—নিজের অভিজ্ঞতাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করে তুলেছেন—এবং সেটিকে কবিতার মতো ঝকঝকে ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন এক একটি নিবন্ধের মধ্যে। 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা' বইতে যে-বিরাট কাজের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল, এই বইতে তারই দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুবর্তন ঘটেছে।

সম্প্রতিকালে, শিল্প-সংস্কৃতির অমূল্য ঋক্‌থে সমৃদ্ধ বাঁকুড়া জেলার কৃষ্টিকলার নানান দিক নিয়ে সুকৃতী গবেষকরা অত্যন্ত মহার্ঘ কিছু বই-প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন। সুপ্রবীণ পণ্ডিত মাণিকলাল সিংহ, ড. শান্তি সিংহ, ড. নমিতা মণ্ডল, ড. পঙ্কজকুমার সাহা, শ্রীশৈলেন দাস প্রমুখ গুণীজনেরা নানান্‌ভাবে বাঁকুড়ার ঐতিহ্যকে যথার্থ মর্যাদায় মূল্যায়িত করছেন। এই বিদ্বৎসভার অন্যতম অগ্রগণ্য সভ্য রবীনও। আজকে, জ্ঞানচর্চার জগতে 'একক' কথাটা ইংরেজি 'অ্যালোন' অর্থে সব দেশেই বর্জিত, আর সর্বত্রই 'ইউনিট' অর্থে

সেটি গৃহীত। সংস্কৃতিচর্যার এই বিশেষ ক্ষেত্রটিও এই বিশ্বজনীন সাম্প্রতিক-রীতির বাইরে নয়: রবীনও তা মনে করেননি, এই বইয়ের প্রায় সর্বত্রই যৌথ-অন্বেষণের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখিত, লেখকের য়ুথ-মনস্কতার প্রত্যক্ষ পরিচায়িকা হিশেবেই। তাঁর মতো একজন খাঁটি লোকসংস্কৃতিবিদের পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক।

বাঁকুড়া জেলার শিল্প-সংস্কৃতির একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। একই সঙ্গে আদিবাসী, লৌকিক এবং ধ্রুবপদী সংস্কৃতির এমন মেলবন্ধন, অন্যত্র অপ্রাপ্য বললেই হয়! শুশুনিয়া পাহাড়ের রাজা চন্দ্রবর্মার লিপি থেকে যামিনী রায়ের ছবি অবধি, বিষ্ণুপুরের ঘরানার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে টুসুর চৌদোল ভাসানোর গান পর্যন্ত, পাঁচমুড়ার মাটির ঘোড়া থেকে আবার ঐ বিষ্ণুপুরেরই দশাবতার তাস ইস্তক—অজস্র প্রকরণে এবং উপকরণে বাঁকুড়ার শিল্পরূপের ঋদ্ধি। রবীন এই বইতে—এবং তাঁর আগের বইগুলিতেও—সেই রূপময় ঐতিহ্যকে শব্দচিত্রে এঁকেছেন সার্থক এবং সফল প্রয়াসে।

রবীন, প্রখ্যাত গবেষক এবং সুখ্যাত লেখক। তাঁর বইয়ের কোনো পরিচায়িকা বা ভূমিকার প্রয়োজন থাকেনা। তবুও সেই 'অপ্রয়োজনীয়' কাজটুকু যে এভাবে করতে হলই, তার অন্তরীক্ষে রয়েছে তিন দশক-জোড়া এই এক অনাবিল সম্প্রীতির সম্পর্ক! …এই মুখবন্ধটুকু নেহাৎই অঙ্গসজ্জার উপকরণ। এটা না-থাকলেও কিন্তু এই বইয়ের স্বীকৃতি এবং সমৃদ্ধির খামতি ঘটত না যে, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত!

প্রকাশকের নিবেদন

বাঁকুড়া বিষয়ক, বাঁকুড়ার সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্পকলা বিষয়ক 'তুষুব্রত ও গীতিসমীক্ষা', 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা', 'শিল্পী মানুষ যামিনী রায়' গ্রন্থগুলি আমাদের প্রকাশসংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল পর পর। বর্তমান, বাঁকুড়া বিষয়ক চতুর্থ গ্রন্থটিও, আশা করি, সুধীজন ও পাঠকপাঠিকাদের সমাদর লাভ করবে। লেখক দীর্ঘ তেইশ বছর বাঁকুড়ার সঙ্গে যোগ রেখে চলেছেন। চিরকালীন ভাদু-টুসুর জগৎ থেকে আধুনিক কবিতার জগৎ পর্যন্ত লেখকের অধিগমন। রূপাই সামন্ত ছদ্মনামে তিনি নিজেই কবি। কবি ও গবেষকের সহাবস্থান ঘটেছে তাঁর রচনায়। নিছক তথ্যভারাক্রান্ত গবেষণা নয়, সুন্দরকে সুন্দরের চোখ দিয়েও দেখতে চেয়েছেন তিনি। ভালোবাসা ও শ্রম, এই দুয়ের মেলবন্ধনেই তাঁর রচনাকর্ম। তাঁর আশা, বাঁকুড়া-তথা-রাঢ়ের সংস্কৃতি বিষয়ে আরও কিছু কাজ তিনি ধীরে ধীরে করতে পারবেন। তাঁর সংকল্প পূর্ণতা পাবে, এই কামনা করি।

এই লেখকের অন্যান্য বই :

ইছামতী ও বিভূতিমানস
বনফুলের শ্রীমধুসূদন ও অন্যান্য প্রবন্ধ
প্রবন্ধ রত্নাবলী [সত্যেন্দ্রনাথ,
আধুনিক কবিতা, নবজাতক]
রবীন্দ্রনাথের মালঞ্চ
রবীন্দ্রপ্রতিভায় নিসর্গপ্রকৃতি ও শিল্পকলা
তুষুব্রত ও গীতিসমীক্ষা
বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা
শিল্পী মানুষ যামিনী রায়
রবীন্দ্রকাব্যে ফুল
রবীন্দ্রনাথ ও নদী
জীবনানন্দ প্রতিভা
বৃক্ষপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

রূপাই সামন্তর কবিতা গ্রন্থ :

প্রথম মুখ
ঘরে ভালোবাসার পাখি
ব্যথিত সময়
মুহূর্তের পাপড়ি
শুধু কবিতায় আছি
আমাকে সৌভাগ্য দাও
কিছু কথা কিছু নীরবতা

সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ :

বাংলা আমার বাংলাদেশ
আমি ফুল ভালোবাসি
কবিতার নারী

সূচিপত্র

মাতৃতীর্থ জয়রামবাটী

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের মতো বাঁকুড়া জেলাতেও সম্ভব হয়েছে বহু তীর্থ। পাগল হরনাথ বা শ্রীনিবাস আচার্য এমনই দুই তীর্থপতি। জনপদের মাঝে মাঝে খ্যাত তীর্থস্থানগুলি মানব পরিধির মধ্যে দেবসত্তার মতো মূর্ত। গৃহে ও আঙিনায় নিত্য ক্ষুধা-তৃষ্ণা জন্ম-মৃত্যুর পালা আর দেবস্থান ও তীর্থস্থানে অমৃত আস্বাদনের লীলা। জনপদ না হলে তীর্থস্থান ব্যর্থ, তীর্থস্থান না থাকলে জনপদ নিতান্তই স্থূল। দূর হিমালয়ের গহনপ্রান্তে যেসব তীর্থস্থান আছে সে সব স্থানে মানব পদধ্বনি না বাজলে আরতি ঘণ্টাধ্বনি পূজা ও আচারের কোন অর্থ হয় না। দেবতা রচনা করেন দূরত্ব, সাধক রচনা করেন দূরত্ব, কিন্তু তীর্থযাত্রী সাধারণ মানুষের কাজ সেই দূরত্বের বাধাকে অতিক্রম করে নিকটত্ব সৃষ্টি করা। অবতারতত্ত্বের মধ্যেও সেই একই সত্য। অবতার একাধারে দূরত্ব ও নিকটত্বের ব্যঞ্জনা বহন করছে। আব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত অনোরণীয়ান মহতোমহীয়ান অদৃশ্য অভেদ্য পরম সত্তা যখন সংহত হয়ে দেহধারণ করেন তখন মানব সমাজে দেখা দেন অবতার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই-রকম অবতার। বাংলার গ্রামীণ গৃহে তাঁর জন্ম, আধুনিক কলকাতা সীমায় তাঁর সাধন পীঠ, মানব পরিধির মধ্যেই তাঁর লীলাপ্রকরণ। তিনি যে নারীকে সহধর্মিণী-রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তিনিই বা কম কি? তিনি রামকৃষ্ণ শক্তির আধার ও উৎস। তিনি পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বাত্মময়ী, বিশ্বজননীও বটে। তাঁর জন্ম বাঁকুড়া জেলার পূর্বপ্রান্তে জয়রামবাটী নামে এক নগণ্য গ্রামে। বাঁকুড়া জেলার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে হুগলী জেলার সন্নিকটস্থ এই গ্রাম ও গ্রামাঞ্চল, বাঁকুড়ার অন্যান্য স্থানের মতো লাল কাঁকুরে মাটির উচ্চাবচ গঠনে গঠিত নয়। সমতল, শ্বেত ও উর্বর এই ভূমিভাগ একাধারে পেটের অন্ন ও প্রাণের অন্ন বিতরণ করছে। অন্নরস ও ভক্তিরস দুয়েরই এমন সহযোগ খুব বেশী দেখা যায় না। শ্রীশ্রীসারদামণির এই স্থানে যেতে হলে কলকাতা বা বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর থেকে বাসে করে যাওয়া যায়, সরাসরি ট্রেনের কোন যোগ নেই।

ক্ষুদ্র পরিসর অথচ ভাবদ্যোতনায় বিশাল এই মহাতীর্থে যেখানে বাস থেকে নেমে মাটিতে পা দেবেন, সেখানেই দেখতে পাবেন সুদীর্ঘ আয়তাকার কালো জল ছলছল দীর্ঘ জলাশয়। নাম 'মায়ের দীঘি'। ক্লান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর হয়ে যায় শুধু দর্শনেই। এই পুণ্যবারি মাথায় নিয়ে হাতমুখ প্রক্ষালন করে অগ্রসর হতে হবে পাড়ার মধ্যে। সারদা মায়ের পৈত্রিক ভিটা আজও অটুট আছে। খুবই অল্প বয়সে সারদা মায়ের বিবাহ হয়েছিল ৩/৪ মাইল দূরবর্তী হুগলী জেলার কামারপুকুর

গ্রামের গদাধর ঠাকুরের সঙ্গে। জয়রামবাটী ছেড়ে মা গেলেন কামারপুকুর। সেখান থেকে রানী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি। ঠাকুরের তিরোধানের পর তিনি প্রথমে কামারপুকুরে তারপর জয়রামবাটীতে ফিরে এলেন। রইলেন এখানেই আমৃত্যু ভায়েদের সংসারে। মা সারদা যে দুটি গৃহে জীবনযাপন করেছেন তার একটি প্রাচীন, অন্যটি অর্বাচীন কালের। প্রাচীন গৃহটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন বাড়ী। আনুমানিক ১২৭০ সাল হইতে ১৩২২ সাল পর্যন্ত ইং ১৮৬৩ সাল হইতে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত, প্রায় বাহান্ন বৎসর কাল এই ঘরখানিতে শ্রীশ্রীমা বসবাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বহু সন্তানকে মহামন্ত্র, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি দানে কৃপা করিয়াছিলেন।" বাড়িটি এখন ভগ্ন, আমরা দেখে এলাম পুনঃসংস্কারের কাজ চলছে। এরই অদূরে আছে নূতনকালের বাড়িটি। তীর্থযাত্রী অবশ্য নূতন বাড়িটি আগে দেখতে পারেন। তারপর পুরাতন বাড়িতে যাবেন। এই নতুন বাড়িটিতে ১৯১৬ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মা বসবাস করেছেন। প্রচুর ভক্ত সমাগমে স্থানাভাব হওয়ায় স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এই নতুন বাড়িটি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। খড়ের চার চালের ঘর, উঠানে ঢুকেই বামদিকের ঘরটি বেশ বড়, বেশ সাজানো বাইরের দেওয়ালে চতুর্মুখ শিব, জগদ্ধাত্রী, রামসীতা প্রভৃতি দেবদেবীর ছবি টাঙানো। ঘরের মধ্যে শীতল অন্ধকার ও পুরানো আসবাবপত্র। ওপাশে মায়ের রান্নাঘর: শ্রীশ্রীমায়ের পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভিটা এবং তাঁর চার পুত্রের ঘরবাড়ি এখনও আছে। যেমন হয় পাড়াগাঁয়ের মাটির ঘরবাড়ি তেমনি। মেজ ভাই ৺কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের দুকুঠরী বাড়িতে থাকাকালীন মা এখানে জগদ্ধাত্রী পূজা করতেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেবকে দেওয়া একটি গোপাল বিগ্রহ একটি ঘরে রাখা আছে। ইদানিং একটি প্রশস্ত রাস্তা পাড়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে, তার ফলে বাসস্ট্যাণ্ড থেকে মায়ের মন্দিরে যাওয়ার খুবই সুবিধে হয়েছে। প্রাচীন পাড়ার একপ্রান্তে রামকৃষ্ণ মিশন নির্মিত নব মাতৃমন্দির।

এখানে এসেই তীর্থপথিকের এতক্ষণের আগ্রহ উৎসাহ আগমনশ্রমের শান্তি। কারণ এখন পুণ্যার্থী ভক্ত এসে পেঁছেছেন। পরম দৃশ্যের সম্মুখে, পরম প্রাপ্তির লগ্নে। নবনির্মিত এই মাতৃমন্দির তিনটি অংশে বিভক্ত প্রথমে নাটমণ্ডপ, তারপর গর্ভগৃহ, শেষ অংশে বাসগৃহ। একই সমতল ছাদের নীচে মন্দিরের এই তিন অংশ। অবশ্য গর্ভগৃহের স্থাপত্যঅংশ লক্ষণীয়; মন্দিরটি বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য মন্দিরের মতো রীতিসম্মত চালামন্দির বা রত্নমন্দির নয়, রেখদেউলও নয়। একটি সমতল আয়তাকার ছাদের উপর একটি বৃহৎ গম্বুজ। ঐ গম্বুজ অংশের নীচেই গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের একটি ধনুক বাঁকানো আর্চের সঙ্গে একটি বেদী নির্মাণ করা হয়েছে; বেদীর উপর শ্বেতপাথরের সহস্রদল শ্বেতপদ্ম, তার উপর স্ফটিকনির্মিত পূর্ণাবয়ব শুভ্রবর্ণা মাতৃমূর্তি। উপবিষ্ট মন্ত্রজপভঙ্গিমা। দেখলাম পরণে তাঁর চওড়া টকটকে লালপাড় শাড়ি, অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে মা যেন জীবন্ত। শান্ত এক

সৌন্দর্যময় আভায় ভরে আছে ঘর। বেদীতে মায়ের পাদমূলে রক্তজবা, রক্তাশোক, শ্বেতচন্দনবর্ণ কাঠচাঁপা ফুল দিয়ে অর্ঘ নিবেদন করেছেন মাতৃভক্ত সন্ন্যাসী পূজারী। ঐ গর্ভগৃহের বামদিকের কুলঙ্গীতে আছে একটি বালগোপাল মূর্তি। নাটমণ্ডপের ডানপাশে রামসীতা ও ভক্ত হনুমানের ফটো সাজানো আছে সুন্দর করে। এখানেও নিত্য পূজাপুষ্প দেওয়া হয়। উর্ধ্বভাগে দেওয়ালের চারপাশে ঠাকুরের ও মায়ের সন্ন্যাসী শিষ্যদের ছবি টাঙানো। একটি তাম্রনির্মিত বৃহৎ বৃত্তাকার ঝাঁঝঘণ্টা ঝুলছে, সিলিং থেকে ঝাড়লণ্ঠন। সামনে 'পুণ্যিপুকুর', আমগাছ, পাশে ফুলের বাগান, মঠের খামার বাড়ি—গম ঝাড়াই হচ্ছে গম ঝাড়াই কলে। ওপাশে একটি নলকূপ থেকে সব সময় জল পড়ছে। আশ্চর্য!

মাতৃমন্দিরের দেওয়ালে লেখা আছে "নীরবতা পালন করুন।" ভক্তরা নীরবে করুণাময়ী মায়ের সামনে বসে আছেন। এই মন্দিরটি সম্বন্ধে জানানো হয়েছে—"শ্রীশ্রী সারদা মায়ের পিতার আদি বাস্তুভিটায় এই মন্দির ৬ই বৈশাখ ১৩৩০ সালে (২৯শে এপ্রিল ১৯২৩) বৃহস্পতিবার অক্ষয় তৃতীয়ায় স্বামী সারদানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠা করেন। গর্ভমন্দিরে মা যেখানে বসে আছেন সেখানেই ৮ই পৌষ ১২৬০ সালে (২২শে ডিসেম্বর ১৮৫৩) বৃহস্পতিবার মায়ের জন্ম হয়। এই স্থানেই সম্ভবত বৈশাখের শেষ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ১২৬৬ সালে (মে ১৮৫৯) মায়ের বিবাহ হয়েছিল। মা ৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই বাড়ীতে বাস করেছিলেন।"

মাতৃমন্দিরের সম্মুখে পুণ্যিপুকুরের কিনারে একটি দুকুঠরী খড়ের ঘর। তার একটিতে শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃবংশের কুলদেবতারা আছেন। আছেন কূর্মাকৃতি কালো পাথরের ধর্মরাজ 'সুন্দরনারায়ণ ধর্মঠাকুর জীউ' এবং পাথরের তিনটি মুখ 'দেবী শীতলা'। কোণের দিকে আর একটি মাকড়া পাথরের দেবীমুখ। এঁদের কুলদেবতা কেন এই লৌকিক দেবতা, কেন কালী বা বিষ্ণু নয়—এই রকম সব সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি দেয়।

মন্দিরের অন্য পাশে পুস্তক বিপণি। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, অভেদানন্দ, প্রজ্ঞানানন্দ, শংকরীপ্রসাদ প্রভৃতির বই এখানে পাওয়া যায়। তরুণ কৃষ্ণবর্ণ অপূর্ব সুন্দর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আলাপ করে বই কেনার সুযোগ পাবেন।

গৃহী ও সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও পরিবার-পরিজন, দেবমন্দির ও সংসারগৃহ এমন ঘেঁষাঘেঁষি রেষারেষি করে একস্থানে সমবেত হয়েছে—যা অন্যত্র দেখা যায় না। এখানের গৃহীরা যে এখানের সন্ন্যাসীদের পরিপূরক! এ যে মাতৃমন্দির—তাই গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলেই তাঁর কৃপাকরুণা লাভ করতে সমবেত হয়েছেন। যে-কোন ভক্ত দর্শক ধন্য হবেন এই অপার সহজ করুণাকণা লাভ করে॥*

বাঁকুড়া হিতৈষী। ১৩৮৮

---

* সম্প্রতি এখানেই গড়ে উঠেছে 'বিবেকানন্দ মঠ ও মিশন'। গড়ে উঠেছে মানবসেবার পরিকল্পনা নিয়ে।

লৌকিক দেবদেবীদের ঘরসংসার

তপ্ত দুপুর। রাঢ় বাঁকুড়ার খরা। পায়ের তলায় লাল মোরামের মসমসে রাস্তা। চলেছি ধরাপাটের মন্দির দর্শনে। দেববিগ্রহ নয়, ঔৎসুক্য মন্দিরের কারুকাজে, মন্দির স্থাপত্যে। বহু মন্দিরের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকাও যে উপাসনা। সঙ্গে আছে একটি নওল কিশোর। বাঁকুড়ার ছা। খ্রিশ্চান কলেজের ছাত্র। কানঢাকা দোদুল চুল। লম্বা চওড়া গড়ন পেটন। আবলুস কাঠের মতো কালো। যেন কালকেতুর আধুনিক সংস্করণ। একটি মেটে বাড়ির আনাচে কানাচে চোখ যাচ্ছে। খুঁজছি কাকেও না কাকেও। একটু জিজ্ঞাসা পত্তর করতে চাই। ঠিক চলেছি তো! 'ও বাবারা, কুথা যাবেক বটে?' প্রশ্ন ছুটে এলো মেয়েলি কণ্ঠে। বললাম—যাবো ধরাপাট মন্দির দেখতে। 'তা যাও বেনে—সিধা চলে যাও, হু-ই হোথা ন্যাংটা শ্যামচাঁদের মন্দির বটে।' চমকে উঠলাম শুনে। যাচ্ছি বইপত্র পড়ে ধরাপাটের পাথরের রেখদেউল দেখতে। আর বুড়ি বলে কিনা ন্যাংটা শ্যামচাঁদের মন্দির! শ্যামচাঁদ আবার ন্যাংটা হয় নাকি!! বৃন্দাবন-ভাবরসে পুষ্ট মন ক্ষুব্ধ হলো।

মন্দিরে পৌঁছে দেখলাম সুউচ্চ মন্দির। দুপাশে মন্দিরগাত্রে প্রোথিত দুটি জৈন তীর্থংকর মূর্তি। একটি প্রমাণ সাইজের। উঁচু হয়ে হাত বাড়ালে পা ছোঁওয়া যায়। পায়ে সিঁদুর মাখানো। নগ্ন অর্থাৎ দিগম্বর জৈন দেবতা হয়ে গেছেন ন্যাংটা শ্যামচাঁদ। দেহাতি মেয়েদের ভক্তিনত ভাবনায়। ঐ শ্যামচাঁদের কাছে এয়োতি মেয়েরা পুত্র কামনা করে। মানত করে। কামনা পূর্ণ হলে পুজো দেয়, ভোগ যাগের ব্যবস্থা ক'রে এখানে এসে। এমনি করেই জন্ম হয় লৌকিক দেবদেবীর।

বাঁকুড়ার ঠুংরা মাটিতে কোদাল চলে না। গাঁইতি বাজে ঠং। সেই কারণেই নাকি এই দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর দেশে গ্রামনামে 'ড়'-এর আধিক্য। বাঁকুড়া, হাড়মাসড়া, ভালডাংরা, গড়াবাড়ি, বিবড়দা, অড়সা, কড়রা, পাথরচাপুড়ি, পাঁড়াবনি প্রভৃতি নামেই তার প্রমাণ। হাড়মাসড়া নামের ধ্বনিময়তা আমাকে টানে। বাস থেকে নেমে বর্ধিষ্ণু গ্রামের মধ্যে পথ চলি। এখানেও একটি রেখদেউলের খ্যাতি। গর্ভগৃহে দেবতা নেই। ভগ্ন দেউল। চারপাশে আমলক কলস পাথরের চাঁই ছড়ানো। ওপাশে একটি পুকুর। শানবাঁধা ঘাট, প্রাচীন। স্নান সেরে উঠে আসে নারী পুরুষ। আর একটি দাঁড়ানো একক মূর্তিতে ফুল জল দেয়। কতদিনের মূর্তি কে বলবে! কালচে ধূসর মাকড়া পাথরের উপর খোদিত মূর্তি। নাম থাঁদারাণী। দেবী থাঁদারাণী প্রকৃতপক্ষে তীর্থংকর মূর্তি বা জৈন দেবমূর্তি। খুব ভালো বোঝা

যায় না। তাহলেও নারীমূর্তি যে নয় তা জানা যাচ্ছে। প্রাচীন পাথরের মূর্তির নাকটা আগে ভাঙে। তারপর হাত পা জল বৃষ্টি ঝড়ে ক্ষয়ে যেতে থাকে। মেয়েরা পূজো দেয়, মানত করে খাঁদারাণীর কাছে।

এমন খাঁদারাণী আরও আছেন পাঁচমুড়ার পাশের গ্রাম দেউলভিড্যায়। এক্কেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে একটি ঘরে আছেন আর এক খাঁদারাণী। এক নয়, দুটি ঘরে দুটি। একটি ছোট, অন্যটি বড়। বৃহৎ মূর্তিটি ষড়ভুজ লোকেশ্বর বিষ্ণু। কিন্তু নাকভাঙা মূর্তি পূজো পাচ্ছেন দেবী দুর্গার প্রতিমূর্তি খাঁদারাণীরূপে।

এইসব দেবদেবীর কথা পুরাণে নেই। আছে লৌকিক লোকমানসে। গ্রামীণ ভক্তিতে বিশ্বাসে। কোথাও কোনো অতীত বিস্মৃত গুরু বা গুণিন হয়েছেন দেবতা। কখনও পরিত্যক্ত কোনো জৈন বা বৌদ্ধ মূর্তি পেয়েছেন নতুন নাম, নতুন শক্তি-মহিমা। আসুন বাঁকুড়ার চারপাশে দেখা লৌকিক দেবদেবীদের নামতালিকা তৈরী করা যাক। খাঁদারাণী, রাজভৈরব, দানা মাদানা, বারভুঁইঞা, পাঠানসিনী, কুদ্রাসিনী, কুদ্রাকুদ্রী, ভৈরবী, ঘাটভৈরব, সন্ন্যাসী, সাতমুন মহাদানা, বাগাম্বর, দিগম্বর, বোঙাবোঙী, বাগড়াই সিনী, ঈশ্বরী, জিনাসিনী, ডাকাই সিনী, হুড়োক্‌গড্যাসিনী, শিকারঠাকুর, তালসিনী, ক্ষেপাবাবা, মড়কচণ্ডী, উদয়চণ্ডী, মহামুদা, মোলাসিনী, ঝাড়িয়াসিনী, কড়রাসিনী, বসন্তকুমারী, হাজরাসিনী, ভ্রমরাসিনী, ডালিবুড়ি, খনিবুড়ি, গনগন্যে, খুদেবুড়ি, পঞ্চানন্দ, কাঁদুনে বুড়ি, অজু ওস্তাদ, বাঘমুণ্ডা, দুখুমাঝি, বিজরাসিনী, ধান্‌সিং, বান্‌সিং জাহের এরা, মারাংবুরু, গোঁসাই এরা। নামতালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই।

বাঁকুড়া সদর শহর, এক্তেশ্বর, ছাতনা, কড়বা, গাদাপাথর, শুশুনিয়া, বিগুনা, শুশুনডাঙা, জুনবেদিয়া, রাজিগা প্রভৃতি গ্রামেগঞ্জে পথেঘাটে, গাছতলায়, বস্তির পোড়ো ভিটায়, নদীঘাটের মাথায়, পুকুরপাড়ে, জমির আলে, উঁচু ঢিবিতে এইসব দেবদেবীদের অবস্থান। হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে আদিবাসী সাঁওতাল মুণ্ডা খেড়িয়াদের দেবদেবী কখনো মিলেমিশে গেছে। পুরাণ ও শাস্ত্রের দেবদেবী, লৌকিক দেবদেবী মিলে তেত্রিশ কোটি। সিনী দেবদেবীদের পূজো করেন সাধারণত বাউরিরা।

সিনী শব্দটির মূল কি? 'বাসিনী' থেকেই কি 'সিনী'? হাজরাসিনী অর্থাৎ হাজরাদের ভিটায় বাসকারিণী দেবী। তালসিনী, অর্থাৎ তালগাছ-তলায় যিনি থাকেন। বাঁকুড়াসিনী বাঁকুড়ায় যাঁর বাস। সোনাসিনী অর্থাৎ সোনা-তোপল গ্রামের প্রান্তে যাঁর বাস। অবশ্য 'দেবাংশী' শব্দটি থেকে 'সিনী' আসতেও পারে। দেবাংশী থেকে 'দেয়াশী', দেবাংশিনী থেকে দেয়াশিনী, থেকে সিনী বা শিনী / দেয়াশী শব্দটিও বাঁকুড়ায় বিশেষ অর্থে বহুল প্রচলিত।

এইসব দেবদেবীর অনেক কাজ। নানারকম দায়িত্বভার এঁদের। কোনো দেবতা রক্ষা করেন ধান-চাল, মাঠের ধান, পুড়্যার চাল। কোনো দেবী বাচ্চা

ছেলেমেয়েদের হিচ্‌কাঁদুনে স্বভাব ভালো করেন। তিনি কাঁদুনে বুড়ি। কোনো দেবী গরু হারিয়ে গেলে খুঁজে এনে দেন। কোনো দেবী বসন্ত রোগ ভালো করেন। কোনো দেবতা বন্ধ্যা নারীকে পুত্রবতী হবার সৌভাগ্য দান করেন। মৃতবৎসাকে পুত্রবতী করেন যেমন ষষ্ঠী ঠাকরুণ। কতরকম ষষ্ঠী—লোটন ষষ্ঠী, চাপড়া ষষ্ঠী, মুলো ষষ্ঠী, পাটাই ষষ্ঠী। কোনো দেবতা আগুন রোধ করেন, অনাবৃষ্টি দূর করেন। কোনো দেবতা পিশাচ ভূত প্রেত থেকে রক্ষা করেন। কোনো দেবী সদ্য-মাতার স্তনে দুগ্ধ এনে দেন। কোনো দেবী নারীদের বিশেষ অসুখ ভালো করেন। কোনো দেবী স্বামীকে স্ত্রীর অনুগত রাখেন। কোনো দেবতা পাহারা দেন নদীর ঘাট, পানের বরোজ, কুমোরের চাক বা গ্রামের চৌহদ্দী। এইসব দেবদেবী বড় আপন, ঘরের মরদ মেয়্যাছেল্যার মতো, পাড়া প্রতিবাসীর মতো, শূন্য মাঠের সঙ্গীর মতো, বনপথের দিশারীর মতো। এইসব দেবদেবীর রাগক্রোধ অবশ্যই আছে। কোনো কোনো দেবতা বড় ভয়ের, বড় ভয়ঙ্কর। তবে তাঁরা তুষ্ট হন অল্পে। একথালা মুলোমুড়ি, বা একখিলি সাজা পান, বা একদলা গুড়, বা একমুঠো বাতাসা বা কাউটো মুলোটা ডিংলাটা দিলেই বাবা খুশি, মা খুশি। অবশ্য কারও জন্য বিশেষ বলি মুরগা বলি, শূকর বলি লাগে। কোনো দেবতার মানসিক কড়ি অথবা মাটির ঘোড়া—একানে ছোট ছোট ঘোড়া বা বড় সাইজের কানখাড়া ঘোড়া—যার যেমন সাধ্য।

দেবতারা ওষুধ দেন। কোথাও জলপড়া, কোথাও দেবস্থানের মাটি, কোথাও বা লতার বন্ধন বা জড়িবুটি। আসানসোল শহর ছাড়িয়ে ছোট নদী বুড়বুড়িয়ার ধারে আছেন ঘাঘরবুড়ি। সেখানে মানত পুজো দিতে হয় শুভ কাজে, নতুন দ্রব্য ক্রয়ের সময়, বাড়িঘর করার সময়। আংটি, রেডিও, টি ভি, সাইকেল, মারুতি যাই কিনি না কেন শোধন পুরশ্চরণ করে আনতে হয় ঘাঘরবুড়ির থানে গিয়ে। তারকেশ্বর থেকে পশ্চিমমুখো যেতে হয় ক্ষুদিরায়ের থান, চোখের ছানি ভালো হয়, অন্ধত্ব ভালো হয়। বাবার জলপড়া একেবারে ধন্বন্তরী।

একই দেবতা একই অঞ্চলে একাধিক। বাঁকুড়ার ছাতনা গাঁয়ে বিখ্যাত মন্দিরেই যে দেবী বাশুলী আছেন তা নয়। ঐ অঞ্চলের প্রায় প্রতি গাঁয়ে একাধিক বাশুলী থান আছে। কোথাও পুকুরপাড়ে, কোথাও বা গাছতলায়। যেমন আছেন বিগনা গ্রামে সন্ন্যাসী ঠাকুর অন্তত আট জায়গায়। শুশুনিয়া পাহাড়ের একপাশে আছেন ভৈরব, অন্যপাশে আছেন নরসিং। বাঁকুড়ার প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম অযোধ্যা। সে গ্রামের মেটেপাড়ায় আছেন রুদ্রা ভৈরব। বড় ছটফটে দেবতা। দশহরার দিন মনসার স্নানযাত্রার সময় বাগদী ভক্ত্যার মাথায় চড়ে আসেন মনসার সঙ্গে যোগ দিতে। দেবীদের আছেন পুরুষদেবতা সঙ্গী, পুরুষদেবতার আছেন এক বা একাধিক নারী-দেবতা সঙ্গিনী। কেউ থাকেন জোড়ে পাশাপাশি, কেউ একটু তফাতে। যেমন দেউলভিড়্যা গ্রামে খাঁদারাণীর সঙ্গেই আছেন ভৈরব, খাঁদারাণীরই প্রাধান্য।

গন্ধেশ্বরী নদীর পশ্চিমতীরে কুল্লাবাদ গ্রামে আছেন তাল-পুখরাসিনী ইনি পুরুষ-দেবতা। অদূরে তাঁর শক্তি বা সঙ্গিনী আছেন কুদ্রাসিনী। কোথাও বা একই সঙ্গে অনেকগুলি দেবদেবীর ঘরসংসার।

এই দেবদেবীর নিজস্ব কোনো রূপ নেই, যদিও নিজস্ব চরিত্র আছে। কোথাও এক টুকরো পাথর, কোথাও বা মাটির নিকোনো ঢিবি। কোথাও কোনো ভিন্ন ধর্মের দেবদেবীর প্রস্তরমূর্তি, বা ভগ্নাংশ কোনো মূর্তির। পরিত্যক্ত কাটামুণ্ড বা ভাঙা পদযুগল। কোথাও শুধু মাটির হাতি ও ঘোড়ার গোটা বা ভাঙা অগোছালো স্তূপ। কোথাও ছোট বেদী। কোথাও কোনো গুহা বা গর্ত। কোনো মূর্তি সিন্দুর-লিপ্ত। কোথাও পাথরের পুরুষমূর্তি পূজা পাচ্ছেন লৌকিক নারীদেবী রূপে। কোনো ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটেছে স্বপ্নে। কোনো দেবতাকে জলাশয় থেকে, কি নদীগর্ভ থেকে, কি মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। কোথাও কোনো সতী পুণ্যবতী স্বরূপ হারিয়ে পরিণতি পেয়েছেন দেবীতে। জলপাইগুড়ি শহরের একপ্রান্তে যেমন দেখেছিলাম দেবী চৌধুরাণী ও ভবানী পাঠক পূজা পাচ্ছেন দেবতারূপে একটি মন্দিবের মধ্যে। মানুষ হয়েছেন লৌকিক দেবী ও লৌকিক দেবতা।

কিংবদন্তিও অসংখ্য। প্রতি দেবদেবীর সঙ্গে একটি বা একাধিক চমকপ্রদ গল্প আছে। দেয়াশীরা বলবেন, গ্রামবৃদ্ধ বলবেন, ভক্তিভীতা বৃদ্ধা নারীরা বলবেন। লোকের মুখে মুখে মনে মনে সেইসব গল্প বেঁচে আছে বংশপরম্পরায়। এক্তেশ্বরের খাঁদারাণীকে নিয়ে, অন্য এক গ্রামের খুদেবুড়িকে নিয়ে, কুল্লাবাদের তালপুখরা-সিনীকে নিয়ে এমন তিনটি গল্প—

খাঁদারাণীর বড় মাছ খাবার লোভ হয়েছে। সেদিন পূর্ণিমার উপোস। মাছ খেতে নেই। দ্বারকেশ্বর নদীর উপারে যাবেক দেবী। সখীঘর যাবেক। একটা বাগাল ছেল্যা জাল পেতে মাছ ধরছিলেক বটে। দেবী তার কাছে মাছ মাগুলো। একটা মাছ দিবি বাপ। ভদ্রঘরের মেয়ের পারা রূপ। এত বড় ঘোমটা। বাগাল ছেলেটা খালুই থেকে একটা বড় চ্যাং মাছ দিলো আলগোছে ফেলে। সেই মাছ খেলেক খাঁদারাণী। ঘরে মাছ ভাজার গন্ধ। ঘরের মানুষ খাঁদারাণীকে জিগাসু করে। ও বঁউটো মানে না। বউটো তার ছেল্যা দুটোর মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি গালছে—মাছ খায় লাই। উই যে পাথরের মূর্তির নিচের দিকে দুটো ছেলের পারা, উয়াদের মাথায় দেবী হাত রেখেছে—দেখেন কেনে।

গোরু হারালি তো, মায়ের কাছে মানৎ করে গোরু পেলাম। সেই থেক্যা মায়ের প্রতি বড় বিশ্বাস, বড় ভক্তি। তো ছেল্যার বিয়া। বাড়ির গিন্নি নথ নেড়ে বুঝেক কি—তিনশো লোক খাবেক, অত থালা বাটি বাসন কোসন কুথা পাবেক? তো সাঁঝ বেলায় একটা শাল পাতার পোঙাতে এক দলা গুড় লিয়ে উ গিন্নি মা চললেন খুদেবুড়ির থানে। মায়ের থানে মানসিক করলে। উ বড় জাগ্রৎ দেবতা আছেন। গিন্নি মা থালা বাটি মাগুলে। সুকাল বেলা গিয়ে দেখে কি সোনার বন্ন সব থালা

বাটি গেলাস কাঁসি ঘড়া বালতি থরে থরে সাজানো। এ-ই এত্তো। ধুমধাম বিয়ে হলো। কত লোক খেলেক পেট পুরে। কত বাদ্যিবাজনা। সোনার প্রিতিমে বউ ঘরে এলো। ঘর আলো করে। ঐ লইতুন বউ একটা বাটি লুকাই রাখলেক। উয়ার লোভ হলো। সব থালা বাটি গোনাগুনতি। তো একটা কম হলো। সেই থিকে খুদেবুড়ি আর থালা বাটি দেয় না। মানৎ মানসিক আর সেই থিকে ফলে না। মাঙন্ যাচন্ সব মিছা হই গেল। [এই গল্পটাই অন্যভাবে প্রচারিত আছে দেউলভিড়্যা গ্রামের খাঁদারাণীকে নিয়ে]।

বাড়ির বড় মেয়াছেল্যাটার বিয়া। বড়লোক বাপ। ৭০ ভরি সোনার গয়না পরেছে মেয়ে। পাটের শাড়ি। ফুলের মালা। রূপ যেন ঝলকাচ্ছে। মেয়ে তালপুকুরে রোজ স্নান করতে যেতো। বালক কাল থেকে। ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফেরে মেয়ে। মাটির রাস্তায় ভিজে পায়ের দাগ জাগে। প্রণাম করে পুকুরের কোণে তালগাছ তলায় তালপুখর্যাসিনীকে। তো বিয়া, আজ তাই তার মনে কত ভাব কত ভাবনা। কনের সাজ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করতে গেল। একলা গেল। লুকিয়ে। কে যেন টানছে তাকে বারবাখুলে। বারবাখুল পার হয়ে পথে নামলো। ঠাকুর থানে গেল সাঁঝ বেলায়। দেবতা দু'হাত বাড়িয়ে ধরলো। খেয়ে ফেললো সেই মেয়্যাকে। বড় রাগি দেবতা। খোঁজ খোঁজ। মেয়া কুথা গেল ? সকালে সবাই দেখলেক কি ঠাকুর থানে চাপ চাপ রক্ত। ঠাকুরের বড় রক্তপিপাসা। আজও ফি বছর ২০০ মোরগ, আর পায়রা আর পাঁচ ছ'টা শুয়োর বলি হয় হোথাকে।

এইভাবে কত না জানা-অজানা দেবতার সঙ্গে আমাদের বসবাস। কত দেবদেবীকে আমরা সৃষ্টি করেছি আমাদের বাঁচার প্রয়োজনে। 'দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি'। কোথাও সাঁঝে প্রদীপ জ্বলে, কোথাও জ্বলে না। বাউরি বাগদি ডোম পুরোহিত কোথাও বা মাসের সংক্রান্তির দিন পুজো দেয়। কারও জন্য জমজমাট 'জাত' হয়, কারও জন্য হয় না। নডরা গ্রামের পথে যেতে যেতে দেখেছিলাম এক প্রবৃদ্ধ পলাশ গাছের তলায় আছেন কোনো এক দেবতা। ভাঙা ও পুরনো মাটির হাতি ঘোড়া পড়ে আছে। তার উপরে ঝরে পড়েছে পলাশ ফুল আর পলাশ ফুল। দেবস্থান লালে লাল। তখন মধ্যবসন্তের নিঝুম দুপুর। থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। দু'চোখ ভরে দেখতে হয়েছিল দেবস্থানের অলৌকিক শোভা।

তাঁরা আমাদের রোগে শোকে সহায়। আমাদের সুখে আনন্দে অংশীদার। মানুষ মৃত্তিকালগ্ন। সেই মৃত্তিকায় একই সঙ্গে মানুষের ও দেবদেবীদের ঘরসংসার। মানুষের স্বার্থচিন্তায়, কর্মে উপার্জনে, স্নেহে ভালোবাসায়, দানে ধ্যানে মানুষের বিচিত্র পরিচয়। তেমনি দেব-আরাধনায়, দেববিশ্বাসে, দেবভক্তিতে সেই পরিচয়ের বৈচিত্র্য অসীমের আঙিনায় পেঁছে যায়। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে মানুষের মনের সব ভাবনাস্রোত মাপা যায় না। দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, এইসব দেবতাও মানুষকে আত্মীয় বলে জানেন।

ধর্মান্তরিত দেবতাগণ ও খাঁদারাণী

একজন পুরুষদেবতাকে যদি নারীদেবীরূপে পূজা করা হয়, তাঁর কিরকম অনুভূতি হয়? তাঁর কি গা সিরু সিরু করে? তাঁর পাথুরে মুখের রেখা কি কৌতুকে বেঁকে যায়? তাঁর কি চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, 'ওগো না না আমি নারী নই, আমি পুরুষ!' আমি ঠিক জানি না। ভক্ত্যারাও ঠিক জানেন না। ভক্তিমতী মেয়েরাও জানতে চান না। অন্ধ ভক্তিতে তাঁদের নিমীলিত মন দেবতাদের ধর্মান্তরিত করে চলেছে সারা দেশ জুড়ে। আর আমি 'যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি, ভগবান, ভগবান।'

দেবতারা যে শুধু লিঙ্গান্তরিত হচ্ছেন তা নয়, ধর্মান্তরিতও হচ্ছেন। তা নিয়ে হৈ হৈ নেই, বেদনাতীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া নেই, আনন্দবাজার, কি বর্তমান, কি পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ, কি সানডে টাইমস্, কোথাও কোন উত্তপ্ত এডিটোরিয়াল লেখা হয় না। অথচ এই ঘটনা নিয়ত ঘটেই চলেছে, নীরবে অথচ পরিকল্পনামাফিক। ঘটে চলেছে এখানে ওখানে সেখানে।

আর আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে দেবতা একটি নয়, একশ নয়, দু'হাজার নয়, সত্যই তেত্রিশ কোটি। ধরুন দেবী কালিকার দশ ভিন্ন রূপ, দশ মহাবিদ্যা। আর আছেন বিষ্ণুর দশাবতার রূপ। দমদম অঞ্চলে ৭ নং গেটে দুর্গাপূজা মণ্ডপে এবছর এসেছিলেন একাদশ দুর্গা। ওখানে প্রতি বছরই ভিন্ন ভিন্ন দুর্গা ও শক্তিদেবীর আবির্ভাব ঘটে ভিন্ন মূর্তিকলায় ও ভিন্ন নামে। কালিমপংয়ের দুরপিনদাড়া থেকে ২৪ পরগনার ক্যানিং এবং পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় থেকে ইচ্ছামতী তীরবর্তী টাকি শহর পর্যন্ত যত জায়গায় চোখ মেলার সুযোগ হয়েছে সর্বত্র দেখেছি মন্দিরে ও গৃহে, পথপ্রান্তে ও অরণ্যসীমায়, নদীর ঘাটে ও শ্মশানচত্বরে কত না দেবতা, কত না দেবী। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বরের ছোট মন্দির-অঙ্গনে কত দেবদেবী আছেন কেউ কি গুনে দেখেছেন? তাছাড়া গ্রাম্য ও লৌকিক দেবদেবীরা, সাতবুড়ী, সাতভাউনী, বারোভূইঞারা আছেন। আছেন কত না ভৈরব-ভৈরবী, সন্ন্যাসী, আর আছেন সহস্রাধিক সিনী দেবতা বা দেবী। অধ্যাপক গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বা ডঃ পঙ্কজ সাহার বা ডঃ মিহির কামিল্যার প্রবন্ধ ও গ্রন্থ পড়ে দেখুন লৌকিক দেবদেবীর, সিনী দেবদেবীর সীমাসংখ্যা পাবেন না। মনসা, চণ্ডী, ধর্মরাজ এঁরা তো এখন জাতে উঠে গেছেন, মঙ্গলকাব্যের সুরে এঁরা ভক্তি ও ভক্ত পেয়েছেন অজস্র। কিন্তু ঐসব লোকদেবতা এখনও জাতে ওঠেননি, কিন্তু তাঁরা আছেন এবং তাঁদের সংখ্যাই সর্বাধিক। তারই সঙ্গে আছেন আদিবাসীদের বোঙ্গা দেবতা। আর্য-অনার্য ভারতবর্ষে এখন প্রতি

আড়াইজনের জন্য একজন করে দেবতা। সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মে দুদিকেই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে এবং ঘটবে, এই বিজ্ঞানের যুগে, বিশ্বাসহীনতার যুগেও। 'দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি'। এখন ধরণীতলেও কোটি কোটি প্রদীপ জ্বলছে এবং সে এক আশ্চর্য শোভা।

কিন্তু আমার গলার মধ্যে বাতাস আটকে গেছে যখন দেখেছি পুরুষদেবতা তাঁর সমস্ত দেহলক্ষণ নিয়ে দেবীরূপে, নারীদেবতারূপে পূজা পাচ্ছেন। ধরাপাটের রেখদেউলটির অপূর্ব সুষমা যখন দর্শকদৃষ্টি নন্দিত করে তোলে তখন দর্শকের খেয়াল থাকে না দেউলটির ঠিক সামনে, রাস্তার ওপার, এক জৈন তীর্থংকর মূর্তি দেবী মনসারূপে পূজিত হচ্ছেন। মূর্তিটির মাথায় সপ্তফণাছত্র আছে প্রস্তরনির্মিত তীর্থংকর মূর্তিরই নিয়মে। নিম্ন হিন্দুবর্ণের মানুষেরা ঐ সপ্তফণাছত্র দেখেই মূর্তিটিকে মনসা ভেবেছেন এবং পরম বিশ্বাসে মন্দির তৈরী করে নিত্য পূজা দিচ্ছেন। তফশীলী বিশ্বাসে কোন প্রশ্নচিহ্ন জাগেনি, কোন সংশয় স্থান পায়নি। আর ঐ রেখদেউলটির বহির্গাত্রে প্রোথিত আছে একটি প্রমাণ সাইজের নগ্ন পার্শ্বনাথ মূর্তি। গ্রামের হিন্দু বাড়ীর মেয়েরা তাঁকে পূজা মানত করেন হিন্দু দেবতা জ্ঞানে। তাঁরা ঐ দেবতার নাম দিয়েছেন 'ন্যাংটা শ্যামচাঁদ'। একই সঙ্গে একই জায়গায় লিঙ্গান্তর ও ধর্মান্তর করার উজ্জ্বল উদাহরণ বিরাজ করছে।

ধরাপাটের অদূরে বহুলাড়ায় শিবমন্দির, সেটিও সুউচ্চ রেখদেউল। মন্দিরটির গর্ভগৃহে শোভা পাচ্ছে একটি মাটি থেকে উত্থিত শিবলিঙ্গসহ তিনটি অপূর্ব গড়ন প্রস্তরমূর্তি। একদিকে দশভুজা দুর্গা, অন্যদিকে গণেশ এবং মাঝখানে অনন্তশায়ী বিষ্ণু। কিন্তু যিনি লোকপালক বিষ্ণুরূপে পুরোহিত ব্রাহ্মণের হস্তে পূজা পাচ্ছেন তিনি বিষ্ণু নন, তিনিও জৈন দেবতা পার্শ্বনাথ। নগ্নমূর্তি। মাথায় ফণাছত্র। ঐ ফণাছত্র দেখে অনন্তনাগের উপর শায়িত বিষ্ণু কল্পনা করা হয়েছে। এখানেও ধর্মান্তরণের উদাহরণ। পুরুলিয়া শহরের একপ্রান্তে এমনি বিস্ময়েই দেখেছিলাম ঐরকম এক জৈনমূর্তির মুখ, কি বৌদ্ধ দেবতার মুখ পূজিত হচ্ছেন দেবী কালিকা রূপে, যদিও লোলজিহ্বা করালবদনীর কোনও চিহ্নই সেই মূর্তিমুখে নেই। অশোক স্তম্ভকে পরিণত করা হয়েছে শিবলিঙ্গে এবং পূজা লাভ করছেন শতলক্ষ ভক্তের। তার প্রমাণ আছে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে। পুরীর জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম প্রকৃতপক্ষে ছিলেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দেবতা। তারপর বৌদ্ধরা জগন্নাথদেবকে বুদ্ধ বানিয়ে ছিলেন। এখন তাঁরা সকলেই হিন্দু দেবতা রূপেই পূজা পাচ্ছেন।

বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ প্রান্তে পোরকুল, বিখ্যাত তুষুমেলার জন্য। পৌষ সংক্রান্তিতে ওখানে বিরাট মেলা বসে। হাজার তুষু মূর্তি আসে নাচগান সহ। কংসাবতী নদীগর্ভে শুষ্ক নদীতে মেলা বসে। ঐ নদীর বালুকাবেলায় (পাথুরে ভূমিতে বলাই ভালো) একটি প্রাচীন পাথরের মূর্তি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। নিঃসঙ্গ মূর্তি। রোদে জলে বৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত ঐ মূর্তিটি খাঁদারাণী নামে পূজা পাচ্ছেন।

মেলায় আগত নারী ও পুরুষ, জলে তুষু ভাসান দিয়ে উঠে আসছে। সিক্ত বসনে শীতকম্পিত হাতে চাল পয়সা ফুল খই বেলপাতা বাতাসা দিচ্ছে মূর্তিটিতে এবং হাত দিয়ে মূর্তিটির মাথা বুক যোনিদেশ (?) স্পর্শ করে নমস্কার করছে। মূর্তিটি তিন হাত লম্বা দু'হাত চওড়া একখণ্ড পাথরের উপর খোদিত। দশভুজ মূর্তি। প্রতি হাতে আয়ুধ প্রভৃতি আছে। পদ্মের উপর দাঁড়ানো মূর্তি। মাথার উপর সর্পফণা-(?)-ছত্র ছিল বলে মনে হয়। অন্তত সাতটি ফণার জোড়। মূল মূর্তিটির পায়ের কাছে ছোট আর একটি মূর্তি খোদিত। মূর্তিটির নাক ভাঙা। মুখ এবং যোনিদেশ হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গর্ত হয়ে গেছে। এটি প্রকৃতপক্ষে পুরুষ মূর্তি। বক্ষদেশ, কোমর, পদভাগ দেখে কিছুতেই নারীদেহের গড়ন মনে হয় না। মূর্তিটি বিষ্ণু বাসুদেব অথবা জৈন তীর্থংকর মূর্তি। কিন্তু জনমানসে তাঁর ধর্মান্তর ঘটেছে, লিঙ্গান্তরও ঘটেছে। তিনি হয়েছেন খাঁদারাণী। বড় প্রিয় নাম, বড় ভালোবাসার নাম।

হাড়মাসড়া, বর্ধিষ্ণু গ্রামে, একটি পাথরের প্রাচীন রেখদেউল আছে। ঐ দেউলের পাশে, পশ্চিমদিকে একটি পুকুর। প্রহ্লাদ রায়, বুলবুল রায়েদের পুকুর। শানবাঁধানো ঘাটে স্নান সেরে উঠে এসে মেয়েরা একটি মূর্তিতে জল দিয়ে যাচ্ছে। ভক্তিনত হয়ে প্রণাম করছে। একটি ইঁটের ছোট বেদীর গায়ে মূর্তিটি খোলা আকাশের নীচে দাঁড় করানো আছে। আগে মূর্তিটি ছিল ওদিকের একটি অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে। গাছটি কবে পড়ে গেছে। তিন হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া একটি পাথরের উপর মূর্তিটি খোদিত। নগ্ন মূর্তি। মাথায় সাতটি ফণা সাজানো। মূর্তির দুবাহু নিম্নমুখী ও প্রলম্বিত। মূর্তিটির পায়ের নীচে পদ্ম। বড় মূল মূর্তিটির দু'পাশে বসে থাকা ছোট ছোট আরও আটটি মূর্তি খোদিত। পদ্মর দু'-পাশে আরও দুটি মূর্তি ছোট মূর্তি। তার দু'পাশে আরও দুটি দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তি। তাদের হাতে চামর বা অন্যকিছু। পাথরের উপর আরও নানা ফুলকারি কাজ। নগ্ন মূর্তিটি নারী মূর্তি কিনা সন্দেহ। নাক মুখ নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু লম্বা ঝুলন্ত কান দুটি স্পষ্ট। মাথায় তীর্থংকর মহাবীরের মতো কেশবিন্যাস, কেশচূড়া। ইনিও এখন খাঁদারাণী। শিলাবতী নদী অধ্যুষিত এই অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল দূর অতীতে। সেই প্রভাব লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু রেখদেউল ও নানা মূর্তি রয়ে গেছে। ঐ মূর্তিটি হয়তো অতীতে পাশের রেখদেউলে পূজা পেত। পরবর্তী কালে অসহিষ্ণু কেউ বা কারা মূর্তিটিকে পুকুরের জলে ফেলে দেয়। পঙ্ক উদ্ধারের সময় মূর্তিটি ওঠে। এখন সহিষ্ণু হিন্দু রমণীরা দেবতাটির ধর্মান্তর ও লিঙ্গান্তর ঘটিয়ে খাঁদারাণী নামে পূজা ও ভক্তি নিবেদন করছে।

বাঁকুড়া শহরের অদূরে এক্তেশ্বর। সুবিখ্যাত সুবৃহৎ শিবমন্দির। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে। মন্দিরপ্রাঙ্গণে অনেকানেক ছোটবড় মন্দির আর অজস্র মূর্তি।

যেন মূর্তির সংগ্রহশালা। প্রবেশতোরণ পার হয়েই একটি ঘর। ডানদিকে। ঐ ঘরে আছেন খাঁদারাণী। সুবৃহৎ সুদর্শন মূর্তি। এটি মূর্তি-চারুকলার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, সাধারণ দর্শক সবাই বড় ভক্তি করেন ঐ খাঁদারাণীকে। মূর্তিটি অটুট আছে, শুধু নাকটা ভেঙে গেছে। আসলে এটি দ্বাদশভুজ লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি। মোটা ভারি একখণ্ড পাথর, চারফুট দুইঞ্চি উচ্চ এবং আড়াই ফুট প্রস্থ। সিন্দুরলিপ্ত নয়, প্রতিদিন সকালে ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে স্নান করানো হয় মূর্তিটিকে। প্রধান পুরোহিত স্নান করান। মূর্তিটির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য তাই সহজেই চোখে পড়ে, পদ্মের উপর সম্পাদক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান মূর্তিটির মাথার পিছনে সপ্তফণাছত্র এবং প্রভামণ্ডল। গলায় বৈজয়ন্তী মালা এবং গলা থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলছে পাথরের বনমালা। আর আছে উপবীত। দ্বাদশভুজের উপরের দিকের হাতগুলিতে মুদ্রাভঙ্গি। নিচের দুটি হাতে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না। আর দুটি হাত, নৃত্যরত ভৈরবের মাথার উপর ছোঁয়া। লোককাহিনী প্রচলিত আছে—"মা খাঁদা রাণী লুকিয়ে চ্যাং মাছ খেয়েছিল, কিন্তু ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করছে যে মাছ খাইনি।" মাঝখানের হাতগুলিতে গদা, পদ্ম, অংকুশ ও শঙ্খ আছে বোঝা যায়। বাহুগুলি পাথরখোদাই অলংকার শোভিত। মূল মূর্তির দুপাশে দুটি বৃক্ষ, গাছের পাতা বোঝা যাচেছ। আর আছে নয় ইঞ্চি উচ্চতার দুটি ভৈরবমূর্তি। তাদের পায়ের কাছে কুবের ও যক্ষমূর্তি দুটি উপবিষ্ট তিন ইঞ্চি সাইজের। পাদপীঠে পূজারত আরও দুটি ছোট ছোট মূর্তি।

মনসারূপে এই মূর্তির বিশেষ পূজা হয় 'মাখল' দিনে। মূল এক্তেশ্বর শিব মন্দিরের মুখোমুখি এই খাঁদারাণী মন্দির। এই খাঁদারাণী দুর্গারূপেও পূজিতা, এখানে এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে তাই দুর্গাপূজা হয় না যথারীতি অন্য মাটির মূর্তি এনে। অনন্তবাসুকিরূপেও এ মূর্তি পূজা পান। এসব কথা বললেন—পূজারী চণ্ডীচরণ ধামাৎকর্ণি। কিন্তু আমাদের বিস্ময়, একটি মূর্তিকেই তিন দেবতা বা চার দেবতারূপে পূজা করা হচেছ! যদিও মূর্তিটি বিষ্ণুমূর্তি। কোনভাবেই নারীমূর্তি নয়।

সেদিন ছিল সোমবার। শিবের বার, শিবের দিন। দলে দলে কুমারী ও বিবাহিতা মেয়েরা এই মন্দিরে প্রবেশ করে সিন্দুর দিচ্ছেন মূর্তিতে। মাথায়, যোনি-দেশে (?), পায়ে। যোনি (বা লিঙ্গ) স্থানে সিন্দুর স্পর্শ করানো হচ্ছে কেন? এ কি জননক্রিয়া বা সন্তানকামনার আদিম অভিপ্রকাশেরই আচারধর্মী রূপ? যাই হোক, সেদিন এক্তেশ্বরের বহু পুরোহিত ও ভক্তিমতী মেয়েদের বলেছিলাম, এটি পুরুষদেবতা এবং বিষ্ণু, কিন্তু কাকেও বিশ্বাস করাতে পারিনি। কেন বিশ্বাস করাতে পারিনি, তার উত্তর জানা নেই! অথচ তাঁদের ভক্তি ছিল, সত্য পূজাবিধিও ছিল শাস্ত্রসম্মত। দ্বাদশভুজ লোকেশ্বর বিষ্ণু খাঁদারাণী (বা মনসা বা দুর্গা)

রূপে পূজা পাচ্ছেন, কেমন লাগছে বিষ্ণু দেবতার, কি অনুভব করছেন তিনি, জানি না। তবে মনে পড়লো, পুরুষ আর প্রকৃতি তো, আমাদের শাস্ত্র, দর্শনতত্ত্বে অভিন্ন। আমরা তো জানি যেই শ্যাম সেই শ্যামা। খাঁদারাণী ও বিষ্ণুর মধ্যে তাই কোন তফাত কি দেখেন না ভক্ত জনগণ, পুরোহিত ও প্রবীণ মহিলারা?

অনেক বেশী জাগ্রত, অনেক বড় কিংবদন্তি নিয়ে বিরাজ করছেন দেউলভিড়্যার খাঁদারাণী। মাটির ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত পাঁচমুড়ার বাস স্টপেজ থেকে নেমে দেড় মাইল হাঁটলে দেউলভিড়্যা গ্রামের প্রান্তে খাঁদারাণীর থানে পেঁছানো যায়। বড় বড় আকাশচুম্বী গাছের জটলা তার নিচে, গ্রামের উত্তর প্রান্তের হাটতলায়, ফাঁকা মাঠে দেবী আসীনা। সঙ্গে আছেন মনসা ও ভৈরব। সবই মাটিতে অর্ধপ্রোথিত। ত্রিভঙ্গ-কুমার পাল বললেন গ্রামের মাঝ বরাবর আছে একটি রেখদেউল। সেখানে মাটিতে অনেক খোঁড়াখুড়ি করে অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, মূর্তিগুলি কলকাতায় চলে গেছে। ঐ মূর্তিগুলিরই কোন একটি এখানে গাছতলায় কিভাবে এসে পড়েছিল এবং এখন সেই মূর্তি খাঁদারাণীরূপে পূজা পাচ্ছেন। মূর্তিটি দেখলাম। মূর্তিটি নিঃসন্দেহে পুরুষমূর্তি। দেখতে অনেকটা যোদ্ধা বা দারোয়ানের মতো। উত্তোলিত ডান হাতে গদা বা তরবারি। বাম হাতের মুঠি বুকের উপর ন্যস্ত। বুক নারীবক্ষের মতো যুগল স্তনশোভিত নয়। হাতের কব্জিতে বালা। দুই পায়ের ফাঁকে কোমরে ল্যাঙট দেখা যাচ্ছে। মাথার উপরের কাজ লক্ষণীয়। যেন বুদ্ধমূর্তির কেশ-বিন্যাসের মতো স্তূপাকৃতি কেশবিন্যাস। তার পিছনে বৃক্ষের পত্রগুচ্ছের আদল। মূর্তিটির নাক ভাঙা, চোখ মুখ নেই, কপালে চওড়া করে সিন্দুরের প্রলেপ। কপাল তার ফলে প্রায় আধ ইঞ্চি উঁচু। আড়াই ফুট উঁচু আর দেড় ফুট চওড়া পাথরে মূর্তিটি খোদিত। পাশেই ঘর, পূজারী শিবু খয়রার মা বললেন—বিশেষ মানত পূজায় পাঁঠা বলি হয় আর প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন দুধ চিড়া দিয়ে পূজা করা হয়।

বড় জাগ্রত দেবতা এই খাঁদারাণী। গৃহস্থের গোরু হারিয়েছে, রাত্রি হল তবু ফিরছে না। খাঁদারাণীর কাছে মানত করতে হয় মনে মনে, পান সুপারী দিয়ে। সকালে দেখা যায় গোরু ফিরে এসেছে গোয়ালে। অনেক আগে, বিয়ে বাড়ীর জন্য কর্ম্ম বাড়ীর জন্য থালা বাটি বাসন যাচঞা করা হত খাঁদারাণীর কাছে! সন্ধ্যায় পাতায় করে গুড় আর সুপারি দেবস্থানে রেখে প্রার্থনা করা হত। সকালে দেখা যেত যে নতুন থালা বাটি গেলাস সব সাজানো আছে গাছতলায়। প্রশ্ন করলাম, এখন আর পাওয়া যায় না কেন? উত্তর হল—কারণ, কে একজন একবার খাঁদারাণীর কাছে থেকে পাওয়া বাটি বা থালা ফেরত দেয়নি। লোভবশত একটি বাটি সরিয়ে রেখেছিল। সেই থেকে মানৎ খাটে না, প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না। এরকম আরও কিছু কিংবদন্তি শোনা গেল ঐ খাঁদারাণী সম্বন্ধে।

কোথাও নারীমূর্তি সরাসরি খাঁদারাণী হয়েছে এমন দৃশ্য এখনো দেখিনি।

পরিত্যক্ত, রোদে পড়ে থাকা পাথরের মূর্তির নাকটা সহজে ভেঙে যায়। তারপর ইতিহাস ভুলে, মূর্তিটির প্রকৃত পরিচয় না অন্বেষণ করে, যখন হিন্দুরা পূজো মানত করতে আরম্ভ করেন তখনই তাঁর নাম দেওয়া হয় খাঁদারাণী। খাঁদারাণী কোন পৌরাণিক দেবী নন, তাঁকে নিয়ে কোনো মঙ্গলকাব্য বা গাথা বা গান রচিত হয়নি। তবে সর্বত্রই আছে কোন না কোন কিংবদন্তি। পূজাপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। ধর্মপ্রাণ ও ভক্তপ্রাণ লোকবিশ্বাস এইভাবেই অনেক দেবদেবীর পত্তন ঘটিয়ে চলেছে রাঢ় বাঁকুড়ায়। মাটির কাছাকাছি বেঁচে থাকা, দরিদ্র, অশিক্ষিত হিন্দু জনমানস আরও অনেক লৌকিক দেবদেবীর অধিষ্ঠান গড়ে তুলবে যুগ যুগ ধরে।

এইসব লৌকিক দেবদেবীর খোঁজ নিতে নিতে একটি অভিজ্ঞান বড় হয়ে ধরা পড়ে। তা হচ্ছে লোকচেতনায় সংহতিবাসনা। কোন শাস্ত্রনির্দেশ নয়, কোন মান্য পুরাণ নয়, মানুষ মানুষকে আপন করে সহজ মানবধর্মে, মানুষ দেবতাকে আপন করে স্বাভাবিক ধর্মভাবনায়। সে ভাবনার মূলে আছে সংহতিচেতনা। দেবতাকে আত্মীয় করি আমরা এবং সেই দেবতার পাদপীঠতলে সর্ববর্ণের মানুষকে ডাক দিই, সকলে মিলে পূজো নিবেদন করি, জাত বা মেলা উৎসবের আয়োজন করি এবং এইসব ছোট ছোট মেলা পরব উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষ মানুষের কাছে আসে। খাঁদারাণীর মতো একটি দেবতার সূত্রে, সে দেবতা যতই অযৌক্তিক হোক, হাজার মানুষ একত্রিত হয়, পান ভোজন হাসি কুশল সুখ দুঃখ বিনিময় হয়, মানুষ মানুষকে চেনে জানে। এইসব দেবতার প্রয়োজন এই কারণে। এইসব দেবদেবীর মহিমা এইখানেই। আর অসহায় মানুষ, সামাজিক সরলপ্রাণ মানুষ যখন দুঃখের বাণে বিদ্ধ হয়, সামাজিক রাষ্ট্রিক অন্যায় নিয়মে জর্জরিত ও ভাগ্যের দ্বারা বিড়ম্বিত হয়, তখন কার কাছে যাবে তারা? এইসব নিকট, সহজ, আপন মনের বিশ্বাস মিশিয়ে তৈরী দেবদেবীর কাছে ছাড়া? তাই এঁরা আছেন, এঁরা থাকবেন, জল বাতাস আলো আকাশ যতদিন থাকবে। কলকাতার মতো সভ্যতার পাদপীঠ শহরেও তাই দিন দিন সন্তোষী মা ও শনিদেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে এবং তাঁদের নির্মূল করা যাচ্ছে না, যাবে না। কারণ ঐ একটাই—'দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি' এবং আমাদের ভক্তি-প্রাণের দীপ জ্বালি তাঁদেরই উদ্দেশে।

ছত্রাক। ১৩৯৬

পূর্ণিমার চাঁদ, ভরা বর্ষা, বেলেতোড়ের গাজন : বাণকৌঁড়

টকটকে লাল শালু কাপড় জড়ানো পাঁচ জোড়া ঢাকের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে বাস-স্ট্যান্ড থেকে পথে নামলাম। সঙ্গে বাঁকুড়া সদর-শহরের তরুণ ছাত্র রাণা প্রতাপ ও বেলেতোড়ের অমিতাভ। দশটি ঢাকের বুকে কুড়িটি কাঠির ছন্দিত নৃত্য বাজছে আমাদের উৎসুক চেতনায়। ঢাকিদের অনুসরণ করে আমরা পেঁাছে গেলাম গাজন-তলায় বেলেতোড়ের ধর্মরাজ মন্দিরের সামনে। তখন মেঘ ছাই ছাই মধ্য দুপুর। শ্রাবণ মাসের ১২ তারিখ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের মধ্য দুপুর। সারাদিন বৃষ্টি নেই আজ, উৎসব উপলক্ষে বুঝি ক্ষান্ত হয়েছেন মেঘদেবতা।

মন্দিরের চারপাশে মেলা বসেছে, দোকানদানী, 'এগরোল' থেকে আরম্ভ করে, রকেট নাগরদোলা চাররকম নাগরদোলা, চুড়ির দোকান, বাহারি মালার দোকান, পাথর কাঠ মাটি পোর্সেলিনের সৌখীন পুতুল, আসবাবের দোকান। বেশ ছিমছাম সাজানো পরিবেশ। পুজাকমিটির কৃতিত্ব আছে। মন্দির নির্মাণে, পুজা পরিচালনায়, মেলা ও গাজন ব্যবস্থাপনায়।

দশ বছর আগে যা দেখেছি, তার তুলনায় ধর্মরাজ মন্দির সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। নতুন নিপুণ সৌন্দর্যময়তা দিয়ে রচনা করা হয়েছে বর্তমান মন্দির। প্রায় লক্ষ টাকা খরচ করে। আগে ছিল একতলা সমতল ছাদের ঘর, এখন ছাদের উপর রেখদেউলের চূড়া। ভূমি থেকে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চে মন্দিরের শীর্ষচক্র। মন্দিরের গর্ভগৃহ, মোজেইক পাথরের কাজে, বেদীর শিল্পসুন্দর রূপায়ণে, স্তম্ভসজ্জায়, ফুলকারী নকশায় মনোরম, শোভন, নয়নলোভন। মন্দির-অভ্যন্তরে এখন যথেষ্ট আলো। দুয়ারে, নাটমন্দিরে এখন যথেষ্ট স্থান। সংকুলান হয় পুজা অর্চনার জন্য, ভক্ত পুজারী সমাবেশের জন্য যথেষ্ট পরিসর। মন্দিরের উপরিভাগে চূড়ার চারি গাত্রে চারটি মূর্তি বা-রিলিফে তৈরী হয়েছে। সামনে চতুর্ভুজ বিষ্ণু, পশ্চাতে বংশীধারী কৃষ্ণ, উত্তরে ধনুর্বাণ হাতে শ্রীরামচন্দ্র, দক্ষিণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। মূর্তি-গুলি নির্মাণ করেছেন বাঁকুড়া শহরের রামপুর পাড়ার কানাই সূত্রধর। ভারি সুন্দর শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে মূর্তিগুলি। মন্দিরের চূড়ায় আমলক, কলস, দণ্ড, চক্র আছে। পিতলের কলস চকচক করছে। চক্র পিতলের। সারা মন্দিরগাত্র, ভিতর বাহির, সম্মুখের নাটমন্দির, ফিকে গেরুয়া রঙে রঙ করা হয়েছে। রঙের বিভা স্পর্শ করে মন। এ বছর গাজন উৎসবের মধ্যেই মন্দিরের, অর্থাৎ নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

নাটমন্দিরের পরে পূর্বদিকে টিনের চালা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় পাঁচটি কাঠের ঘোড়া। শক্ত চওড়া কাঠের ফ্রেমে গোলগোল চার চাকা, তার উপর

লম্বা লম্বা পা কাঠের ঘোড়া ঊর্ধ্বমুখ, হাঁ করে আছে, দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। পাঁচটির মধ্যে তিনটি ঘোড়ায় রঙ করা হচ্ছে। ঘোড়ার রঙ সাদা, লাগামে সোনালি কাজ, পায়ের খুর কালো। পাট-শনের লেজ, ঘাড়ের কেশরও সজ্জিত পাট-শনে। ঘোড়ার রঙ করছেন, সাজাচ্ছেন—রামপ্রসাদ সূত্রধর, দিলীপ চন্দ, অজিত সূত্রধর, ক্ষুদিরাম চন্দ। অন্য সময় এঁরা প্রতিমা গড়েন, রঙ করেন, কাঠের মাটির খেলনাপাতি সৌখীন দ্রব্য তৈরী করেন। এক একটি ঘোড়া ছ'ফুট সাড়ে ছ'ফুট উঁচু। এ সবই মানতের ঘোড়া। ধর্মরাজের কাছে প্রার্থনা করে যাদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে তারা 'মানৎ' অনুযায়ী 'বাবা'কে ঘোড়া দিয়েছে। তিনটি ঘোড়ার প্রয়োজন। কারণ তিন দেবতা—ধর্মরাজ, মাদানা (মহাদানা) স্বরূপ-নারায়ণ ঘোড়ায় চড়ে স্নানযাত্রায় যাবেন। রথযাত্রার মতো এই স্নানযাত্রাই গাজনের, ধর্মরাজের গাজনের শ্রেষ্ঠ উৎসব। প্রতিবছর নতুন ঘোড়াগুলি দেববাহন হবার সৌভাগ্যলাভ করে, পুরানো ঘোড়াগুলি পড়ে থাকে। ধর্মরাজের মন্দির বেলেতোড়ের ব্রাহ্মণপাড়ায়। মন্দির থেকে ঘোড়ায় চেপে স্নানযাত্রায় যান ত্রয়ীদেবতা গ্রামের শেষপ্রান্তে পশ্চিমে তাঁতপুকুরে (তাঁতী-পুকুরে), ধর্মরাজের নিজস্ব পুকুরে। স্নান করে, পুকুরের ঘাটেই সারারাত অবস্থান এবং পরের দিন সকালে ঐ সজ্জিত ঘোড়ায় চড়েই মন্দিরে ফেরা।

আজ বৃহস্পতিবার। পূর্ণিমা পড়েছে সকাল এগারোটা থেকে। ঘোড়ার পিঠে দেবতাদের বসতে হবে বিকাল সওয়া পাঁচটার মধ্যে। ওদিকে ঘোড়া সাজানোর প্রস্তুতি চলছে। এদিকে নাটমন্দিরে জাজিম পেতে, সিংহাসন সাজানো হচ্ছে। পুরোহিত এসেছেন—বড়জোড়ার ব্রাহ্মণডিহি গ্রাম থেকে। দুজন পুরোহিত—মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও বিজয় মুখোপাধ্যায়। সম্বৎসর নিত্যপূজা যিনি করেন, যাঁরা করেন, তাঁরা গাজনের সময় পূজা ইত্যাদির অধিকারী নন। নিত্যপূজা করেন এখানের অজিত মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর ছেলেরা।

গত রথের দিন থেকেই বেলেতোড়ের গাজনের শুরু। রথের দিন বাবার অর্থাৎ ধর্মরাজের ঘটস্থাপনা হয়। সেদিন থেকেই বাইরের ব্রাহ্মণের পূজা করার নিয়ম। শেষ দিনের শেষ অনুষ্ঠান ধর্মযজ্ঞি হবার পর আবার নিত্যপূজারীর হাতে ফিরে আসে পূজার অধিকার। আজ স্নানযাত্রা, তার পরদিন চড়ক, তার পরদিন দুধ-চিড়া ভোগ এবং শেষ দিনে ধর্মযজ্ঞি—খিচুড়িভোগ।

ভক্তারা (ভক্ত নয়, এখানে বলে 'ভক্ত্যা') আসছেন একে একে। গলায় পৈতা, পরনে নতুন ধুতি, গায়ে নতুন গামছা, হাতে বেতের ছড়ি, মাথায় তৈলহীন রুখু চুল। গতকাল থেকে হবিষ্যান্ন করছেন, নিরামিষ একাহারী এঁরা। প্রথমে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে পরিচ্ছন্ন হতে হয়। ব্রাহ্মণসন্তান ভক্ত্যাদের একদিন হবিষ্যান্ন, অন্য-বর্ণের ভক্ত্যাদের দু'দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণের নিয়ম পালন করতে হয়। সন্ধ্যায় অন্ন গ্রহণের সময় কানে তুলো গুঁজে রাখতে হয়। কোন কথা শুনলে, কেউ ডাকলে খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। খাওয়া আর চলে না। চড়কের দিন 'কামলা' হাঁড়ির জল

খেয়ে উপবাস ভঙ্গ হয়। পুরোনো জাতকলসীর জল, শ্মশানের জল, গুড় চিনি মিশ্রিত জল—সব মিলিয়ে প্রস্তুত হয় 'কামলা' হাঁড়ির জল। তারপর ভক্ত্যাদের রথপুকুরে গিয়ে স্নান। বামুনের পায়ে তেল দিয়ে, পৈতা খুলে জল দিয়ে স্নান। ধর্মরাজের ভক্ত্যাদের, যে-কোন বর্ণের ভক্তাদের কদিনের জন্য পৈতা ধারণ করতে হয় গলায়। স্নান সারা হলে প্রত্যেক ভক্ত্যার হাতে 'ঝিলিপি' দেওয়া হয় খাবার জন্য। এইভাবে ভক্ত্যাদের ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। ভক্ত্যা হলে আবার কদিন পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভিক্ষা করতে হয়, প্রণামি আদায় করতে হয়।

এ বছর প্রায় শতাধিক ভক্ত্যা। এরা দেবতাদের সঙ্গে তাঁতিপুকুরে স্নানের শেষে ঘাট থেকে মন্দির পর্যন্ত দণ্ডী কেটে আসবে কেউ কেউ, যার যেমন মানৎ আছে। দণ্ডী বা হত্যে (আত্মহত্যা, আত্মত্যাগ, আত্মবলিদান) দুরকমের—শয়ন দণ্ডী, গড়ান দণ্ডী।

নাটমন্দির ও টিনের চালার মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় মাটিতে উনান করে একটি মাটির বড় পাত্রে কেজি দুই সরষের তেল ফুটছে এবং তাতে দেওয়া হল কেজি খানেক ধুনোর গুঁড়ো। ধুনোমেশানো ঐ তেল ঠাণ্ডা হলে তাতে ছোট ছোট কাপড়ের টুকরো ভেজানো হবে। নেকড়া জড়ানো হচ্ছে হাতখানেক করে লম্বা ভেরেণ্ডা ডালের মাথায়। মশাল তৈরি হচ্ছে। একশো দেড়শো মশাল। তাঁতিপুকুরের ঘাট থেকে বাণ ফুঁড়ে ভক্ত্যারা যখন ফিরবে মন্দিরের পথে, তখন তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল ধরিয়ে দেওয়া হবে। প্রায় দুশ বছর আগে থেকে এই ধর্মরাজের গাজন। তখন বিজলী বাতি বা জেনারেটর ছিল না। তাই মশালের প্রয়োজন হত। ঝড় জলে বর্ষা রাত্রে পথ চলতে। মশালের অন্য প্রয়োজনও আছে। ভৈরব-শিব-রুদ্রের সাঙ্গোপাঙ্গো ভক্তজনের হাতে তো মশালই মানায়! মশালের তেল ফোটালো, মশাল তৈরি করলো রবিলোচন লোহার, মনোহর বাউরী, ধীরেন বাউরী। এরা সবাই বেলেতোড় গ্রামনিবাসী।

ধর্মরাজের পাট। প্রায় ১৫ ইঞ্চি চওড়া এবং ৪০ ইঞ্চি লম্বা একটি কাঠের মোটা পাটাতন। তার এক পিঠে পেরেক পোঁতা হয়। প্রতি বছর একটি করে পেরেক। পেরেক গুণলেই বোঝা যায় কত বছর হল ঐ পাটের বয়স। একশ বছর পার হলে আবার নতুন পাট হবে নিয়ম অনুযায়ী। মন্দির থেকে পাট বার হয় উল্টোরথের দিন। পাট যায় কামারশালে। সেখানে একটি পেরেক পুঁতে দেওয়া হয়। পাট পুজো ও আরতি হয়। তারপর পাট যায় তাঁতিপুকুরে, বাবার নিজস্ব পুকুরে, স্নানে। সঙ্গে উপোসী ভক্ত্যারা স্নান করে, যার যেমন মানত। গাজন অর্থাৎ স্নানযাত্রার দিন পর্যন্ত পাট স্নানে যায় বিভিন্ন পুকুরে। 'পাটভক্ত্যা' (অর্থাৎ যে পাট বহন করে মাথায় করে) উল্টোরথের দিন থেকে উপোস করে, নিরামিষ আহার করে, সংযমে থাকে। এ বছর যে পাটভক্ত্যার পালি তার নাম মন্টুলাল নাগ।

জাতকলসী। জাতকলসীর মহিমা সামাজিক দিক থেকে অসাধারণ। সমাজবন্ধ

মানুষের, ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মানবপ্রেম, সামাজিক সংহতিবোধ, ঐক্যচিন্তা কাজ করছে জাতকলসী কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানে। ধর্মরাজের গাজনের এ এক লক্ষণীয় দিক। ধর্মরাজের গাজনে বর্ণভেদ, জাতিভেদ দূর হয়ে যায়। আসলে, ভক্ত্যা যখনই গলায় ধর্মরাজের পৈতা ধারণ করে তখন থেকেই সে ধর্মরাজের সন্তান। সে আর তখন ব্রাহ্মণ নয় বা কর্মকার নয় বা বাউরি নয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রে, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে ভেদ দূর হয়ে যায় তখন। 'জাতকলসী' নামটি সেই কারণেই বহুব্যঞ্জনাধর্মী, পুণ্য-মিলনের ও পবিত্র মহান ঐক্যের প্রতীক।

ঘোড়ায় চেপে দেবতাত্রয়ীর স্নানযাত্রার সময় ধর্মরাজের পাট যেমন বার হয় ভক্ত্যার মাথায়, তেমনি জাতকলসীও বার হবে ভক্ত্যার মাথায়। তাঁতপুকুরে সম্বৎসরের পুরোনো কলসী বিসর্জন হয় এবং নতুন একটি কলসী জল ভরে এনে রাখা হয় মন্দির অভ্যন্তরে দেববেদীর সামনে।

নাটমন্দিরে ভক্ত্যাদের ভিড় বাড়ছে! পূজারিণীদের ভিড় বাড়ছে। মন্দির চতুষ্পার্শ্ব ঘুরে ঘুরে ঢাক বাজাচ্ছে দূরদূরান্তর থেকে আগত বাদ্যকরেরা। ঢাক বাজাচ্ছে আড়বেতালা গ্রামের লালমোহন, দুর্লভ, ভরত, নেউল, ফটিক, পরাণ, মথুর প্রভৃতি বাউরীরা। অন্যান্য গ্রাম থেকে এসেছে সানাই, ব্যাগ্‌পাইপ, ফ্লুট, ঢোল, টেমটেমি, কাঁসি, চড়চড়ি। একাধিক দল। অনেক দল। এরা প্রতি বছরই আসে গাজনে, বাজায়, পয়সা নেয় না। মন্দির কমিটি এদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের নানা ঠাকুরবাড়ি থেকেও নানা সাহায্য আসে।

মন্দিরের মাথায় চক্রদণ্ডে পতাকা বাঁধা হচ্ছে! একটা লাল কাপড়, প্রায় শত হাত লম্বা, চূড়া থেকে নেমে এসেছে মাটি পর্যন্ত এবং মন্দিরের অগ্নিকোণে পোঁতা একটা বাঁশের সঙ্গে জড়ানো হল, বাঁশটির মাথায় উড়লো ছোট লাল পতাকা। আগে থেকেই মন্দির এবং নাটমন্দির আম্রপল্লবের মাথা গেঁথে সাজানো হয়েছে।

পূজারিণীরা আসছেন—কুমারী সধবা নববধূ প্রৌঢ়া গৃহিণী। হাতে ফুল, ফুলের ডালা, ফুলের মালা, ফলমূল আর মিষ্টান্নের মধ্যে 'খইচুর'—খইয়ের মণ্ডা। খইচুর দিয়ে ধর্মরাজের পূজা দিতে হয়, মানত করতে হয় এবং সেটাই নিয়ম। কেউ বা মানতের পূজা দিচ্ছেন রূপোর বেলপাতা সহ।

সোনার মুকুট মাথায় ধর্মরাজ বসেছেন সিংহাসনে। তাঁর মুকুটের উপরে রৌপ্যনির্মিত অলংকৃত ছত্র। তাঁর দু'পাশে অন্য দুই দেবতা—মাদানা এবং স্বরূপ-নারায়ণ। শাস্ত্রীয় মূর্তি নয়, পাথরের টুকরো। সকলেই মন্দির অভ্যন্তর থেকে বাইরে এসে নাটমন্দির আলো করে বসেছেন। সাদা রজনীগন্ধার গোড়ে মালা, রঙন ফুলের লাল স্তবক, একানে শ্বেতকরবী, জরির পাড়, কারুকার্যময় সিংহাসন—সব মিলিয়ে জাঁকজমক কম নয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের হাতে ঘণ্টা বাজছে। ধুনোর সৌগন্ধে আমোদিত দর্শনার্থী ও পূজারিণীদের চেতনা।

এতক্ষণ লক্ষ্য পড়েনি। নাটমন্দিরের মধ্যে ভক্ত্যা, পূজারিণী, দর্শকদের ভিড়ের

একপাশে বসে একটি লোক এককাঠিতে ঢাক বাজাচ্ছে। দু'হাতে দুটি কাঠি নিয়ে ঢাক বাজানোর নিয়ম কেন লোকটি মানছে না? বিস্ময় সেইখানেই। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ঐ লোকটির কোন এক পূর্বপুরুষ ধর্মরাজের কাছে মানত করে মহাব্যাধি থেকে মুক্ত হয়েছিল। বাদ্যকর ঐ বংশ, সেই থেকে এক হাতে এক কাঠিতে ঢাক বাজাবার মানত রক্ষা করে যাচ্ছে, পালুনি রক্ষা করে যাচ্ছে। বংশানুক্রমে এই রীতি চলছে। আজ যে লোকটি এককাঠিতে ঢাক বাজাচ্ছে তার নাম দয়াময় বাদ্যকর। রথের দিন থেকে অর্থাৎ গাজন অনুষ্ঠান উৎসব আরম্ভের দিন থেকে রোজ দয়াময় ঢাক বাজিয়ে যাবে ১৫ দিন ধরে এবং বাজিয়ে যাচ্ছে। এককাঠির ঢাক বাজানোর সঙ্গে কাঁসি বা অন্য কোন ঢাক বাজে না। দয়াময় নিঃসঙ্গ, একা, কুণ্ঠিত।

দেবতাকে ভক্ত্যারা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সঞ্জয় পাল, গৌতম দাস, সমীর মুখার্জী, প্রশান্ত সিংহরা 'ডাক' দিচ্ছে অর্থাৎ বাবার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে—

ও-ও ভুবনেশ্বর নাথমুনি-ই-ই মহাদেব
ও-ও এক্তেশ্বর নাথমুনি-ই-ই মহাদেব
ও-ও পাতালেশ্বর নাথমুনি-ই-ই মহাদেব
ও-ও তারকেশ্বর নাথমুনি-ই-ই মহাদেব

আবার ধ্বনি উঠছে—'বল শ্রীধর্মের জয়', 'বল জয় জয় নিরঞ্জনের জয়'। শ্রীধর্মী সম্প্রদায় আছে বাঁকুড়া জেলায়। অন্ত্যজ বা নিম্নবর্ণের হিন্দু বা আদিবাসীরা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলে হয় 'শ্রীধর্মী'।* নিরঞ্জন হচ্ছেন বৌদ্ধ দেবতা এবং তিনিই রূপান্তরে ধর্মরাজ—মূলতঃ নিম্নহিন্দু বর্ণের দেবতা। বাঁকুড়া শহরের অদূরে পূর্বপ্রান্তে দ্বারকেশ্বর নদতীরে এক্তেশ্বর শিবের বিখ্যাত মন্দির। বাংলায় ও বাংলার বাইরের নানা স্থানের বিখ্যাত শিবদেবতার স্মরণ করে এই ধ্বনি দেওয়ায়, ধর্মরাজের সঙ্গে শিবের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হচ্ছে। নীলমণি চট্টোপাধ্যায় বললেন —ধর্মরাজকে যে যে চোখে দেখে, ভাবে, সে সেইভাবে জয়ধ্বনি দেয়। সব দেখেশুনে মনে হল, লোকায়ত দেবতা ধর্মরাজ ধীরে ধীরে হয়ে উঠছেন আদিদেব দেবাদিদেব মহাদেব। এইভাবে জয়ী হতে চলেছে বর্ণহিন্দুরা, ধর্মরাজের পুজো-উৎসব বিধিতে।

পঞ্চগব্যে শোধন করে মন্দির অভ্যন্তরে ধর্মরাজকে নেওয়া হবে গাজন উৎসবের শেষে। ধর্মরাজও অচ্ছুৎ হয়ে যান নিম্নবর্ণ হিন্দুদের ছোঁয়ায়, তাই উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের এই বিধান? লক্ষণীয়, পুজো কমিটির বর্তমান সভাপতি সুবোধ রায়, সম্পাদক অনিল পাল। পুজোকমিটিতে সদস্য হিসাবে আছেন বিভিন্ন বর্ণের মানুষ। এইভাবে এখানে একটি সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও আচারবৈশিষ্ট্য কাজ করছে দেখতে পাই।

গাজনের অর্থাৎ স্নানযাত্রার আগে একদিন জনসাধারণের পুজো নেন ঠাকুর। আর একদিন বেলেতোড়ের রায় বাড়ি অর্থাৎ জমিদার বাড়ির পুজো নেন। জনসাধারণের

---

* মতান্তরে এঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

পূজার দিন ঠাকুর দ্বারে দ্বারে যান, তাই তাকে বলে 'দাদুরঘাটা'। রাজার বাড়ি বা জমিদারের বাড়ি ঠাকুর যেদিন যান সেদিন হল 'রাজারঘাটা।' গত মঙ্গলবার গেছে 'রাজারঘাটা' আর বুধবার 'দাদুরঘাটা'। আজ বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রা। আগামী-কাল শুক্রবার চড়ক। শনিবার 'দুধ-চিড়া ভোগ'। রবিবার 'ধর্মযজ্ঞি' অর্থাৎ খিচুড়িভোগ বিলোনো হয়। ভক্ত্যাদের পালুনি শেষ হয়।

সানাইয়ের সুর বাজছে। মাতিয়ে দিচ্ছে মন। ৫টা ১৫ মিনিট বিকাল। সর্বদিকে নাটকীয় চাঞ্চল্য, ত্রস্ততা, গতিশীল প্রস্তুতি ও উদ্যম। ঠাকুরের বার হবার সময় হল। জোড় হাত করে, ছড়ি বগলে ভক্ত্যারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে—'হর হর মহাদেব'। ভক্ত্যাদের গলায় এখন ফুলের মালা, কপালে সিঁদুরের তিলক। কেউ কেউ ধ্বনি দিচ্ছে, আর কেউ কেউ মেঝেতে মাথা রেখে প্রণাম করছে। তিনটি ঘোড়ার পিঠে বিছানো হয়েছে মূল্যবান বস্তু, তার উপর তিনটি সোনালি রঙ কাঠের সিংহাসন বাঁধা হয়েছে। নাটমন্দির ছেড়ে ঠাকুরের উঠবার সময় হল। বিষণ্ণ আনন্দ সবার মনে, চোখে মুখে একাধারে আনন্দ ও বিষণ্ণতার ছায়া। পূর্বমুখী ঘোড়াগুলি দাঁড়িয়ে আছে স্থির, মন্দিরের উত্তর পার্শ্বের রাস্তায়। প্রথমে এলেন স্বরূপনারায়ণ, তাঁর অবস্থান হল সামনের প্রথম ঘোড়ায়। তারপর উঠলেন মাদানা, মাঝখানের ঘোড়াটিতে। সবশেষে বাবা ধর্মরাজ, শেষ ঘোড়াটিতে উঠলেন !

স্নানযাত্রা আরম্ভ হল। সমবেত জয়ধ্বনি ও অগ্রপশ্চাৎ তুমুল বাদ্যিবাজনার মধ্যে। একটি করে মোটা রশি বাঁধা হয়েছে ঘোড়ার পায়ের কাছে কাঠের ফ্রেমে। রশি ধরে টানছে উৎসাহী যুবকেরা। আনন্দবিহ্বল, উল্লসিত যুবকের দল। প্রথমে চলেছে স্বরূপনারায়ণের ঘোড়া, তারপর মাদানার ঘোড়া, তারপর জাতকলসী মাথায় মণ্টু নাগ, তারপর পাট মাথায় সদানন্দ পাল। সদানন্দ পালের কোন এক পূর্বপুরুষ স্বপ্নে পেয়েছিলেন ধর্মরাজকে। সবশেষে চলেছে ধর্মরাজের ঘোড়া। প্রতিটি ঘোড়ার পিঠে একজন ব্রাহ্মণ বসেছেন ঠাকুরের সিংহাসন ধরে। ঠাকুরের ও ব্রাহ্মণের মাথার উপর আছে নক্‌শি কাপড়ের বিরাট বিস্তৃত রাজছত্র, তিনটি রাজছত্র ধরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন, ঘোড়ার পাভাগের ফ্রেমের উপর। পাটে পরনো হয়েছে অনেকগুলি ফুলের মালা ; পাটের পেরেকগুলো ঠিক গোল সরু পেরেক নয়, প্রত্যেকটি ছুরির ফলার মতো চ্যাপটা। ভক্ত্যারা সমবেত হয়েছে দুদলে। সব ভক্ত্যাদের হাতের বেতের ছড়ি ঊর্ধ্বে তোলা, একের সঙ্গে অপরের ঠোকাঠুকিতে বাজানো হচ্ছে। সব জাতির বেতের ছড়ি বাজছে, সর্ববর্ণ সমন্বয়ের ধ্বনি উঠছে !

জাতকলসী মাথায় স্থির দাঁড়িয়ে আছেন মণ্টু নাগ। দু'চোখ তাঁর বন্ধ, এখন আরম্ভ পর্যায়ে তিনি যেন ভীতস্থির। গত সাতদিন ধরে হবিষ্যি করছে, আজ নিরম্বু উপবাস তাঁর। থেমে থেমে ঘোড়া টানা হচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে ঘরের ছাদে বারান্দায় দুয়ারে হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড়। দর্শনার্থীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। ওদিকে পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডুবছে, মেঘের ফাঁকে।

বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশে এখানে ওখানে মেঘের পুঞ্জ। কদিন ধরে নিদারুণ বর্ষণের পর আজ আকাশ বিশ্রাম নিচ্ছে। বর্ষণের বিরাট নেই বলে উৎসবমুখরতা বহুগুণিত হয়েছে। আমি চলেছি স্নানযাত্রী জনতার মধ্যে পায়ে পায়ে থেমে থেমে। হঠাৎ পিছন ফিরে ঘোড়ার চোখে চোখ পড়লো। কি আশ্চর্য, ঘোড়ার চোখ জ্বলছে! যেন জীবন্ত ঘোড়া' স্নানযাত্রার ঘোড়া যাবে ব্রাহ্মণপাড়া থেকে ছুতোরপাড়া, রায়পাড়া, পোদ্দারপাড়া হয়ে, রাধাবাজারের বড় রাস্তা পার হয়ে নতুন গ্রামে। নতুন গ্রামের শেষে তাঁতপুকুরে (তাঁতীপুকুর)। প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা।

পনের দিনের গাজন উৎসব, পূজাব্যবস্থার জন্য খরচের মূল টাকাটা আসে বেলে-তোড় বাজারের বিখ্যাত পানের আড়ত থেকে। নিলামের মতো বাৎসরিক ডাক হয় পান আড়তের। এ বছরের ডাক ২৫ হাজার টাকার। ঐ টাকা আর দোকানে দোকানে সারা বছরের বাক্স-কালেকশানের টাকা। কারও কারও স্বেচ্ছা দান—ডোনেশান প্রভৃতির টাকায় পূজা পার্বণ উৎসব ভোজনের খরচ যোগানো হয়। কোন বাড়ি বাড়ি চাঁদা বা ব্যক্তিনামে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা নেই। শেষ পর্যন্ত দেখে মনে হয়েছে, ব্যবস্থাপনা ভালো, কোন অশান্তি নেই, বিশেষ অনিয়ম নেই।

এদিকে যখন ধর্মরাজ ঘোড়ায় চড়লেন পাঁচটায়, ওদিকে তাঁতপুকুরের জলে ঠিক তখনই নেমে দাঁড়িয়েছে মেয়েরা। কেউ হাঁটুজলে, কেউ বা কোমরজলে। সকলেরই হাতে ঘটি, পিতলের বা কাঁসার। প্রায় ৪০-৫০ জন মেয়ে। এদের মানত আছে, পাটাস্নানের সময় এরা পাটায় জল দেবে ঘটি ভরে, তার আগে ডুব দিয়ে স্নান করে নেবে। সন্ধ্যা ছ'টা কুড়ি মিনিটের সময় জাতকলসী মাথায় এসে পেঁছোল, জলে নামলো, জাতকলসী জলে ডোবানো হল। তারপর ধর্মরাজের পাট এলো, জলে নামলো, মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে জল ঢালতে লাগলো পাটে। এতক্ষণ, প্রায় ঘণ্টা-খানেক তারা জলেই দাঁড়িয়েছিল। পাটভক্ত্যা পাট মাথায় জলে ডুব দিলেন। হাত দিয়ে পাট ছুঁতে চায় পুণ্যার্থিনীরা, সাধারণ দর্শকেরা—তারই ফলে ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি উল্লাস আনন্দ বেশ কিছুক্ষণ।

ঘোড়া? কোন ঘোড়াই এখনো ঘাটে পেঁছোয়নি। জাতকলসী ফিরে গেল। কিছু মানুষের স্রোতও ফিরে যাচ্ছে। অদূরে ঘরবাড়ির আড়াল থেকে ঢাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখনো ঘোড়া দৃশ্যমান হয়নি। শান্ত সন্ধ্যা, শান্ত বাতাস, শান্ত আকাশ। স্নিগ্ধ মনোরম পূর্ণিমা চাঁদের আলো মিশে যাচ্ছে বিজলী আলোর সঙ্গে। দক্ষিণ আকাশে যেন মেঘ জমছে, ভারি হচ্ছে, বৃষ্টি নামবে নাকি?

সময় ছ'টা চল্লিশ। উৎকর্ণ সাদা ঘোড়াটি এলো। দাঁড়ালো ঘাটের সামনে। তারপর এলো দ্বিতীয় ঘোড়া এবং তৃতীয় ঘোড়া। তিনটি সাদা ঘোড়াই দেবতা সওয়ার নিয়ে পাশাপাশি ঘাটের কাছে দাঁড়ালো উত্তরমুখ করে। দেবতারা একে একে নামলেন ঘোড়া থেকে। ঘাটের দিকে চললেন পুরোহিতের মাথায়। দর্শনার্থীদের

স্রোতও চলেছে পাটের দিকে। এখন ঢাকের শব্দ স্তিমিত। মানুষের সমবেত কণ্ঠের শিবধ্বনি স্তিমিত। যেন গাজনের একটা পর্ব শেষ হল।

পর পর তিন দেবতার স্নান হল। ঘাটের পাশে ত্রিপল টাঙিয়ে ছাউনি, তার নিচে বড় একটি কাঠের সিংহাসন পাতা। দেবতাদের অধিষ্ঠান হল সিংহাসনে। পাশে রাখা হল পাট এবং একটি জলভরা নতুন কলসী। গত বছরের জাতকলসীর বদলে এ বছরের নতুন জাতকলসী যাবে মন্দিরে সকালে। প্রতি বছর নতুন জাতকলসী বসানো হয় মন্দিরে দেবতা-বেদীর সামনে।

দেবতাদের স্নানের পর ভক্ত্যাদের স্নানের সময়। ভক্তারা স্নান করে যে যার মানত অনুযায়ী দণ্ডী কেটে চলেছে মন্দিরের দিকে। ঐ দেড় কিলোমিটার পথ তারা দণ্ডী কেটে কেটেই যাবে। এ আর এক দর্শনীয় দৃশ্য। ভিজে কাপড়ে উন্মুক্ত শরীরে মাটির ও কাঁকর পাথরের রাস্তার উপর দিয়ে ভক্ত্যারা চলেছে। দণ্ডী কাটছে দু'ধরনের ভক্তা। শয়নদণ্ডী ভক্ত্যা ও গড়ানেদণ্ডী ভক্ত্যা; সাষ্টাঙ্গে উপুড় হয়ে শুয়ে মাটিতে দাগ টেনে দেওয়া, দাঁড়ানো এবং দাগের পর আবার উপুড় হয়ে শোওয়া। এই হচ্ছে শয়নদণ্ডী ভক্তাদের চলন। কিন্তু গড়ানে দণ্ডীকাটা আরও কঠিন। কৃচ্ছ্রসাধনের চরম। হাত জোড় করে মাথার উপর তুলে শুয়ে পড়া ও শুয়ে শুয়ে পাশগড়ান দিতে দিতে শোয়ানো লাটাইয়ের মতো চলা, চোখ বন্ধ করে চলা। শয়নদণ্ডী ভক্ত্যা ও গড়ানে ভক্ত্যাদের সঙ্গে নিজ নিজ লোক আছে, মা ভাই বন্ধু আত্মীয়। তারা জল ছিটিয়ে দিচ্ছে কাঁকরে, বালিতে, মাটিতে, পাথরের রাস্তায়। আর পাখা হাতে হাওয়া করছে দণ্ডীকাটা ভক্ত্যাদের। সাধারণতঃ ছেলেরাই দণ্ডী কাটছে, মেয়ের সংখ্যা কম, একটি মেয়ে ভক্ত্যা দণ্ডী কাটছে চোখে পড়লো।

ঘাটের পাশে কাদার উপর সিংহাসনে দেবতাদের অধিষ্ঠান। মাথায় একটা বড় ছাতা ধরে আছে, রাজছত্র। এতক্ষণ যে মেয়েরা জলে দাঁড়িয়েছিল, যারা পাটে জল ঢেলেছে তারা পুজো দিচ্ছে একে একে, মন্ত্র পড়াচ্ছেন পুরোহিত। পুজা ও পুষ্পাঞ্জলি দান শেষে ঘরে ফিরে যাচ্ছে তারা আপাদমস্তক সিক্ত বসনে।

অকস্মাৎ বৃষ্টি এল তড়বড় করে। ধর্মরাজের মান রক্ষা হল। 'স্নানযাত্রায় বৃষ্টি হবেই'—এই বিশ্বাস সত্য হল। আজ সারাদিন বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিলই না, বলা যায়। তখন সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট। বেশ কিছুক্ষণ মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড় হবার পর থামলো চকিত বর্ষণ। সবাই বললেন, ভালোই হল দণ্ডীকাটা ভক্ত্যাদের সুবিধা হল, ভিজা মাটিতে ও পথে দণ্ডীকাটার কষ্ট কম।

ধুনাখলা। ধুনোপোড়া। ধুনোপোড়ার আয়োজন চলছে ঘাটের পাশে। বড় বড় মাটির খলায় পাটকাঠি, আখের শুকনো খোয়া সাজানো হয়েছে। পুরোহিত জ্বলন্ত কাঠিগুচ্ছ হাতে, মন্ত্র পড়ছেন আর খলার মধ্যে আগুন ছোঁয়াচ্ছেন, তার উপর ধুনো ছিটোচ্ছেন। দপ করে জ্বলে উঠছে আগুন, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে আগুন। পুরোহিত একটা খলায় তিনবার করে এরকম করছেন। ধুনাখলায়

আগুন ভালোভাবে ধরে গেলে মাথায় নিচ্ছে এক একজন মেয়ে ভক্তা, যাদের মানত আছে। আঁট করে পরা কাপড়, কোমরে আঁট করে জড়ানো গামছা। প্রত্যেকের মাথায় কাদামাটি ও গামছা-কাপড় টুকরো দিয়ে তৈরি বড় সাইজের বিঁড়ে বসানো। সেই বিঁড়ের উপর রাখা হচ্ছে আগুনখলা—ধুনাখলা। হাত দিয়ে খলা না ধরে, জোড় হাত করে, সামনে দৃষ্টি রেখে চলে যাচ্ছে মেয়েরা মন্দিরের দিকে। কেউ ধীর পায়ে যাচ্ছে, কেউবা ছুটে চলেছে। ধুনাখলা মাথা থেকে পড়ে যাচ্ছে না। যাতে পড়ে না যায় সেদিকে সাবধানতা অবশ্যই আছে।

ধুনা পোড়ানো যেমন মাথায় বসিয়ে হয়, তেমনি বুকে বসিয়েও হয়। একজন এয়োতি মেয়ে স্নান সেরে ভিজা কাপড়ে চিৎ হয়ে টানটান শুয়ে আছে ঘাটের জলের পাশে দেবসিংহাসনের লাগোয়া ভিজা কাদায়। তার বুকে বিঁড়ার উপর আগুন-খলা চাপিয়ে দেওয়া হল। মন্ত্র পড়া হল। আগুনছোঁয়ানো ধুনা ছিটানো হল। মেয়েটি এবার উপুড় হয়ে শুলো। তার পিঠের উপর আগুন খলা বসিয়ে ঐ একই পদ্ধতি চললো।

ঘাট প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। চারিদিকের মানুষজন চলে গেছে। দু'একজন ছাড়া। আমরাও ফিরে গেলাম মন্দিরচত্বরে। মেলা এখন জমজমাট। খুলে গেছে সব দোকানদানি, আলোয় আলোময়। সব ক'টা নাগরদোলা চরকি ঘুরছে। মন্দিরের গায়ে জড়ানো বিজলী বাতির কারুকাজ, সেখানেও আলোর নাটকীয় খেলা। দর্শক ও ক্রেতাদের ভিড় দোকানে দোকানে। তখন বাজে পৌনে ন'টা।

বাণফোঁড়। শুনশান রাত্রি। ধীরে ধীরে তাঁতপুকুরের ঘাট ও প্রান্তর জুড়ে দর্শনার্থীদের ভিড় আবার জমছে। ঢাক বাদ্যিবাজনা বন্ধ, হাউই উঠছে না আকাশে। বোমাও ফাটছে না। রাত্রি সাড়ে দশটা। রাত্রি এগারোটা, বারোটা পার হল। বাণফোঁড়া অনুষ্ঠান আরম্ভের দেরি হচ্ছে কেন ?

স্তব্ধ ঘোড়া তিনটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছে লোকেরা। পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। দড়ির অংশ ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ। লোহার লম্বা মোটা (বেশ মোটা) তার হাতে ঘুরছে ফিরছে কেউ কেউ। সেই মশালের রাশি এলো। উপর দিকটা আট ভাগে চেরা একটি কাঁচা বাঁশ এলো। কাঁচা শালপাতায় একানে ঠোঙা করে তাতে একটু একটু পুরানো ঘি রাখা হচ্ছে। পুজাকমিটির ব্যবস্থাপনায় ভাঁড়ে করে ঘি এসেছে। সবই হচ্ছে বাঁশ দিয়ে ঘেরা একটা ত্রিকোণ জায়গায়।

আড়বাণ, বাঁশবাণ, হিন্দোল বাণ, দড়ি বাণ, রড বাণ, দশমুখা বাণ, অগ্নিবাণ,—কত রকমের বাণ ! তারই সঙ্গে আছে 'ফিরফিরি' বাণ। বুধন বাউরী, কালু বাউরী, কাজল বাউরী, শিবু বাউরী। এদের বাড়ী চটি-শুঁড়িপাড়ায়। মশাল ধরিয়ে দেওয়া হয় হাতে হাতে, যখন বাণ ফোঁড়া হয়। বান ফোঁড়ার ওস্তাদি কাজ করবে দু'জন অভিজ্ঞ মানুষ—রবি ধীবর আর তার ভাইপো স্বপন ধীবর। রবি বাণ ফোঁড়ার কাজ করছে আজ প্রায় ২৫/২৬ বছর। স্বপন বছরআটেক। রবির

বাপ ঠাকুর্দা'রাও এই কাজ করে গেছে। রবি ছাঁদাড়ে যায়, পাঁচাল গ্রামেও যায়, শিবের গাজনে চৈত-বোশেখের গাজনে ঐ একই কাজ করতে, বাণ ফুঁড়তে। রবির বয়স ৫৫/৫৬ বছর। পরনে লুঙ্গি খাটো করে পরা, বাম হাতে রিস্টওয়াচ বাঁধা। মাথায় কাঁচা পাকা চুল, ছোট ময়লা বুকখোলা ফতুয়া, গলায় ক'টি রুদ্রাক্ষ দিয়ে গাঁথা মালা। মুখে বিড়ি জ্বলছে ঘন ঘন। লাল চোখ। আর অনর্গল কথা বলছে, ধমকাচ্ছে। ছুরি, মশাল, ঠোঙা, ঘিয়ের ভাঁড় নিয়ে বসে আছে প্রবীণ রাখো বাউরী, সুরিন্দ্র বাউরী। এরা দু'জন ধীর একাগ্র নিষ্ঠায় বাণ ফোঁড়ার প্রস্তুতি করে চলেছে।

প্রথম বাণফোঁড়। কমল বাউরী। ৫০/৫১ বছর বয়স। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছে লোকটি। দু'চোখ বন্ধ। গলার শাঁখনলীর সামনের চামড়া দু'আঙুলে টেনে ধরে ফুটো করে দিল রবি ধীবর, তারপর সেই ফুটোয় ঢুকিয়ে দেওয়া হল একটি মোটা দশ হাত লম্বা তার। লোহার তার। তারের দু'পাশে ধরলো দু'জন। ক্ষতস্থানে ঘি লাগিয়ে দেওয়া হল। হাত জোড় করে উঠে গেল লোকটি। তার সঙ্গে চলেছে ঢাকের বাদ্য। নাচতে নাচতে চলেছে লোকটি মন্দিরের দিকে।

তারপর এলো পাঁচ ছয় সাত আট বছরের বালকের দল। সবার হাতে কুড়ি পয়সা দিয়ে কেনা এক একটি রঙিন কাগজের ফিরফিরি। বাতাস লেগে যে ফিরফিরি ঘোরে। ফিরফিরির বাঁশবাখারির শেষ অংশ ছুরি দিয়ে কেটে কেটে ছুঁচোলো করা হল। প্রত্যেক বালকের বাম হাতের বাইসেপের পেশীর উপরের চামড়া টেনে ধরে ফুটো করা হচ্ছে আর পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঐ ফিরফিরি কাঠির ছুঁচোলো অংশ। নিজেরই বাম হাতটি বাঁকিয়ে ঐ নিজ নিজ বাণ ধরে রাখছে বালকেরা। তারপর ঢাকের সঙ্গে আনন্দে নাচতে নাচতে চলেছে মন্দিরের পথে। ১৫/১৬ জন বালকের বাণফোঁড় শেষ হল। মুনা লোহার, রমেশ লোহার, গণেশ, পার্থ, বুধন লোহার। কেউ কেউ ভয় পাচ্ছে ফোঁড় দেবার আগে। রবি বা স্বপন তাদের মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে অন্য দিকে, ফোঁড়া দেখতে দিচ্ছে না। ফোঁড়া হয়ে গেলে ভয় চলে যাচ্ছে। মুখে আনন্দের আভা জাগছে। রক্ত পড়ছে না অধিকাংশেরই ক্ষতস্থানে। সমস্বরে ধ্বনি উঠছে— 'বল বাণেশ্বর নাথমুনি মহাদেব'।

কালুবতু। ইস্পাতের তৈরি, এক ইঞ্চির মতো লম্বা। সামনের দিকটা শাণিত ধারালো ছুঁচোলো এবং পিছন দিকটা ফাঁপা ও গর্ত। ঐ গর্তে লোহার তার বা ফিরফিরির কাঠি বাঁশচেরাতি পুরে ধারালো মুখটা দিয়ে চামড়া ফুঁড়ে চিরে কালুবত টেনে বার করে নেওয়া হচ্ছে। চামড়ার ফুটোর মধ্যে থেকে যাচ্ছে বাঁশ চেরাতি বা তার বা দড়ি অর্থাৎ থেকে যাচ্ছে 'বাণ'। এভাবেই কালুবতু দিয়ে বাণ ফোঁড়া হচ্ছে। বাণফোঁড় শেষ হলে, বাণফোঁড়া অনুষ্ঠান শেষ হলে কালুবতু জমা পড়বে পুজো কমিটির হাতে, আবার সামনের বছর বাণফোঁড়ের সময় রবি বা স্বপন হাতে পাবে কালুবতু।

বাঁশবাণ। একটি কাঁচা বাঁশের উপরের অংশটা ফাটিয়ে আটটা বাখারি বার করা হয়। বাখারির ডগা চেঁছে ছুলে সরু করা হয়। বাখারিটা ঘুরিয়ে এনে বিঁধে দেওয়া হয় বাম হাতের পেশীর উপর চামড়ায়। আটটি বাখারি গোল করে নোয়ানো থাকে, আট দিকে আট জনের বাহুতে বেঁধা থাকে। মাঝখানের আস্ত বাঁশটা একজন আলাদা লোক ধরে ধরে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চলে বাঁশবাণ বেঁধা ঐ আটজন। বাঁকা বাখারিগুলো দেখে মনে হয় যেন দেবী ছিন্নমস্তা নিজের ফিনকি দেওয়া রক্ত নিজে পান করছেন। ঢাকের শব্দের তালে তালে নেচে নেচে বাঁশবাণ চলার সময় ভারি সুন্দর দেখায়।

বাণফোঁড়ায় কোন মন্ত্র উচ্চারণ নেই, ঔষধ নেই। যারা বাণ ফোঁড়াচ্ছে তারা 'উপাস' (উপবাস) করে নেই, কোন মানত নেই তাদের। শুধু একজন 'উপাস' করে আছে। শুদ্ধাচারে আছে। শেষ বাণ দশমুখাবাণ, ধর্মরাজের বাণ, সেই লোকটি নেবে। ধর্মরাজের বান—দশমুখাবাণ ফোঁড়া হয়ে গেলে আর অন্যকে ফোঁড়া হয় না, নিয়ম নেই।

একজন করে ফোঁড়া হচ্ছে, আর তার সঙ্গী নিচ্ছে মশাল—জ্বলন্ত মশাল। মোটা তারে বা রডে মাখানো হচ্ছে ঘি যাতে ফুটো চামড়ার মধ্য দিয়ে সহজে যেতে আসতে পারে তার বা রড। হাতের তালু মশালের আগুনে ধরে সেই তাপ বাণবিদ্ধ ক্ষতস্থানে দিচ্ছে কেউ কেউ। বুকে হাতের পেশীতে বা গলায়। প্রায় সকলেরই বাম হাতে বা বাম বুকে ফোঁড়া হচ্ছে, ডান হাতে নয়। ডান বুকে, দু'এক জনের, খুবই কম। জিভেও বাণ ফোঁড়া হল। মোট বাণফোঁড় নিল ৬০/৬২ জন। অন্য বছর সংখ্যায় বেশি ছিল।

মধ্যরাত্রি। আকাশে পূর্ণ চাঁদ। নির্মল আকাশ। নেপাল মালি জিভে রডবাণ ফোঁড়ালো। জোয়ান চেহারা। হাঁটু গেড়ে বসেছে লোকটি। বসার আগে মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে তাঁতপুকুরের ঘাটে অবস্থানরত ধর্মরাজকে প্রণাম করলো। মুখ তুলে জিভ বার করেছে নেপাল মালি। রবি জিভটা গামছা দিয়ে টেনে ধরে মুছে নিল। তারপর খালি হাতে জিভটা ধরে, জিভের একপাশে কালুবতু দিয়ে ফুটো করে মোটা তার বা রড ঢুকিয়ে দিল। ঘিমাখানো তেলতেলে করা রড বা তার। তারই সঙ্গে আরও একজনের জিভে ঐ একই বাণ রডটি ফোঁড়া হল। দ্বিতীয় জনের নাম তারক লোহার। ওরা দু'জনে পাশাপাশি একই বাণ মুখে নিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে। বীভৎস, ভয়ংকর, আকর্ষণীয়! দেখা যায় না স্থির চোখ মেলে। দু'জনের জিভের মধ্য দিয়ে ঐ দীর্ঘ রড যাওয়া-আসা করছে। কিন্তু মন্দির পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার রাস্তা ওরা নেচে নেচেই যাবে। যাচ্ছে। আমি ওদের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছুটা গিয়েছি। দু'জনেই জিভ মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে। জানি না যন্ত্রণা হচ্ছে কিনা। তবে জিভের মধ্য দিয়ে একই রডবাণ যাওয়া-আসা করছে, নাচের তালে তালে। রক্ত ঝরছে। ঢাক বাজছে। অবিশ্বাস্য দৃশ্য!

জিভে বাণ অর্থাৎ আড়বাণ নেবে আরও একজন। বীরদর্পে, জড়িত গলায় সে আমার কাছে তার নাম ঘোষণা করলো। 'লিখে নেন বাবু আমার নাম, আমার নাম ভজু বাউরী'। 'শিরুষে আমার ঘর'। তার হাতে সাদা মোটা একটা দড়ি। বাবরি চুল, রোগা টিংটিংয়ে শরীর, রঙ কালো, পরনে আঁট করে লুঙ্গি বাঁধা, খালি গা, মাথায় খাটো মানুষটি বারবার বলছে—'আমার কথা ভালো করে লিখবেন, হুঁ'। জিভ ফুটো করে দড়ি গলিয়ে দেবার পর ভজু চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ আছে বাণফোঁড়া। আমরা মন্দিরের রাস্তায় এগিয়ে গেলাম। বাণবিদ্ধ ভক্তাদের গতিবিধি দেখবার জন্য। রাস্তার বিভিন্ন অংশে বাণভক্ত্যাদের নাচ জমেছে। সঙ্গে কোথাও ব্যান্ড পার্টি, কোথাও সানাই ঢোল চড়চাড়। কোথাও সঙ্গে আছে ব্যাগপাইপ ও সানাই।

ভজু!! চমকে উঠলাম, শিউরে উঠলো গা। সাদা দড়ির মাঝখানের হাতখানেক অংশ কাঁচা রক্তে লাল। ভজুর খোলা বুকে রক্ত ঝরছে। গায়ে একটা গামছা জড়াচ্ছে ভজু, সেই গামছাতেও রক্ত। ভজু এগিয়ে পিছিয়ে, একা নাচছে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে। তার জিভে গাঁথা দড়িটা দু'দিকে দুজন ধরে আছে। তাকে ঘিরে অনেক দর্শক এবং বাদ্যিবাজনা। ভজু হাঁপাচ্ছে, রাস্তার সিক্ত ধুলোয় বসে পড়ছে, হাঁপাচ্ছে—বিশ্রাম নিচ্ছে, আবার উঠে নাচছে। নাচতে নাচতেই নাচের ভঙ্গি পাল্টাচ্ছে। আমি বর্ণনা করতে পারবো না। রায়গুণাকর রাজসভাকবি ভারতচন্দ্র হয়তো এর সার্থক বর্ণনা দিতে পারতেন; অন্নদামঙ্গল কাব্যের দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার বর্ণনা, শিব বিবাহের বর্ণনা যিনি করেছেন, তিনিই ভজুনৃত্যের বর্ণনা করতে পারতেন। ভজুরই মতো আরও যেসব বাণভক্ত্যা স্থানে স্থানে রাস্তা জুড়ে নাচছে, তাদের সমবেত বর্ণনা দেবার ক্ষমতাও আমার নেই।

ভজু নাচছে। তারই মধ্যে চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিচ্ছে—'ও নাথমুনি মহাদেব'! পরনের লুঙ্গি বাঁকা হাতে তুলে ধরে, মাথা নিচু করে, বঙ্কিম দেহে ছন্দ তুলে ভজু নাচছে, ভুষুণ্ডীর মাঠের প্রেতের মতো—উদ্দাম বীভৎস নৃত্য। স্বাভাবিক চোখে বেশিক্ষণ দেখা যায় না। জিভের মধ্যে দড়ি যাওয়া-আসা করছে। ওকে হাওয়া করে চলেছে ওর সঙ্গের লোক, তালপাতার পাখায়।

ফিরে গেলাম তাঁতপুকুরের ঘাটে। বাণফোঁড়ের জায়গায়। একজন বাউরী মা এসেছে তার দুই শিশু পুত্রকে বাণ ফোঁড়াতে। রবি চলে গেছে, দায়িত্ব পালন করছে ভাইপো স্বপন। বালক শিশু দুটির বাম হাতে বাণ ফুঁড়ে দিল স্বপন। শিশু বালক দুটি নাচতে নাচতে চলে গেল। সঙ্গে ঢাকের বাদ্য। বাউরী মা, যুবতী বয়েস, নিজে বাণ ফোঁড়াতে চাইলো, কিন্তু অধিকার মিললো না। এ আসরে মেয়েরা কেউ বাণ ফুঁড়লো না। মেয়েদের কি অধিকার নেই? একজন মাঝবয়সী মেয়েও এগিয়ে এসেছিল বাণফোঁড় নেবে বলে। তাকে বাণ দেওয়া হল না।

হিন্দোল বাণ! ওপাশে একটা বেলুনের মালা দিয়ে সাজানো। গরুর গাড়ি

দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির উপর বাঁশের মাচা বাঁধা। এগিয়ে এলো ৩৫ বছরের সুধীর মণ্ডল। তার দু'টি পা এখন উপরদিকে তুলে আড়াআড়ি বাঁশের সঙ্গে বাঁধা। গরুর গাড়ির উপরে! তার মাথা নিচের দিকে ঝুলছে, দুলছে। তার ঠোঁটে বিঁধে দেওয়া হয়েছে বাণ। গরুর গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে উৎসাহী ছেলেরা। সঙ্গে ঢাক ঢোল বাজছে। জয়ধ্বনি উঠছে। এই গাড়ীবাণ বা হিন্দোল বাণ দর্শকেরা অবাক হয়ে দেখছে। গরুর গাড়ি চলেছে মন্দিরের পথে।

দশমুখো বান, অগ্নিবাণ। রাত সোয়া তিনটে। ইতিমধ্যে আরও কিছু বাণ ফোঁড়া হয়েছে। এবারে ফোঁড়া হবে শেষ বাণ, ধর্মরাজের বাণ! আড়বেতাল গাঁয়ের দুগাই বাউরী প্রস্তুত। হবিষ্যি করেছে, 'উপাস' করে আছে সে। বয়স ৪০/৪২ বছর। পদাই লোহার আগে এই দশমুখোবাণ ধারণ করতো। সে মারা গেছে। দুবাই নতুন লোক, এবারই প্রথম। খুব শক্ত এ-বাণ ধারণ করা। প্রায় এক হাত করে লম্বা সরু লোহার ত্রিশূল দশটা। হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসেছে দুগাই। ঘাটের দিকে মুখ করে, যেদিকে ধর্মরাজ-মাদানা-স্বরূপনারায়ণ অবস্থান করেছেন। একটা লোহার পাতের বেল্ট পিঠ থেকে মাথার উপর দিয়ে বুক পর্যন্ত পরানো এবং বাঁধা হল। বেঁধে দেওয়া হল তিনখি' দড়ি দিয়ে কোমরে পেটে বুকে। লোহার পাতের বেল্টে আছে কয়েকটি গোল লোহার রিং। পিঠের দু'পাশে চামড়ায় সার করে ৪+৪=৮টি ত্রিশূল বিঁধে দেওয়া হল। এবং কায়দা করে ঐ বেল্টের রিংয়ের সঙ্গে আটকে দেওয়া হল। কপালের দু'পাশে অন্য দুটি ত্রিশূল বিঁধে দেওয়া হল এবং মাথার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। তারপর পিঠের দিকের ত্রিশূলের ফলাগুলিতে ধুনাতেল ভেজানো ন্যাকড়া জড়িয়ে দেওয়া হল। মশালের মতো আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। এ সবকিছুই করলো স্বপন, বেলেতোড়ের ৺নরহরি ধীবরের ছেলে। দশমুখা-বাণ-ভক্ত্যা দুগাইয়ের গলায় দুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ফুলের মালা, গোড়ে মালা। সে এখন ধীরে পায়ে চলেছে মন্দিরের দিকে। সে তার দুই হাত বুকের কাছে জোড় করে নমস্কার করার ভঙ্গিতে ধরে আছে। তাকে ঘিরে শান্ত উল্লাসহীন জনতা। অনেক-গুলি ঢাক ঢোল বাজছে, সংযত তালে। এই ধীরতা, সাবধানতা, ভয়মিশ্রিত ভক্তি-মগ্নতা সবিশেষ লক্ষণীয় ছিল।

আমি তাদের পিছু নিয়েছি। দুগাইয়ের পিঠে বাঁধা ত্রিশূলের অগ্নিশিখায় ধুনা ছিটোতে ছিটোতে চলেছে স্বপন। আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে, কখনো দাউ দাউ করে। আমি দেখতে চাইছি, দুগাইয়ের পিঠে আটটি ত্রিশূলবিদ্ধ ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে কিনা। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, রক্ত পড়ছে না! ধর্মরাজের কৃপা? মন্দিরচত্বরে যখন দুগাই ও স্বপন পেঁছোল তখন শেষ রাত্রি ৪টে ১০ মিনিট।

ভক্ত. দর্শনার্থী, মেলার নারীপুরুষ মন্দিরের আশেপাশে জেগে আছে, বসে আছে, কেউবা এখানে ওখানে ঘুমিয়ে পড়েছে। দুগাইয়ের পিঠ থেকে ত্রিশূল বাণগুলি খুলে দিচ্ছে স্বপন। আলাপ করলাম দুগাইয়ের সঙ্গে।

শেষ রাত। গাজনের প্রধান রাত ও সেরা অনুষ্ঠানের শেষ। ফেরার সময় হল। বেলেতোড়ের বাস স্ট্যান্ড। ঘরমুখো অনেক নারী-পুরুষ। কারও হাতে সাদা ঘোড়া, কাঠের, ধর্মরাজের ঘোড়ার আদলে তৈরী। কারও হাতে সৌখীন পুতুল। রাম সীতা। শুশুনিয়া পাথরের ধূপদানী। কারও হাতে ঝিলিপির (জিলাপির) ঠোঙা। ধর্মরাজকে পূজার ডালায় দেবার রীতি খইয়ের নাড়ু, খইচুর। মেলা ফেরৎ মানুষের ঘরে আনার রীতি ঝিলিপির ঠোঙা। প্রিয়জনদের জন্য।

ফিরতি বাসের অপেক্ষায় বসে আছি। আর ভাবছি। ভাবছি ভজুর কথা। ভজুর কি হল ? সে এখন কেমন আছে! ঐ রাতের বাণফোঁড়ের জায়গায় আলাপ, মঙ্গলকোট থানার পালি গ্রামের জয়দেব পালের সঙ্গে। তাঁদের গ্রামেও শিবের গাজনে এমনই বাণফোঁড় হয়। প্রতি বছর জিভ ফোঁড়াতে ফোঁড়াতে জিভ অসাড় হয়ে যায়। ভালো করে তখন আর কথা বলতে পারে না, জিভ এমনই অসাড় হয়ে যায়। ঐ জিভফোঁড়া ভক্ত্যারা বাড়ি গিয়ে ভাত ডাল তরকারি ঝাল খাবে, কিছু হবে না। তবে আয়নায় জিভ দেখতে নেই, কোন ঔষধ দিতেও নেই, ডাক্তার দেখানোও বারণ।

ধর্মরাজের মহিমায় আমি অভিভূত। 'জিভ অসাড় হয়ে যায়'—জয়দেব পালের মন্তব্য আমি ভুলতে পারছি না। ভজুর জন্যে মায়া হচ্ছে। ভাবছি, আজকের গাজনের 'নায়ক' ভজুকে একদিন দেখতে যাবো।

বাঁকুড়া হিতৈষী। ১৩৮৮

ওরা কী মন্ত্র বলে ?

সাপ নিয়ে তিন শ্রেণীর মানুষের কারবার। সাপুড়ে—সাপ ধরে, সাপ-খেলা দেখায়। দ্বিতীয় শ্রেণী—সর্পবৈদ্য। সাপ দংশন করলে বিষমুক্তির চিকিৎসা করে। এদের গ্রামীণ ভাষায় বলে 'গুণিন'। এরা সাপের বিষও বিক্রি করে। সাপের বিষে নানা জীবনদায়ী ওষুধ হয়। তৃতীয় শ্রেণী—সর্পগবেষক বৈজ্ঞানিক। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিষবৈদ্য বা গুণিনদের নিয়েই আজকের কথাবার্তা। তার সঙ্গে আরও কিছু বৈচিত্র্য।

মন্ত্র পড়লে সাপকাটি বিষক্রিয়া থেমে যায়। বিষ জল হয়ে যায়। এ বিশ্বাস আজও অনেকের আছে। antivenin সিরাম ঔষধের যুগে ডাক্তারদের উপরেই বিশ্বাস করা উচিত। কিন্তু বিশেষ অভিজ্ঞ, পাশকরা ডাক্তাররাও সব রোগী বাঁচাতে পারেন না। তবু মন্ত্র হচ্ছে বুজরুকি, গুণিনরা হচ্ছে ঠক প্রতারক—এমন সোচ্চার আলোচনা সর্বত্র চলে। মন্ত্র ছিল, মন্ত্র আছে। আমাদের অপৌরুষেয় বেদগ্রন্থে, অথর্ববেদে সাপের মন্ত্র অনেক আছে। আজও সর্পদংশনভীত আমরা ওঝাকে ডাকি। আজও বলি, বিখ্যাত কোনো ডাক্তারের ঔষধের আশ্চর্য কার্যকারিতা দেখে যে 'ওষুধটা মন্ত্রের মতো কাজ করেছে'। মন্ত্রে বিশ্বাস আমাদের রক্তে, আমাদের অন্তর্গত রক্তধারায় প্রবহমান। রক্ত কেমন করে বইছে আমাদের দেহের অন্ধকার শিরায়-শিরায় তা আমরা দেখতে পাই না। রক্ত তবু বইছে। মন্ত্রে বিশ্বাসও তেমনি মনে চেতনায় অন্তঃসলিলা প্রবহমান।

কিন্তু ওরা কী মন্ত্র বলে? ওরা ঝাড়ফুঁক করে, হাত চালে। জড়িবুটি দেয় আর মন্ত্র পড়ে। ওরা বলে 'বিষ হো জা পানি'। বিষ পানি হয়ে যায়। বিষ জল হয়ে যায়। মুমূর্ষু মানুষ বেঁচে ওঠে। যম ফিরে যায়। ওরা একের পর এক নির্ধারিত মন্ত্র পড়ে আর গুরুর দোহাই দেয়, দেবদেবীর দোহাই দেয়। কখনও তর্জন-গর্জন করে, অশ্লীল গালাগালও দেয়। কখনও অনুনয়-বিনয় করে, প্রার্থনা করে। অঝোরে কাঁদে।

মন্ত্র অনেক, অনেক প্রকার। মন্ত্রের অনেক নাম। যেমন—'চাটসার' মন্ত্র। (১) ওহো কাঞ্চন মোহ বানি। কামড়ে খালি সাপা মচড়ে পানি॥ (২) থুক থুকান্তি, ব্রহ্মা থুকান্তি; থুক করিলাম জেঞী, বিষ নাঞী তেঞী॥ (৩) ছিট ছিট ছিটকানি, যা চাইতে বিষ পানি। (৪) রক্তে ঘোরও হাড়ের মালা। দেবীর স্মরণে বিষ উড়িয়ে পালা॥ (৫) বলরাম গুরু, মহাদেব সিসু। লাগল চোট উড়ল বিষ। (৬) শ্বেত পায়রা নীলবরন। উড় বিষ তুই তিন ভুবন॥ চোটসার

---

* প্রবন্ধে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়েছে বাঁকুড়া জেলা ও হুগলী জেলার নানা গুণিন বা ওঝার কাছ থেকে।

মন্ত্রের আরও রকমফের আছে। ওদের উচ্চারণের ঢঙে এবং ওদের লেখা বানানে মন্ত্রগুলি তুলে দিলাম।

এমনি পর-পর মন্ত্র আউড়ে সর্পবৈদ্য তার কেরামতি দেখাতে থাকে। সাপখেলা দেখাবার সময় সাপুড়ে বাঁশি বাজায়। উদ্যতফণা সাপের মুখের সামনে বন্ধমুঠি হাত ঘোরায়। সাপের সামনে উবু হয়ে বসে এক পায়ের হাঁটু দোলায়। তুম্ব বাঁশি বাজাতে-বাজাতে তালে-তালে দোলায়। সাপ উচ্চকিত হয়ে ওঠে। ফণা দোলাতে থাকে। কখনও বা ফোঁস করে সামনের লক্ষ্যবস্তুকে দংশন দিতে চায়। পয়সা পড়ে দর্শকদের বিস্ময়ের মুঠি থেকে। কেউ ভয় পায়, মুখে শব্দ করে সরে যায়। সাপের খেলা দেখায় যত ভয়, তত আকর্ষণ। ভয়মিশ্রিত আকর্ষণের জন্যই সাপুড়ের বাঁশি বা ডুগডুগি এত জনপ্রিয়। এত নাটকীয়। কিন্তু সাপ-খেলা দেখায় যারা তারা কী মন্ত্র বলে? কেমন করে তারা সাপকে বশ করে? সাপকে বশ করারও নানা মন্ত্র আছে। তার মধ্যে একটি—স্বর্গের তুলসি মত্তের মাটি। লাগ লাগ সাপুন্যেকে দন্ত-কপাটি। / চব্বিশ দন্তে করিস ঘা। / মুই স্মরণ করছি গুরু ওস্তাজের পা॥ / এগাস তো গরুড়ের মুখে, পেছাস তো মা মনসার দুহাই। / তোকে খেলু খেলিতে করিবি ঘা, / আমাকে রক্ষা করিবেন জগৎগৌরী মনসা মা॥

ওস্তাজ অর্থাৎ ওস্তাদ। গুরু ওস্তাদের স্মরণ, দেবী মনসার স্মরণ প্রায় সব মন্ত্রেই আছে। তবু আমরা জানি, খেলানোর জন্য সাপ যখন আনা হয়, পাড়ায়-পাড়ায় ঘোরা হয়, তখন সেই সাপের বিষ থাকে না। আগেই বিষদাঁত ভাঙা মানে সাপের মুখের ভিতরের অংশে, দাঁতের সারির দুপাশের দুটি বিষের থলি তুলে ফেলা। কমলালেবুর কোয়ার মতো দুটি বিষথলি। সত্যি-সত্যি সাপের কোনো দাঁত বা বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হয় না। বিষথলিহীন সাপ কামড়ালেও বিষ তখন ঝরে পড়ে না কাটা ঘায়ের উপর, সাপকাটি ক্ষতস্থানে। অতএব বিষক্রিয়াও হয় না। তবু, মন্ত্র কাজ করে অথবা সর্পগুণিনের হাতের কারিগরি কাজ করে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। আরও একটি জানার কথা আছে।

বিষধর সাপ সাধারণত একচোখ-কানা হয়। যে চোখ কানা, সেদিকে সাপ দংশন করতে, ছোবল দিতে পারে না। সাপে-নেউলে লাফ দিয়ে সাপের মুখ বা ফণা কামড়ে ধরে, ঠিক সেই দিক থেকে, যে দিকের সাপের চোখ কানা। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, উদ্যতফণা সাপ ফণা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে আর বিপদ বুঝলে পিছিয়ে আসে।

ঝাঁপানের সময়, শ্রাবণ-ভাদ্রে, সাপের খেলা আরও জমজমাট। চার-পাঁচটি মাচান থাকে। মাচানের উপরে সাপ নিয়ে উপস্থিত থাকে গুণিনেরা, সাপুড়েরা এক পক্ষ অন্য পক্ষের সাপের ফণা তুলে ওঠানামা নিরোধ করে দিতে পারে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হবার আগে এবং ঝাঁপান খেলার সময় আত্মরক্ষা-সূচক মন্ত্র আছে। একগুচ্ছ মন্ত্র এখানে দিলাম, বাঁকুড়া জেলার গুণিনরা ব্যবহার করে।—(১) জং জাং বিজং বিজং জানি। / হরির স্মরণে বিষ পানি॥

(২) জাঙ্গিনি জঙ্গের ঘা অস্ত ঝিয়ারি কোছেন / দ্রিঙ্গিনি সহায় বিষ পানি। (৩) বং কাচ কুচ শারং শারং বলি স্মরণে বিষ যারে পাতাল। (৪) বং বাসা সং সই শং শাম সিঙ্গিনি। / যো রিঙ্গিনি শাহায় বিষ পানি ॥ (৫) যো হলাহল হর-পার্বতী শাহায় বিষ পানি।

তান্ত্রিক সাধকের পুজো-আচারে যেসব শব্দমন্ত্র শোনা যায়, এইসব মন্ত্রও যেন অনেকটা সেইরকম। এইসব শব্দে বা মন্ত্রে নাকি 'শক্তি' আছে। আসলে যারা সর্পবেদে তারাই বেদে বা বেদুইন। বৈদিক যুগের আর্যরা ছিলেন বেদবক্তা। তাঁরা স্মৃতিতে ধারণ করতেন বেদমন্ত্রগুলি। পরিভ্রমণের সময় এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যেতেন। সেই মন্ত্রধারকরাই আজকের 'বেদে' অর্থাৎ সর্পবৈদ্য প্রভৃতি।

ঝাঁপানের সময় 'ভেরে'-দেওয়া ব্যাপারটি দেখা যায়। একটি মাচানের কোনো এক গুণিন হয়তো হঠাৎ মূর্ছা গেল। তখন 'ভার-কাটা' মন্ত্র পড়ে তাকে অবশ অচৈতন্য অবস্থা থেকে বাঁচাতে হয়। 'ভার-কাটা' মন্ত্র এইরকম—সপ্তের স্বরজ গোঁসাই সফেদ বরন ভারবান। / কুজ্ঞান চালন কেটে বিষ উড়াচ্ছেন পবন ॥ / জরৎকার মুনি, মনসা যার নারী। / আমুকার অঙ্গের কালকুটির বিষ রেখে যাস। / জরৎকারের মাথা খাস। / দুহাই জরৎকারি, দুহাই জরৎকারি ॥ জরৎকারু মুনি হচ্ছেন দেবী মনসার স্বামী। খুব রাগী মুনি। মন্ত্রে তাঁর দোহাই দেওয়া হয়েছে।

ঝাঁপানের সময় 'বাণ' মারা হয় প্রতিপক্ষকে। মন্ত্রবাণ। হাতের মুঠিতে মুঠিভর ধুলি নিয়ে পড়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয় প্রতিপক্ষের দিকে। তখন কী মন্ত্র পড়া হয়? বিচিত্র নাটকীয় মন্ত্র—জয় জয় কোরে হুহুংকার ছাড়ে। / পর্বতশিখর ভাঙিলেক ঝড়ে॥ / অগ্নিবাণ, শরবাণ, সারারাত আর। / বালির প্রতাপে সব ছাড়ে হুহুংকার ॥ / মুষ্টিক করিয়া বালি ফেলে দিলাম অমুকের বুকে। / রক্ত ওঠ ঝলকে ঝলকে তার মুখে ॥ / হ্রীং ধ্রীং ব্রং ধুধু সাহা। / এ বাণ ফিরিবার নয়—এ বান ফিরলে কাউর কামীক্ষার দোহাই॥ এই হচ্ছে 'ব্রহ্মাস্ত্রবাণ' মারার মন্ত্র। বিখ্যাত পূর্বভারতের শক্তিপীঠ কাউর-কামাখ্যার দোহাই দেওয়া হয়েছে ওখানে। এর সঙ্গে কিছু দ্রব্যগুণের সংযোগও আছে। যেমন বাজপড়া বৃক্ষের ছাল, মুষ্টিক গ্রহণের ধান, পাঁচ কড়ার সিঁদুর মন্ত্রপুত করে তিনবার ভূমিতে নিক্ষেপ করতে হয়। আবার 'লবকুশ' বাণের মন্ত্র আর-এক রকম।

গা বান্ধা মন্ত্র, রক্তকাঞ্চনী মন্ত্র, খলামকুচি পড়া মন্ত্র, আপ্তসার মন্ত্র, চমকসার মন্ত্র, শাঁকাবারা মন্ত্র, উড়ান মন্ত্র, কাঁড়চালা মন্ত্র, বশীকরণ মন্ত্র, অগ্নিগড় মন্ত্র ইত্যাদি আরও নানা মন্ত্র আছে। সরষেপড়া, তেলপড়া, জলপড়া, গামছাপড়া, প্রভৃতি মন্ত্রও আছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই মন্ত্র আছে।*

---

* এ বিষয়ে গবেষণা ও ক্ষেত্রসমীক্ষা এখনো চলছে পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে।

পরকুল মেলায় রঙের গান

এই নিয়ে তিন তিনবার। পরকুলের মেলা। ঐ মেলায় গেলেই আমার নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। পিছটানের শেষ খুঁটোটা উপড়ে দিয়ে এবারেও গিয়েছিলাম পাগল শীতে। উজ্জ্বল নীল রোদে ভরন্ত পরকুল দহে। কাঁসাই নদীর খাত সেখানে ঠিক চন্দ্রাকার—অর্ধচন্দ্রাকার। ছোট ছোট খাঁজে মাথাতোলা বন্ধুর পাথর, বালি, জল। স্থির সবুজাভ জল, তাই দহ। আর ওদিকে স্রোত—কাঁসাই নদীর ঠান্ডা শুভ্র জল নুড়ির উপর দিয়ে তরতর বইছে। পেঁাছেছি পৌষ সংক্রান্তির সকাল সাড়ে নটায়।

এবারে গিয়েছিলাম রঙের গান শুনতে। রামরাজাতলার সুনীতিকুমার সঙ্গে ছিল। বললো—"মানে দোলের গান? আবীর ছড়িয়ে!" না, এ গান আবীর উড়িয়ে দোল উৎসবের গান নয়। চৌরঙ্গীর ওয়াই. এম. সি-র তপন পর্যন্ত বিস্ময় জানালো। সহজে বিস্ময় জানায় না সে। দুর্ধর্ষ ডক্টরেট রামানন্দ হিসেবি মানুষ, ঝানু লোক, বুশ রেকর্ডার নিয়ে ছুটোছুটি করছে। ২৫/৩০ হাজার মানুষের মেলা। মাহাতো, মাঝি, খেড়িয়া, দাস, বাউরি, সরেন, বাগ্দী, শবরদের তুষু মেলা। গানে গানে, নৃত্যে, উল্লোল উল্লাসে, বাদ্যে চিৎকারে ভরিয়ে তোলা একদিনের মেলা। খাতড়া থেকে ছ'মাইল, পথে বাস থেকে নেমে হাঁটতে হয় ধরাগাড়ি মোড় থেকে। ঝিলিমিলির পথে গেলে ঘোড়াধরা হাটে বা আটকুড়ার মোড়ে নেমে হাঁটা বা উঁচু থেকে আঁকাবাঁকা পথে নিচের দিকে নেমে আসা। অবশ্য মেলার দিন শত শত বাস, লরি, টেম্পো, সাইকেল যায়। ভাড়া খাটে। আপানারাও যাবেন। কোন প্রকারে ১০টা-১১টার মধ্যে পেঁাছোবেন। মধ্য দুপুরে মেলা ভরভরাট হয়ে ওঠে। শব্দে সুরে রঙের বৈচিত্র্যে আপনি তখন দিশেহারা হয়ে গেছেন। বাঁকুড়া সদর শহর থেকে জিপ বা ট্যাক্সি নিলে সবচেয়ে ভালো। পরকুল গ্রামের হরিপদ মাহাতোর বাড়ি পর্যন্ত সে গাড়ি পেঁাছোবে।

দুজন কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণ। কালো রুপন, খাটো-মাথা চেহারা। জঙ্গল-ঘেঁষা মানুষ। বড় ক্লান্ত, মহুয়ারসের উৎক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে সাত মাইল হেঁটে আসার পথে। দুজনের হাতে দুটি গাছের ভাঙাডাল। নাচতে নাচতে, মৃদু তালে দুলতে দুলতে গাইছে—

---

* কেউ কেউ 'পোরকুল' 'পরকুল' উচ্চারণও করেন। এই দুটি বানানও ব্যবহৃত হয়েছে।

দিনেক দুই পরে
আর দেরি নেই
দিনেক দুই পরে—
তোকে ছুঁবেক না লো কুকুরে।
ভালো মন্দ না চিনিলি
চললি লো টাকার তরে।
না চিনিলি আসল নকল
না চিনিলি আমারে।

এ গান এরা পেলো কোথায়? এই অশিক্ষিত বনজ সুরমত্ত দুই ব্যর্থপ্রেমিক? বড় অভিমানে এরা বলছে "না চিনিলি আমারে"। চাপা দুঃখ, ঋজু ঘৃণায় পরিণত হয়েছে—তাই এমন কঠিন কথা, অমোঘ ভবিষ্যৎ বাণী—"তোকে ছুঁবেক না লো কুকুরে।" দুদিন পরেই যৌবন চলে যাবে, রূপের গরব তখন ভেঙে পড়বে। কেউ ফিরে তাকাবে না তখন।

এরা নিঃসঙ্গ, দুজনেই একটি দল। না কোন যন্ত্র, না বাঁশি, না মাদল ধামসা। অথচ অন্য জায়গায় পুরুষ ঔৎসুক্যকে জাগিয়ে, চারদিকে ভিড় জমিয়ে, পাঁচজন কিশোরী যুবতী গাইছে—

কড়ি ফুলের মধু মেলে না
ও প্রাণ—
তাইতো তুমি কাছে আস না।
যখন কড়ি ফুটবে বঁধু
কত ভালো লাগিবে
তখন কাছে আসিবে…

কড়ি অর্থাৎ ফুলের কুঁড়ি। কাপড় উড়ছে, আকাশে দুহাত তুলে নাচছে। পায়ের তলায় কাদামাটি কাঁপছে। কাঁপছে পুরুষের মন। দর্শনলোভাতুর পুরুষ সব। উচ্চকিত ভিড়।

ধেনাকু তেনাকু। টুরুপা টুপনু, টুরুপা টুপনু। জিগুতা জিগাং জিগুতা জিগাং। তালে তালে বাজছে মাদল, ঢোল। ধামসা বাজছে—ডা ডা ডাডা ডড ডড, ডাডাডা ডডড। দুজনে বাঁশে বেঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মন্দ জোয়ান। দু'টো মোটা কাঠিতে বাজাচ্ছে অন্যজন। দলে আছে ২০/২২ জন পুরুষ। তিন ক্রোশ দূর থেকে নাচতে নাচতে মেলায় এসে পেঁাছেছে। তারা গাইছে—

তোর পিরিতি হয়েছি পাগল
ও তোর মনের কথা বল।
প্রেমেতে মজালি দু'
করলি লো বাঁধা ছাগল

যেদিকে টানিলি ধনি,
সেদিকে নে গেলি বল।

প্রাণের ভিতর থেকে , বুকের ভিতরে ছেঁড়া তার থেকে বাজছে সুর। একজন গাইছে, পাঁচজন গাইছে, সবাই গাইছে। সঙ্গে সঙ্গে মত্ত নৃত্যে, বিপুল চিৎকার। আর জিগ্‌তো জিগাং, জিগ্‌তো জিগাং। আর উচ্চ চড়া কিন্তু টানা ভরাট সুরে গান।

আর একটি গান। রঙের গান। একটি রমণী গাইছে—সঙ্গে তার আরও পাঁচজন সঙ্গিনী। তারা নিজেদের মধ্যেই গাইছে, নিজেদেরই শোনাচ্ছে যেন—

দেখা হল কুয়া শালেতে
ও গো কথা বলি ইঙ্গিতে।
আমি যখন গিয়েছিলাম
তোমাদের ঐ বাড়িতে
মুখে কথা না বলিয়ে
ডাকলি লো ইশারাতে।
ওগো তোমাকে না দেখতে পেলে
পারি না হে থাকিতে
গমরে গমরে মরি,
ই নব যৌবনেতে।

ওই দলের পান পাতার মতো কালো মুখ, বাঁধা ছাঁদ ভারি শরীর, একটি অবসিত-যৌবনা মেয়ে বড় সরল ভঙ্গিতে প্রাণ ঢেলে গাইল—

ভাব করে লে দিন চলে গেল।
ও তোর গাল কি আবার
বসে গেল।
ভাব করে লে দিন চলে গেল।
পরকুল দহে ফুল ফুটেছে
কেউ না লিতে লারেছে
আমার তুষুর এমন সাথি
ভালোবাসায় মজেছে।

মেয়েটির নাম মিথিলা। রাজাকাটা গ্রাম থেকে এসেছে। তার সঙ্গে গাইছে ফুলমণি, ঊর্মিলা ইত্যাদি কয়েকজন মেয়ে।

তুষুর ছোট ছোট একানে পুতুল হাতে, মাথায় বড় মূর্তি ময়ূরবাহনা তুষু, অশ্ববাহনা তুষু, চৌডল, টাঙ্গি, লাঠি, সানাই, মাদল বাজাতে বাজাতে এসেছে ফুলকুসুমা গ্রাম থেকে। সানাই বাজছে—টিনা নিনি, টিনা নিনি, টিটাট টিটা টারা টারা নানা। তারই মধ্যে চার মাত্রার সুরে গানের কলি, চেষ্টা করে বুঝতে হল—'আর কি ভালো বাসবি আমারে / এবার পেলি নতুন নাগরে'।

রঙের গান ভাবের গান, প্রেমের গান, ভালোবাসার গান। যারা গাইছে উন্মত্ত চলমানতায়, তারা বড় দুঃখী, পেটে তাদের ক্ষুধা, ঘরে অন্ন নেই, মাঠ ধু ধু ব্রহ্মডাঙ্গা, জঙ্গল লুপ্ত। মহুয়া রসে মত্ত কেউ বা। তবু শ্লীলতা রক্ষা করে চলেছে সবাই। মারামারি নেই, হানাহানি নেই। গানের তালে দুলছে লাল-নীল-সাদা রঙে মানবস্রোতের চলনামা মেলা। মেয়েরা বড় নম্র, শীর্ণদেহী, সাঁওতালী যৌবন-জলতরঙ্গ অনুপস্থিত তাদের দেহে। কিন্তু মন তাদের মেলার রসে ভরা। 'গোলের বাঝে দেখা হলে বলতে পারে কতক্ষণ'। আবার অন্যত্র দু'কলি গান শুনি—'ও ঠাকুরপো, বসে কেনে, / ভাব করে লে দিন ফুরাই গেল'।

ভালোবাসা এমনি নেশা
ভুলতে তো আর পারি না,
ভালোবাসা করলে পরে
কেন দেহ মন মানে না।

এইসব গানের ভিতরের প্রেম, দেহবাদী কি দেহাতীত, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। মানব-মানবীর চিরন্তন মিলনাকাঙ্ক্ষা মন থেকে এরা মুছে ফেলতে চায় না। তাছাড়া এদের কি আছে, দেহ ছাড়া! অন্নরিক্ত, প্রায়-গৃহহীন, শিক্ষাসভ্যতাশূন্য, অভিজাত আনন্দ আস্বাদনের সুযোগহীন, এইসব মানুষ ক্ষুধা ভুলবে কি করে? মনের মানুষকে পাওয়া এদের কাছে যে কতখানি, এখানে না এলে বুঝতাম কি করে! তুষু পরব বা টুসু গান নিয়ে আক্কেল দাঁতের চর্ব্য পদার্থ যাঁরা তৈরী করেন ভারি ভারি সমালোচনায়, তাঁরা নমস্য। তাঁদের থেকে শতহস্তে দূরে থাকুন। আসুন এই মেলার আহ্বানে, উদার প্রাণে, উদ্বারিত মন নিয়ে। মেয়েদের দল যখন গাইছে সরল নৃত্য তালে—

মায়ে দিল মাথা বাঁধে
দেগো মাসী ফুল গুঁজে
তোমার জামাই দাঁড়াই আছে
লতা পাতা 'বড়' তলে গো
গুলাল ফুল তলে।

তখন যে ব্যাকুলতা ভাষা পায় তার তুলনা আর কোথায় আছে এই পরকুল দহের তুষু মেলায় ছাড়া।

জাগরণী গান, আড়াআড়ির গান, সতীন কাঁটার গান, কলকাতা যাওয়ার গান, বুড়া বরের সঙ্গে বিবাহের গান, রামসীতার গান, বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের গান, ভোটের গান, বর্গাদারীর গান, কমিন (কমিউনিষ্ট) সরকারের গান আছে। আছে সহস্র বিষয়বৈচিত্র্য। আছে সুরের দু' একটি রকমফের। কিন্তু তুষু মেলার প্রাণ বুঝি অন্য রঙে রঞ্জিত হয় সেই গানে, যাকে বলে রঙের গান—ভাবের গান।—

ভাব করে লে
ভাবের মেলাতে,
মেলা পাবি না তুই জীবনে
যায় চলে বেলা।
বেছে বেছে পাবি ধনি
পাবি ঠাণ্ডা বড়তলা।
ওলো পিরিত রতন
পিরিত যতন
পিরিত গতর গলার হার॥
পিরিত বিনা আছে কয় জনা।
পিরিত করে লে গো
চলে যায় বেলা॥

সব গানই তীব্রকণ্ঠে না হলেও চড়া সুরে গাওয়া। তিনজন মেয়ের এ গান শুনতে শুনতে, সেই পরম সত্যটি বুকেগেঁথে গেল—'পিরিত বিনে আছে কয় জনা'। এমনি অজস্র গান, অগাধ আনন্দ, ভালোবাসার দুঃখে মাখা আনন্দ। তার অন্ত নাই গো নাই। যারা ভালোবাসে, ভালবাসাকে ভালবাসে তাদের জন্যই যে এই পরকুল মেলার আগ্রহী আহ্বান। সে আহ্বানে একবার যে সাড়া দিয়েছে, ডুব দিয়েছে রঙের সমুদ্রে, ভাবের সমুদ্রে, তার জীবন ধন্য।

এরা শুধু গানে গানে নিজেদের কথাই বলেছে তা নয়। চিরাচরিত হিন্দু পুরাণের কাহিনীর স্মৃতিও কাজ করেছে নানা গানে। এখানের তুষু গানের ভাষা ও বিষয় হিসাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা যেমন এসেছে তেমনি আরও আরও বেশী করে এসেছে রামসীতার কাহিনীসূত্র। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম ভালোবাসা বিরহ মিলনের মধ্যে এরা দেখতে পায়নি, স্বাভাবিকভাবেই, কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনসম্মত অলৌকিকতা। অলৌকিক বৃন্দাবনের রাসলীলার দেবীমহিমা এদের দৃষ্টিগোচর নয়। রাধা মামী আর কৃষ্ণ ভাগ্না—এই সম্বন্ধ এদের ভোলার কথা নয় এবং অবৈধ প্রেমের মাদকতা আর বাধাহীন কৌতুকবৃত্তি তাই তাদের গানকে নিয়ে গেছে গ্রাম্য আরণ্যক প্রেমভাবনায়। জলডোবুরা গাঁয়ের মহুয়ারসে মত্ত গায়ক জয়দেব বাউরী গাইলো—

মন দিয়েছি কুল তো দেবো না,
পিরিত করবো লোক জানবে না।
যখন ছিল না মামা তোমার
তখন তুমি এলে না,
তোমায় নিয়ে আমার যৌবন……।
ভাঁড় ভেঙেছো দই খেয়েছ
করিনি তোমায় মানা,

সান্ত্বনা দিয়েছ তখন
আমার যৌবন মানে না।
যা খেঁয়েছো তাতেই ভালো
আর কোরো না বাসনা।
শুন বঁধু তোমায় বলি
আর কোরো না আনাগোনা॥

এ গান বাসনা ও ভোগস্মৃতির গান হলেও এ গান যে বাসনামুক্তির গান তাও লক্ষণীয়। কুলমর্যাদা ত্যাগ না করার ইচ্ছায় যে শুভবুদ্ধির প্রকাশ তারই পরিণতিতে বাসনামুক্তির ইচ্ছা। পরকুল মেলা শুধু মনোবাসনা আর ভোগবাসনার মেলা নয়, মনোশুদ্ধিরও মেলা। রামসীতার গান সেই শুদ্ধির স্বাক্ষর বহন করছে।

সীতাকে এরা নিত্যশুদ্ধা সতীসাধ্বী নারী হিসাবেই দেখেছে। রামকেও গ্রহণ করেছে বড় আপনজন হিসাবে। রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের ব্যথা ফুটে উঠেছে বারে বারে এদের গানে। "রামকুমারা"র গান এরা গাইবেই, সব দল—নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে রামকাহিনীনির্ভর গান গেয়েছে, গান গায়। ঘরে গায়, নদীর ঘাটে গায়, মেলায় গায়। রাম আর সীতা যাদের মনোলোক এমন করে আচ্ছন্ন করে আছে তারা যে একটা শুদ্ধির অবকাশ পেয়েছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। খুব সচেতন তারা নয়, এই শুদ্ধির ব্যাপারে, কিন্তু নিরপেক্ষ শ্রোতা অবশ্যই বুঝতে পারবেন রামসীতার গানের এবম্বিধ বাহুল্যের মৌল কারণটি কি।

মিলন নয়, মিলনাকাঙ্ক্ষাই পরকুলের ভাবের গানে প্রাধান্য পেয়েছে। আকাঙ্ক্ষা যেখানে সেখানেই অতৃপ্তি। মিলন যেখানে সেখানেই বিরহবেদনা। তাই এত আনন্দ, এত উল্লাস-উন্মত্ততার মধ্যেই সেই বেদনাবাঁশি বাজে, যে বাঁশি আবহমান কাল ধরে বাজছে নারী-পুরুষের প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়নিকুঞ্জে প্রাণ-যমুনার কূলে কূলে।

আর কি ভালোবাসিবি আমারে—
এবার পেলি নতুন নাগরে
ও তুই পেলি নাগরে।

পরকুলের মেলার আকর্ষণ এদের রক্তে, এদের নিভৃত হৃদয়ে বহমান। পরকুলের মেলায় না এলে মনের রুদ্ধ বাসনা, অবরুদ্ধ বেদনা প্রকাশ করার সুযোগ হতো কোথায়, সুযোগ হতো কি করে! পরকুলের মেলা শুধু সৌখীন দ্রব্য কেনাকাটার মেলা নয়, নয় মিষ্টি মণ্ডা খাজা গজা মাংস ভাত খাওয়ার মেলা। নয় শুধু দেখাশোনা, আনন্দ উল্লাস নৃত্য বাদ্য গান গর্জনের মেলা। পরকুলের মেলা অন্তরবাসী গোপন বেদনা ও সুখ প্রকাশের মেলা। এই মেলায় নেই কোন মঠ মন্দির, কোন সাধনক্ষেত্রের স্মৃতি। এখানে আছে বহমান জলধারা এবং আবদ্ধ জলের দহ। পরকুল দহের সবুজ জল আর কাঁসাই নদীস্রোত যেন বিশিষ্ট প্রতীক। এদের মাথায় তুষু, কাঁখে তুষু, হাতে তুষুমূর্তি। আর এদের কণ্ঠে অবরুদ্ধ সুখ ও দুঃখের

কল্যাণ। তুষুমূর্তি বিসর্জনের সঙ্গে এরা সুযোগ পায় সেই বাসনামুক্তির যার জন্যে সারা পৌষ এরা অপেক্ষা করে থাকে। মকরস্নান করে এরা এখানে পুণ্য অর্জন করে আর সুরসাগরে স্নান করে শুদ্ধ হয়, মুক্ত হয়। মুক্ত হয়ে এরা যে যার ঘরে ফিরে যায়।

ঘরে ফিরে যাবার পরেও এদের মনের মণিকোঠায় আশা গুঞ্জরিত হতে থাকে। পরকুলের মেলায় পুনরায় মিলিত হবার আশা। এদের যৌবনবাহিত রক্তে কেমন করে সেই মিলনবাসনা কাজ করে তার একটি আশ্চর্য মর্মস্পর্শী গান শুনতে পেয়েছিলাম পরকুল থেকে দূরে একটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে। তারা মেলার ক'দিন আগে তুষুমূর্তি ও চৌডল সাজানো মণ্ডপে বসে গাইছিল—

চল্ না ধনি পরকুল যাবো।
তোরে ফুল সাবান কিনে দিবো
চল্ না ধনি পরকুলে যাবো।
টুসু লয়ে যাবো আমরা কত গান গাহিব।
টুসু ধনকে কোলে নিয়ে হেল্যে দুল্যে নাচিব
চল্ না ধনি পরকুল যাবো।
আরশি চিরুণ মাথার ফিতা
পিং কাঁটা কিনে দিব,
"বাঁব" চুঁড়ি আরশি লইয়ব
ফুলপাড় উরমাল দিব।
চল্ না ধনি পরকুলে যাবো।
পরকুলেতে হাতে ধরে দুজনাতে ঘুরিব
মনের আনন্দে কত প্রেমের গান গাহিব
চল্ না ধনি পরকুলে যাবো।
তোরে ফুল সাবান কিনে দিবো।
বন্ধু বলে মেলা থেকে অন্য রাস্তায় ফিরিব
চলতে যদি না পার ধনি লিব কাঁধে কর্যে গো
চল্ না ধনি পরকুলে যাবো॥

প্রেয়সী নারী, আপনজন, ভালোবাসার মানুষকে কাঁধে করে আনার কথা আমরা কেউ কখনো ভেবেছি! এমন ভাবনা দক্ষিণ বাঁকুড়ার অরণ্যময় নদীখাতমুক্ত প্রান্তিক বাংলায়, পরকুল মেলাকেন্দ্রিক মুক্তিকাঙ্ক্ষণ প্রেমজীবনেই সম্ভব।

ইস্পাতের চিঠি। ১৩৯৪

ভাদু গানের স্বপ্ন ও বাস্তব

স্বপ্ন ভাঙলেই যে বাস্তবের জমিতে পা পড়ে তা নয়, আবার বাস্তবকে হারালেই স্বপ্ন সম্ভব হয়ে ওঠে তাও নয়। স্বপ্নস্বভাব ও বাস্তববোধ—এই দুইই যে-কোন জীবন্ত মানবগোষ্ঠীর জাগ্রত প্রাণসত্তার লক্ষণ। যে স্বপ্ন দেখে না সে মৃত। যে বাস্তবকে চেনে না সে অর্ধমৃত। রাঢ়ভূম-মানভূমের মানুষ পিছিয়ে পড়া মানুষ রূপে পরিচিহ্নিত। রাঢ়ভূমের মধ্যমণি বাঁকুড়া জেলার মানুষ সম্বন্ধেও সাধারণের ঐ একই ধারণা। কিন্তু এরা প্রাণে ও প্রাণনায় যে আজও ভরপুর, তা অনেকেই জানেন না। এরা প্রাণে তাজা বলেই এদের সব সাধ স্বপ্ন গান হয়ে ওঠে, সব বাস্তব ব্যথা বেদনা সুরের বৃন্তে অজস্র ফুল হয়ে ফোটে। কথার ফুল। আমি দীর্ঘদিন ধরে পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার ভূমিলগ্ন মানুষের সঙ্গে মিশেছি, গান শুনেছি, উৎসবে যোগ দিয়েছি, মেলায় মেলায় ঘুরেছি। দেখেছি এরা স্বপ্ন বোনে, যদিও রূঢ় বাস্তবকে চেনে। ভাদু গানের ভুবন ঘুরে যা জেনেছি তাতেই বিস্মিত হয়েছি। ভাদু-তুষু-ঝুমুর যত শুনেছি ততই বুঝতে হয়েছে যে আমাদের প্রিয় গান ব্যথার গান এবং ব্যথার নিভৃত উৎস থেকেই গানের উৎস থেকেই গানের উৎসার। ব্যথা মানে ব্যর্থতা নয়, বিষণ্ণতা নয়, মরবিডিটি নয়। ভাদু গানে তাই ব্যথা আছে, কিন্তু নৈরাশ্যজনক সার্বিক হাহাকার নেই। বেদনা হয়ে উঠেছে নন্দিত উপলব্ধি, সুকুমার অনুভূতি। বারবার ভেবেছি, এত খরা, এত শুষ্কতা, এত অনাহার, এত বঞ্চনা ও শোষণ তবু এত প্রাণ কোথা থেকে আসে, এত গান কোথা থেকে আসে!

সারা ভাদ্র মাস জুড়ে ভাদু। ভাদ্র মাসে মাঠে ধান রোপণ শেষ হয়ে যায়। আদিগন্ত বিস্তৃত ধান্যশ্রী শ্যামলিমায় চোখ জুড়িয়ে যায় পরিক্লান্ত অথচ আশাবাদী কৃষিনির্ভর মানুষের। শস্য রোপণ ও শস্য কর্তনের দিনগুলিতে বোবা মূক মূঢ় প্রাণের কোন্ গোপন দরজা খুলে যায়, মাটির সঙ্গে লগ্ন ঐসব মানুষগুলির বুকের মধ্যে, তা ভাদু ও তুষু গান শুনতে শুনতে জানা যায়। সে জানা বড় আনন্দের।

ভাদু শুধু পুরুষের বা বালকের গান নয়। ভাদু প্রধানত নারীর কিশোরীর বালিকার। 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না'—বঙ্গললনা সম্বন্ধে কে বলেছিলেন একথা জানি না। পথে ঘাটে, বাজারে হাটে, গাছতলায়, ঘরের দুয়ারে যারা গানে গানে উল্লাস ছড়ায়, ঢলে পড়ে, মাতামাতি করে তারা নারী। ভীড়ে ভর্তি বাস চলেছে ছড়ছড় ঘড়ঘড় করে। তার মধ্যে আদিবাসী মেয়েরা গান ধরেছে—ভাদু গান। দুয়ারে ধুতি শাড়ি দিয়ে মঞ্চ সাজিয়ে ভাদুমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সময়ে অসময়ে চলেছে গান। দিনক্ষণের বাঁধা নিয়ম নেই।

বাস্তব কিভাবে কথা বলে দেখলাম একটি লোকসংস্কৃতি উৎসব ও ওয়ার্কশপে। বাঁকুড়া শহরের বাঁকুড়া জেলা স্কুলপ্রাঙ্গণ। ১৯৮১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে ১ মার্চ, তিনদিন ধরে বিরাট মঞ্চ বেঁধে লোকসংগীত-লোকনৃত্য সমীক্ষা ও আলোচনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে। আমার উপরেও অর্পিত হয়েছিল সমীক্ষা ও আলোচনা করার ভার।

মঞ্চে উঠেছে চারজন গায়ক ছেলে ও একজন ঢোলক বাজিয়ে। তারা গাইলো—

ভাগচাষী উচ্ছেদ করা
মোটেই চলবে না,
জমির স্বত্ব মোরা ছাড়বো না।
মালিকের আবার দালাল আছে
সেকি তুমি জানো না।

বাস্তববোধের এ এক চূড়ান্ত উদাহরণ। হয়তো এর পিছনে সচেতন দলীয় প্রচারধর্মিতা কাজ করেছে। নাহলে তারা গাইবে কেন—

বামফ্রন্ট সরকার এসেছে দেশে
তোরা ভাবছিস কি বসে বসে।
কেন তোমরা ভাবছো এসো
চাষ করবো মিলে মিশে।

ভাদু গান অনেক সময় তাৎক্ষণিক বিষয় নিয়ে মুখে মুখে রচিত হয়। তবু চিরন্তন গানের বিষয়ের দেখাও সব সময় পাওয়া যায়। ঐ মঞ্চেই সিমলাপাল থেকে আগত সারদাপ্রসাদ গুনি ও সম্প্রদায় খঞ্জনী মৃদঙ্গ সহযোগে গেয়েছেন চিরাচরিত ভাদু গান—

ভাদ্র মাসে ভাদু তুললাম
চন্দন কাঠের চৌদলে।
মালা গাঁথি মালা পরাবো গলে।
উঠ উঠ ভাদু অনেক রাত হয়েছে।
সুরগুঞ্জা ফুল থোপা থোপা
হলুদ ব[illegible]সেছে।

এই হচ্ছে প্রকৃত ভাদু গান, এর [illegible]াষা চিরন্তন। বহু স্থানে, বহু কণ্ঠে, বহু বছর ধরে এ গান আমি শুনেছি। ভাদ্র মাসে ভাদু তোলা হয় সত্য। কিন্তু চন্দন কাঠের চৌদল? সে যে স্বপ্ন। গরীব অনাহারী মানুষেরা কোথায় পাবে এই মহার্ঘ কাঠের সিংহাসনতুল্য চৌদল অর্থাৎ চতুর্দোলা!

ভাদু অর্থাৎ ভদ্রেশ্বরী। পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের রাজকন্যা তিনি। তাঁর অকালমৃত্যু তাঁকে জনমানসে দেবীর আসন দিল। তাঁরা বেদনাময় সুখস্মৃতিকে অবলম্বন করে গান ঝরে পড়তে লাগলো সহস্রধারায়। সে গানের ভাষা গায়ক

গায়িকার নিজের, বক্তব্যও তাদের নিজেদের। বাস্তবের কঠিন মাটি ছেড়ে স্বপ্নবিলাসী মন সুরের আকাশে পাখা মেললো।

নানা পৌরাণিক কাহিনীসূত্রের মতো রামকথা ভাদু গানের মধ্যে এসেছে বারবার। তুষু গানেও এসেছে। ঐ মঞ্চেও শোনা গেল—

সীতা হরণ করলে রাবণ
সীতা রাখবে নিয়ে যাতনে।
ওরে দেখবো তোর সোনার লংকা
ধ্বংস হবে কেমনে।

কিন্তু ভাদু কোন মঞ্চের গান নয়, বৈঠকী আসরের গানও নয়। এ গানের ভাষা খাঁটি আঞ্চলিক বাংলা ভাষা। এ গানের সুর সহজ প্রাণ থেকে বেরিয়ে আসা সহজ মেঠো সুর। তবে এর একটা নিজস্ব ঢঙ আছে। সুর তান লয় ছন্দ যে এ গানেও আছে, আছে স্থানভেদে সামান্য বৈচিত্র্য, মন পাতলে, কান পাতলে, তা জানা যায়। বাঁকুড়ার সন্তান সঙ্গীত-গবেষক ডঃ অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় তা দেখিয়েছেন।

আমি বোদ্ধা সঙ্গীত-গবেষক নই। আমি মন খুলে পথে বিপথে ঘুরেছি। উৎকর্ণ শ্রবণশক্তি নিয়ে ধরতে চেয়েছি ভাদুর সুরপ্রকৃতি। দেখেছি তুষু গানের সঙ্গে এ গানের সুরধর্মের মিল আছে। উচ্চ ও নিম্নবর্ণ হিন্দু বালক-বালিকারা ভাদু বা তুষু গান গায় একই ঢঙে, একই আবেগে। অবশ্য মৃদঙ্গ, ঢোলক, খঞ্জনী, হারমনিয়াম থাকে না। এগুলির ব্যবহার অন্যায়। থাকবে শুধু কণ্ঠস্বর, সুরজ্ঞান আর অপার স্মৃতিশক্তি। একদম না থেমে, স্মৃতি সম্বল করে একের পর এক গান গাইছে দুতিনজন কিশোরী, এমন গানের আসরের বিস্ময়জনক অভিজ্ঞতা আমার বহুবার হয়েছে।

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ঝলসে ওঠে ভাদু গানের গায়িকার কণ্ঠে। ধানারা (খাতড়া থানা) গ্রামের একুশ বছরের যুবতী রত্না পাত্র গেয়েছিলেন—

ও সই কলিকালে,
ছোকরাগুলোর ঢঙ
দেখে যে গা জ্বলে।
লুঙ্গিপরা উল্টো টেরি লো
ডান হাতে ঘড়ি বাঁধে।
এক পয়সা নাই রোজগার লো
যাবে সিনেমা হলে।
কি করে বুঝবে তারা লো
ভাত মারছে বাপের হোটেলে।

এ ব্যঙ্গ শুধু মৌখিক ব্যঙ্গ নয়। এর সঙ্গে গৃহিণী নারীর বুকভরা বেদনা আছে। অক্ষম উপার্জনে অক্ষম পুরুষের ঘরণী হবার বেদনা। এ গানের

বাস্তব, রক্তাক্ত বাস্তব। অথচ করুণে কোমলে মেশানো, স্বপ্নে বাস্তবে মেশানো গানও তিনি গেয়েছিলেন—

ভাদু করি মানা—
এ বছরে তেল হলুদ
আর মেখো না।
সাবান মাখবে গায়ে গো
ফিরবে চেহারাখানা।
তেল মাখলে ময়লা ধরবে গো
সে ময়লা আর ঘুচবে না।
ভাদু করি মানা।

কালো মেয়েকে 'কৃষ্ণকলি' বলা কবিত্ব। কবিত্ব করেছেন রবীন্দ্রনাথ। Black Girl-কে নিয়ে শত সনেট লিখেছেন শেক্সপীয়র। কালো মেয়ের দুঃখ যে কি গরীব ঘরের বাঙালী মেয়েরাই শুধু জানে। ঐগানে সেই নিভৃত দুঃখস্রোত। তাই ফর্সা হবার স্বপ্নসাধ মিশেছে ঐ গানে। ভাদু উপলক্ষমাত্র। ভাদুকে তাই সাবান মাখার অনুরোধ উপরোধ।

রাজগ্রামের মঞ্জুরাণী দত্ত গেয়েছিল, এমনি আর এক ধারালো বাণের মতো ব্যঙ্গাত্মক গান। উপমায় রূপকে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল বক্তব্য—

তোরে করি মানা—
হাতির সঙ্গে মশার লড়াই
সাজে না।
বামন হয়ে হাত বাড়িয়ে
চাঁদ ধরতে পারে না।
অন্ধ হয়ে অন্ধকারে দৌড়ে যেতে
পারবে না।
টিকটিকি হয়ে ডুমুর গিলে
কভু প্রাণে বাঁচবে না
তোরে করি মানা।

এ ব্যঙ্গের অর্থ কি? নারী কি তার অবাঞ্ছিত পুরুষ প্রেমিককে সাবধান করছে? না কি বাক্‌পটু নায়কের স্বভাব চরিত্রের গোপন দিকটা ফাঁস করে দিচ্ছে? যাইহোক, জীবনের সকল বাস্তব ক্ষেত্রেই এ গান প্রযোজ্য।

শুধু নারীর দুঃখ ব্যঙ্গ বজ্র হয়ে পড়েছে তা নয়। পুরুষের মর্মব্যথাও ব্যঙ্গের রূপ ধরেছে ভাদু গানে—

ঢুকে যাদু ঘরে—
কি ঝকমারি করেছি বিয়ে করে।

গিন্নী আমার 'আধ-বাগার'
জানলা রাখা ভার হল।
শাঁখা শাড়ী ব্লাউজ গো,
পায়ে স্যান্ডিল লাগাও রে।
শাশুড়ী সেবাদাসী গো
বধূ বসে খাবেন চেয়ারে।

'আধ-বাগার' অর্থ আধপাগলা মেয়ে। এমন মেয়ে শুধু শহরে নয়। গাঁ ঘরেও দেখা যায়। তবু বিবাহঘটিত স্বপ্নের মৃত্যু ঘটে না। বিবাহবাসর আর ফুলশয্যার চিরন্তন স্বপ্ন রূপ ধরেছিল পুরুষোত্তমপুর গ্রামের আঠারো বছরের মেয়ে আরতি দাসের কণ্ঠে—

ফুলশয্যা হবে
ফুলের ঘায়ে ভাদু লজ্জা পাবে।
ফুলের মেলা ফুলের ডালা গো
ফুলেরি শয্যা রবে।
ভাদু যেমনি, বরটি তেমনি,
রূপ দেখে চোখ জুড়াবে
ফুলশয্যা হবে।

এ লজ্জা, এ ফুলশয্যা, বরের রূপে এ মুগ্ধতা, শুধু কি ভাদুর? না। এ যে গায়িকাদের নিজেদের বোধ, তা বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না। স্বপ্নে বাস্তবে এমনি মিতালি ভাদু গানে। ঐ ফুলশয্যা গানেরই শেষ অংশটা শুনেছিলাম ধানাড়া গ্রামে কুমারী কল্পনা পাত্রের ও অন্য গায়িকাদের সমবেত কণ্ঠে—

যেমনি মেয়ে তেমনি জামাই গো
রূপ দেখে চোখ জুড়াবে,
খাটপালঙ্কে থাক না অঙ্গ গো
টাকা পয়সায় কি হবে।

টাকার চেয়ে দামি ভালোবাসা আর রূপবান পুরুষকে ভালোবাসায় সুখ। ভাদু গান বাস্তব দুঃখের গানমাত্র নয়, স্বপ্নজগতের সুখের গানও বটে।

আবার 'মালা বদলের গান' শুনেছিলাম ততোধিক বিস্ময়ে। কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে যে মালাবদল করতে আসা যায় তা আমার জানা ছিল না। পক্ষ বিপক্ষ প্রতিপক্ষ মিলে তিনজনের গান। নাটকীয় গান—

১ কপাট খুল্ গো তোরা
মালাবদল করতে আইচি মোরা
কপাট খুল্ গো তোরা।

২ বৃন্দে এত রাতে
মালাবদল করবো না
কোন মতে।
বৃন্দে এত রাতে।

৩ এক হাতে দুধের বাটি,
এক হাতে শীতলের ডালা,
সঙ্গে এনেছি কনস্টেবল—
তোরা কর মালাবদল।

পুলিশ এনে জোর করে বিবাহ? স্বপ্ন ভেঙে গেলেই যে বাস্তবে পেঁছানো যায় না, প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা সে কথা বলেছিলাম। এখানে কার স্বপ্ন ভাঙলো? কৃষ্ণরূপী পুরুষের, না কি মালা হাতে বৃন্দারূপিণী নারীর? ভাদুকে নিয়ে আজ ঘরে ঘরে অনেক আচার-অনুষ্ঠান, ব্রতধর্ম, আনন্দ উৎসব। মূর্তি তৈরী আছে, মূর্তির অধিষ্ঠান আছে, জাগরণ আছে, আহ্বান আছে, পুষ্প দান আছে, প্রসাদ বিতরণ আছে। আছে সমবেত ও একক বিসর্জন। সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গান। গান আর গান। সব কিছুর আগে ও পরে, সব কিছুর উপরে গানের প্রাধান্য। সেই কথাটাই যেন ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছিল নড়রার কিশোরী কুমারী ঝর্ণা পাত্র—

ভাদু নিকেতনে
সারারাত্রি কাটবে জাগরণে।
গান করবি গান শুনবি গো
সকলে বন্ধুজনে।
এলে যদি দরশনে গো
যাও না দুটো গান করে।
না যদি গান গাইবে তবে
শুনে যাও না প্রাণ ভরে॥

গান শোনার আর গান গাওয়ায় আহ্বান এখানের আকাশে-বাতাসে। যিনি আসেন তিনি রিক্তমনে ফিরে যান না। সুখেদুঃখেভরা গানের বাণী আর বিলম্বিত একটানা সুরের স্পর্শে তিনি ভরিয়ে নিতে পারবেন তৃষিত চিত্ত। বাস্তব আর স্বপ্নের মধ্যজগতে তিনি থাকবেন সারা বছর ভাদুরাণীর সান্নিধ্যে। অপেক্ষা করবেন আর এক আগামী ভাদ্র মাসের জন্য।

ভাদু গানের ভুবন

লোকসংস্কৃতি বা লোকসাহিত্য অরণ্যচারী আদিবাসী সমাজ অথবা সংহত কৃষিজীবী লোকসমাজ থেকে উদ্ভূত কিনা সে সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করেছেন। যাই হোক, আমাদের দেশের কোন কৌম জনগোষ্ঠী আর নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিধির মধ্যে আবদ্ধ নেই। কালের বিবর্তনে তাদের ঐতিহ্যধারা এখন নানাভাবে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিমন নয়, সমষ্টিমনের উৎস থেকে উৎসারিত লোকসংগীতের মধ্যেও মিশ্রিত হচ্ছে ব্যক্তিমনের, অভিজাত গণবর্গের আচার বিশ্বাস গায়কি ঢঙ। ভৌগোলিক পরিবেশ যত পাল্টে যাচ্ছে, শহর সভ্যতা যত হাত বাড়াচ্ছে, ততই লোকসাহিত্যের অশিক্ষিতপটুত্বের সরল সৌন্দর্য দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে। বাক্‌নির্ভর স্মৃতিনির্ভর সংগীত লোকপরিধির মধ্যে থেকেও লিখিত সাহিত্যে পরিণত হচ্ছে। কারণ অশিক্ষিত Community life-এর মধ্যেও আধুনিক নাগরিক প্রচেষ্টা বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শিক্ষার ও সভ্যতার আলো বিস্তারের নিরন্তর পরিকল্পনা কার্যকর করে তুলছে। তাই আজ কৌম সমাজ পরিণত হচ্ছে ভৌম সমাজে।

ভাদু ও টুসুর উৎপত্তি-উৎস যে কৌম সমাজ সেই কৌম সমাজও আজ আর অটুট, অবিকৃত নেই। ভৌম সমাজের ছায়াপাত তার মধ্যেও হচ্ছে। লোকগানমাত্রেই চঙ্ক্রমণধর্মী (transmitted)। এর চলার গতিপথে তাই শিল্পসভ্যতা, নগর সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতার বিষয়বস্তুগুলি পড়ছে এবং বিস্ময়াভিভূত লোকমানস সেগুলিকেও গানের ভাষায় ব্যবহার করছে। তাই আজকের ভাদু বা টুসু গানে যে নারীসমাজ তাদের সবটুকু মনই আর বিশুদ্ধ মুক্তিকাময় বা অরণ্যপ্রান্তিকতায় লগ্ন নয়। ঐসব গানে যে সমাজসংবাদ তাও সব সময় আদিম সমাজের ঐতিহ্যবাহী নয়। ঐসব গানের সুর-তালের মধ্যেও কখনো কখনো বৈঠকিগানের ঢঙ ও ছন্দদোলা লাগছে।

এক-এক স্থানের জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এক-এক রকমের হয় কেন? কেন কেবলমাত্র রাঢ়ভূম ও মানভূম অঞ্চলেই ভাদু ও টুসু পরবের এবং পরবকেন্দ্রিক গানের উদ্ভব হল, নৃতাত্ত্বিকদের কাছে তার কোন সঠিক উত্তর নেই। আমি রাঢ় ও মানভূম অঞ্চলের যতটা দেখেছি তার মধ্যে টুসু উৎসবের বিস্তার সর্বাধিক। তারপর ভাদু উৎসব। উৎসবরীতির মধ্যে মানবমনের বিচিত্র সব আনন্দ-বেদনার প্রকাশ। ভাদু উৎসবেও সেইরকম। সারা ভাদ্র মাস ধরে ভাদু, সারা পৌষ মাস ধরে টুসু। এই দুটিই কৃষি-উৎসব। একটি ধানচাষের প্রাথমিক পর্বের উৎসব, অন্যটি ধানতোলার সমাপ্তি উৎসব। বর্ষামুখরিত বিশ্বে মুক্তিকালগ্ন মানুষের মনপ্রাণ স্বভাবতই

ময়ূরের মতো কলাপ মেলে নৃত্য করে ওঠে। ঘরে ঘরে আসে ভাদু। অন্যদিকে নতুন ধান্যে ও নবান্নে সুখী সেই মানুষেরাই পৌষ মাসের শীতার্ত পরিবেশে আনে তুষু।

লক্ষণীয়, ভাদু ও তুষু শব্দ দুটি আমরা একই সঙ্গে উচ্চারণ করছি। যদিও প্রবন্ধটি ভাদু উৎসবের ভুবন সম্বন্ধে। কারণ এই অঞ্চলে ভাদু ও তুষু উৎসবরীতিতে, সংগীতবিষয়ে প্রায় অভিন্ন। ভাদু ও তুষু উভয়েই নারী। উভয়েই একাধারে নারী এবং দেবী। ভাদুর সঙ্গে কাশীপুর (পুরুলিয়া) রাজবাড়ি ও রাজকন্যার যোগ পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েছেন। তুষু কোন রাজকন্যা নয়, বাস্তবের কোন রাজবাড়ির ইতিহাসের সঙ্গে তুষুর কোন যোগ নেই। আগে তুষুমূর্তি ছিল না। ইদানীং ভাদুমূর্তির মতো তুষুমূর্তির প্রচলন হয়েছে। দক্ষিণ বাঁকুড়ায় অরণ্যপ্রান্তিক পোরকুলের মেলায় দেখেছি হাজার হাজার তুষুমূর্তি। বিসর্জন দিতে আনা হয় কংসাবতীর স্বল্প সলিলে। আনে অন্ত্যজ আদিবাসী মানুষ, আনে উচ্চবর্ণ হিন্দুসমাজের মানুষ। ভাদুমূর্তি পুজার লৌকিক রীতির প্রচলন এখন উচ্চ হিন্দুসমাজ ও নিম্ন হিন্দুসমাজ উভয় ক্ষেত্রেই বহুলভাবে দেখা যায়। কৌম সমাজের উৎসব এইভাবে উচ্চসমাজের উৎসব হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে হচ্ছে নগরায়ণ। ভাদু গানে শুনেছি :

বলি এই কলিতে ভাদু পুজো করব সবাই ঘরেতে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে গো হবে না পুজিতে ॥
কালী পুজো, দুর্গা পুজো হবে না আর করিতে।
হরিনামের মালা নিয়ে হবে না আর জপিতে।
হা নিতাই গৌরাঙ্গ বলে হবে না আর ডাকিতে ॥[১]

ভাদুর গরিমা এইগানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে উচ্চসমাজের পুজারীতির ও ঈশ্বরারাধনার অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। তাই এ গান এখন আর বিশেষ এক কৌম সমাজের মৌল বাণী বহন করছে না। ভাদুর আবাহন ও বিসর্জনের গান দুটি বিচার করলেও আমাদের সিদ্ধান্ত অনুধাবন করতে পারা যাবে।

আবাহন বা বন্দনা

নমঃ মাতা নমঃ বাগবাদিনী
তুমি আদি তুমি সিদ্ধি গো তুমি জগৎপালিনী।
তুমি ভক্তি তুমি শক্তি তুমি মুক্তিদায়িনী।
তুমি বিদ্যা তুমি আদ্যা তুমি কৃপাদায়িনী।
প্রণমামি আমি সদা গো এসো মা বীণাপাণি ॥[২]

---

১ গায়ক অশোককুমার পাণ্ডা (বি. এ. পাশ), কুসুমটিকরি, সুখাদালি, বাঁকুড়া।

২ গায়ক লালু মাল, বয়স ২৮, রতনপুর, বাঁকুড়া।

বিসর্জন

জলে হেলা জলে মেলা গো
জলে তোমার কি আছে।
মনে বুঝে দেখ ভাদু
জলে শ্বশুর ঘর আছে ॥[১]

এই দুটি গানের গায়কই এক ব্যক্তি—লালু মাল। কিন্তু উভয় ভাদু গানের ভাষার পার্থক্য, মনোবৃত্তির পার্থক্য আমাদের বুঝিয়ে দেয় ভাদু-সংস্কৃতি কিভাবে এক মৌল জনগোষ্ঠীর মনোরাজ্য অতিক্রম করে বৃহত্তর আর্যভারতের মন্ত্র ঐতিহ্য ও পুজোবিধির প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠেছে। বিসর্জনের গানটি যতখানি খাঁটি ভাদু গান, আবাহনের গানটি তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থাটি ভাদু গান। ঐ বন্দনা বা বিসর্জনের গানদুটিকে তুষু উৎসবেও সরাসরি ব্যবহৃত হতে শুনেছি। শুধু 'ভাদু' স্থানে 'তুষু' শব্দটি উচ্চারণ করা হয়েছে।

উৎসবগত ও প্রকাশগত যে মিল ভাদু ও তুষুর মধ্যে তা দীর্ঘদিন ধরে আমি লক্ষ্য করে আসছি। ভাদু গান তুষু গান রূপে গাওয়া হচ্ছে, তুষু গান ভাদু গানে পরিণত হয়েছে। একই মানসভূমি থেকে এই দুই গীতিধারার উৎসারণ, তাই এমন মিল। কয়েকটি উদাহরণ—

* ভাদুর পুজোর দিনে / ও ঠাকুরপো কিছু মিষ্টি দাও এনে, / ভাদুর পুজোর দিনে।[২]

* ইরদা ফুলের গিরদা বালিশ / বাসক ফুলের বিছানা। / পাশ ঘুরে শুইয়ো না ভাদু / ভেঙে যাবে গহনা ॥[৩]

* কি বা রূপের ছিরি / তোদের ভাদুর রূপ দেখ্যে হাস্যে মরি। / হাত পা সরু সরু পেটটা মোটা গাল দুটা ভারি ভারি। / রূপে গুণে নাই তুলনা যম গেইছে কি পাসরি ॥[৪]

* আমার ভাদুর বিয়া দিব লো / জোড়া ঢাক বাজিয়ে। / তোদের ভাদুর বিয়া দিবি লো / জোড়া কুকুর ভেঁকিয়ে ॥[৫]

শুধু 'ভাদু' শব্দটির স্থানে 'তুষু' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় মাত্র।

তুষু গানের মতো ভাদু গানেও নারীমনের সাধ-আহ্লাদ, সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুরাগ, রঙ্গ-রসিকতা ও বিরাগ বেদনার প্রকাশ অকুণ্ঠ। ভাদুকে ভালো ঘরে

---

১. গায়িকা, সন্ধ্যা গোস্বামী, চন্দ্রবাইদ, দেউলভেড়িয়া, বাঁকুড়া।

২. লালু মাল, রতনপুর, বাঁকুড়া।

৩. ভক্তিবালা বিশ্বাস, মটুকবনী, বাঁকুড়া।

৪. লালু মাল রতনপুর, বাঁকুড়া।

৫. ভক্তিবালা বিশ্বাস, মটুকবনী, বাঁকুড়া।

ভালো বরে বিয়ে দেবার স্বপ্ন, ভাদুর গা ভরত গয়না পরার ইচ্ছা, ভালো শাড়ি পরার ইচ্ছা, সতীনের মৃত্যুকামনা, স্বামী সোহাগিনী হওয়া, বাপের বাড়ি পাঠানো প্রভৃতির মধ্যে কোন দৈবী বা আধ্যাত্মিক আন্তর-ইঙ্গিত নেই। এসবই বাস্তব বিশ্বের দরিদ্র নারীদের নারীদের আপন ইচ্ছার, অপূর্ণ বাসনার তির্যক অভিপ্রকাশ। গৃহবন্দী সমাজবন্দী নারী যখন বলে ওঠে গানের উচ্চকিত ভাষায়—

যাব রথ দেখিতে
ও ঠাকুরপো মাইরি তোমার সঙ্গেতে।
পান চুণ তামুকের ডিবা ভুলো না সংগে লিতে।
যাব রথ দেখিতে।
একখিলি পান দশ নয়া দাম হয়েছে বাঁকুড়াতে
যাব রথ দেখিতে।
রথ দেখে সিনিমা দেখবো রাত্রে নটার টিপেতে
যাব রথ দেখিতে।
সেকেন্ড ক্লাসে কাটব টিকিট চাপব রাজার বাসেতে।
যাব রথ দেখিতে।
ও ঠাকুরপো মাইরি তোমার সংগেতে।[১]

তখন বুঝতে কি দেরী হয়, ভাদুস্মৃতিহীন এই গান নিছক এক নারীমনের বাণী বহন করছে। সমাজতত্ত্ববিদ এর মধ্যে দেখবেন শ্রেণী পার্থক্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি। কিন্তু আমরা দেখছি এক গ্রামীণ গৃহবধূর সাধ-আহ্লাদের চকিত প্রকাশ আর সাধারণ নির্বিত্ত জীবনের সঙ্গে এই ভাদু গানের ভাষায় ও সুরের যোগ এত সহজ ও এত নিবিড় যার প্রতিতুলনা অভিজাত শহুরে সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। এইসব গান অলংকার শাস্ত্রসম্মত শব্দ, ছন্দ, রীতি মেনে চলে না, কিন্তু হৃদয়ের নিভৃতলোকে অবলীলাক্রমে পৌঁছে যায়। গানগুলি এইভাবেই জীবনরসে পূর্ণ, জীবনাগ্রহে পূর্ণ। এমনি আর একটি গান—

মরি মন গুমানে
ও ঠাকুরপো পোইস্টাপিস বন্ধ শুন্যে।
বহুদিন আর পাই না সম্বাদ গো
কেমন আছে কে জানে।
খ্যাত্যে শুত্যে মন মানে না কত কি ছাই হয় মনে।
সকল কর্ম থাকুক পড়্যে ধর্যে বারটার টেনে
কইলক্যাতাতে গিয়ে একবার দেখা কর তার সনে।।[২]

---

১. ভক্তিবালা বিশ্বাস, মটুকবনী, বাঁকুড়া।
২. ঐ

হিন্দুর কাছে যেমন স্বর্গের স্বপ্ন, রাঢ় অঞ্চলের অজানা অরণ্যপ্রান্তবাসী নারীর কাছে তেমনি শহর কলকাতার। এ গান তুষু গান রূপেও এই অঞ্চলে প্রচলিত। তবে বহির্জগতের আহ্বান তুষু গানের 'বাগাল' (রাখাল) চরিত্রটি যেমন করে আনে গৃহবন্দী নারীর কাছে, তেমন করে ভাদু গানে আনে না। মানবজীবনের সারাৎসার ভালোবাসার অমৃত। তার পিপাসা যেমন তীব্র, তার জন্য বিকৃতিও সহজ। সমাজ মানসের শক্ত বাঁধন মানে না প্রেমিক পুরুষের মন, প্রেমিকা নারীর মন। আমরা নানা ভাদু গানে দেখি নারীমনের প্রেম ও আর্তি, লজ্জা ও অনাদরের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে লৌকিক ভাষায় লৌকিক ভঙ্গিতে। যেমন একটি—

লাজের মাথা খাঁয়ে
পথে ঘাটে কি কর একা পাঁইয়ে।
পথ আগুলে দাঁড়াও পভু কভু ধুলা দাও গায়ে।
আইজ যে আবার আঁচল ধর্যে টানছে হে বনের দিকে।
দেখবে মজা পাবে সাজা বইলবু গা ঘরে যাঁইয়ে॥[৯]

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ঘোড়া চুল রাখোয়াল' কৃষ্ণের সঙ্গে এই গানের নায়কের পার্থক্য খুব বেশি নেই। তা না থাক, এই গানের নারী-নায়িকার মনটিকে চিনে নিতে আমাদের কোন রকম পাণ্ডিতপ্রয়াসের দরকার হয় না। নারী প্রেমপিয়াসী হলেও পাপীয়সী নয়, রঙ্গপিয়াসী হলেও রঙ্গের সীমা সম্বন্ধে সচেতন।

অতীত ও বর্তমানের নানা ঘটনা, সমাজ বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নানা সংবাদ, বিশেষ ব্যক্তির উল্লেখ প্রভৃতির মাধ্যমে তুষুর মতো ভাদু গানেও বাঙালী সমাজমানসিক পরিচয় পাওয়া যায়। সং বা লেটোর গানের মতো তাৎক্ষণিক অথচ স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে গানের সূত্রে বেঁধে ভাদুকে শোনানো হয়। যেমন গান্ধীজীর কথা, বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু সংবাদ, বেকার ছেলেদের বেদনা, পরিবার পরিকল্পনা, ভোট গ্রহণ পর্ব, ছত্রিশ সালের বন্যা, রাজনৈতিক সভা, পণপ্রথা প্রভৃতি বিষয় আমাদের সংগৃহীত গানগুলির মধ্যে এসেছে। যেমন—

* গান্ধী কর না মানা
বরং আমরা রেশমি চুঁড়ি পইরব না।
জনার ভাজা খাত্যে মজা হায়রে ছাঁচি তেল সনা।
আমার ভাদু দেখতে যাবেক পুরুল্যার জেলখানা।[১০]

* ভাদুর গাইব কি গান
বিধান রায়ের শোকে সই মোর আকুল পরাণ।
পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীরে ছিলেন যে ডাক্তার বিধান

---

৯. ঐ
১০. ঐ

আষাঢ় মাসের ষোল দিনে শুনি তাঁহার তিরোধান।[১১]

* বেকার ছেলে ঘুরছে কত দেখ ভাদু নয়নে।
ও যে বি এ এম এ পাশ করে সব তাড়ি ধরছে দোকানে।
চাষের কাজে নেইকো মানা তবু এটা কেউ করে না।
ও করতে গেলেও করতে পারে না হাল ছেড়ে দেয় গোপনে।[১২]

* ভাদু নয়ন মেলে দেখ না পরিবার পরিকল্পনা
বেশি ছেলে হলে ভাদু কষ্টের সীমা থাকবে না।[১৩]

ঐতিহ্যানুসারী ভাদু সঙ্গীতে মানস ঐতিহ্যেরও প্রতিফলন ঘটেছে বহুলভাবে। রামায়ণ কাহিনীর টুকরো অংশ সব থেকে বেশি এসেছে। তুষু গানেও যে এই রাম ঐতিহ্যের সহস্র ধারা তার আলোচনা আমি অন্যত্র করেছি।[১৪] ভাদু ও তুষু গানে, পটসঙ্গীতে, কথকতায়. সংকীর্তনে, লৌকিক যাত্রাপালায়, সাঁওতালী গানে, ঝাড়ফুঁকের মন্ত্রে, গিন্নীপালন উৎসবের গানে, গ্রামনাম ও লোকনামে সারা রাঢ় অঞ্চল জুড়ে কেন এমন রামকাহিনীর প্রকাশ ও পরিবেশনার আধিক্য সে বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। 'কানু ছাড়া গীত নাই'—এই প্রবচনটি যে কতখানি সত্য তা সমগ্র বাংলা কাব্যধারায় যেমন প্রমাণিত তেমনি ভাদু গানেও তার প্রমাণ কম নয়। এখানের রাধা কৃষ্ণ অলৌকিক বৃন্দাবনের রাধা কৃষ্ণ নয়। কান্তা শিরোমণি রাধা বা 'কৃষ্ণস্ত ভগবানঃ স্বয়ং' কৃষ্ণ নয়, এখানের রাধাকৃষ্ণ নিতান্তই অন্ত্যজ বা কখনো কখনো রুচিদুষ্ট সমাজ মনের বাস্তব অভিমূর্তি। শিবদুর্গার কাহিনীসূত্র, আগমনী বিজয়ার বিষয় অনুধ্যান প্রভৃতি বিষয়েও ভাদু সঙ্গীত পিছিয়ে নেই। কয়েকটি উদাহরণ—

* দাদা দেখে যা না
রাধা বউয়ের কি বা কাণ্ড কারখেনা।
কখন যে এসেছে বনে আমরা কেহ জানি না।
নন্দর ব্যাটা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম পিরিতের ঘটনা।
মায়ে ঝিয়ে বলতে গেলে শুনে না মোদের মানা।[১৫]

* ওঠ প্রাণের লক্ষ্মণ
সীতা বিনা অন্ধকার ত্রিভুবন।
ওঠ ভাইরে চাই না সীতারে তোরে লয়ে যাবো ধন।

---

১১. অমিতা কুণ্ডু, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া
১২. কুমকুম ঘোষ, রামপুর, বাঁকুড়া
১ . ঐ
১৪. 'তুষুগানে রামকাহিনী,' তুষু ব্রত ও গীতি সমীক্ষা, রবীন্দ্রনাথ সামন্ত
১৫. রচনা লায়েক (৩০), শ্যামসুন্দরপুর, বাঁকুড়া

ওরে সাগর পারে এসে ভাইরে লঙ্কাতে দিলি জীবন।
আমায় কি বলবে সুমিত্রা মাতা রে আরো যত পুরজন।
আমি দেশেতে ভাই আর যাব না
করি অনলে প্রাণ বিসজ্জন ॥[১৬]

শুধু বর্তমান নয়, অতীতের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। ভাদু সঙ্গীত আগে না তুষু সঙ্গীত আগে জনমানস অধিকার করেছিল, সে প্রশ্নের উত্তর নেই। কাশীপুরের রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরীর অকাল মৃত্যুর আগে থেকেই এই সংগীত ও উৎসবের প্রচলন নিশ্চয়ই ছিল। কন্যাশোকাতুর রাজা আপন কন্যার স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার চেষ্টায় ভাদু উৎসব ও সঙ্গীতাসরের মূল্য ও মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কাশীপুর অথবা হাজারিবাগের রাজবাড়ীর ভাদু উৎসব কিন্তু খাঁটি লোকউৎসব নয়। লোকউৎসবের রাজ সংস্করণ। হাজারিবাগ থেকে অরুণপ্রকাশ সিংহ প্রায় আজ থেকে ৭০ বছর আগের কথা লিখছেন—

"বলতে পারেন—রাজবাড়ীতেও কি তাই হত?
সেখানেও ভাদুপূজা হত, কিন্তু রাজবাড়ীর ভাদুপূজাকে
আপনারা নিশ্চয়ই লোকউৎসব বলে নেবেন না। নেওয়া
উচিত নয়। এখানে ভাদু পূজায় হাওড়া হাটের ডুরে
শাড়ী নেই, এখানের ভাদু বহুমূল্য বেনারসী ও হীরা
জহরতে সজ্জিতা। বেনারস লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজী
এসে ঠুংরী গায় ভাদুর সামনে। রাজপুরুষদের মধ্যে
গীতকার ছিলেন অনেকে। ভাদু সঙ্গীত রচনা করতেন
তাঁরা কিন্তু সে সঙ্গীতের উপর কাফি, সিন্ধু কাফি,
পিলু-বারোয়ার সুরারোপ হত।"[১৭]

ভাদু গানের এই মজলিশি প্রবণতা আজও চলছে। তারই প্রভাবে তুষু গানেও বৈঠকী প্রবণতার উদাহরণ একাধিক স্থানে দেখেছি। তবে ভাদুর মতো রাজসভাআশ্রয়ী আভিজাত্য তুষু গান কোন দিনই তেমন করে অর্জন করতে পারেনি।

---

১৬. শ্রীমতী মহামায়া কারক, বাঁকুড়া

১৭. পৃ ৩০১, ছত্রাক, সুবোধ বসুরায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩

বাঁকুড়া সংস্কৃতি ও রামায়ণ

রাঢ় অঞ্চলে রামায়ণের প্রভাব কেন এত অধিক, এই বিস্ময়জনক প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রাচীন বঙ্গভূমি বা বৃদ্ধভূমির বাসিন্দা যাঁরা তাঁরা অনার্য নামে খ্যাত। শুশুনিয়া পাহাড়ের খননকার্যের ফলে যে মানব সভ্যতার আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, সেই সভ্যতা মহেঞ্জদাড়োর সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় বলে পণ্ডিতেরা ধারণা করেছেন। এই অনার্য-অধ্যুষিত দেশে আর্য আগমন ঘটেছে অনেক পরে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধে তীর্থযাত্রা ছাড়া আর্য পুরুষের আগমন ঘটলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে বাঙালী জাতির উৎপত্তি। এদেশের খাদ্য, আচার, যৌনকৃতি সম্বন্ধে আর্যরা পঞ্চমুখে নিন্দা করেছেন। 'ব্রাত্য' বাঙালীদের ভাষাও তাঁদের কাছে পক্ষিকলরব ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। রাঢ় আর বঙ্গ, গৌড় আর বঙ্গ এখন সমার্থক মনে হলেও পূর্বে তা ছিল না। অথচ দ্রাবিড় শব্দ এখানের গ্রামনামে ও স্থাননামে এখনো টিকে আছে এবং সব থেকে বেশি আছে বাঁকুড়া জেলায়। বাঁকুড়া, খাতড়া, গোড়াবাড়ী, আনাড়া, হাড়মাসড়া, বদড়া প্রভৃতি 'ড়'-প্রধান শব্দ দ্রাবিড় শব্দের ঐতিহ্যবাহী। এই অনার্য-অধ্যুষিত অঞ্চলে আর্য রামায়ণের প্রভাব সংস্কৃতিধারার নানাদিকে কেন এবং কিভাবে সম্ভব হয়েছে তা গবেষণার বিষয়।

এই অঞ্চলে আর্যসংস্কৃতির প্রবেশ ঘটেছিল জৈনধর্ম ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচার মাধ্যমে। অবশ্য বৌদ্ধ ও জৈনধর্মকে ঠিক আর্যধর্মানুশীলন বলা যায় না, তবুও এঁরা আর্যসংস্কৃতি সম্পূর্ণ বর্জন করেননি। এঁরা প্রধানত বেদবিরোধী ছিলেন। অনার্য রাঢ়বাসী যদিও সরাসরি জৈনধর্ম-সংস্কৃতি গ্রহণ করেননি, তবু ধীরে ধীরে তাঁরা জৈন সংস্কৃতির বশীভূত হয়েছিলেন। 'আয়ারাংগ সুত্ত' গ্রন্থে মহাবীরের প্রতি রাঢ়বাসীর ব্যবহারের যে কাহিনীসূত্র লিপিবদ্ধ আছে, তাতে মনে হয়, জৈন মহাবীরের প্রতি অননুরাগই প্রাধান্য পেয়েছিল। তবু ধীরে ধীরে জৈন সংস্কৃতি প্রসারলাভ করেছে এবং রাঢ়ের মানসভূমিকে অধিকার করেছে। অশোকের সময় থেকেই এখানে বৌদ্ধ মত প্রচারিত হয়েছে এবং বাংলার তন্ত্রধারণার সঙ্গে মিলেমিশে বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। ছাতনার বাশুলী-আর সোনামুখীর স্বর্ণময়ী দেবী বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবী কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। খৃষ্ট-জন্মের সময় থেকে রাঢ় অঞ্চলে আর্যীকরণের সূচনা হয় এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রভাব বলবতী ছিল। রাঢ়ের অধিপতি পরম্পরাক্রান্ত আদিশূরের মৃত্যু হয় ৭৮২ খৃষ্টাব্দে। তিনিই 'কোলাঞ্চ' দেশ থেকে ক্ষিতীশ, বীতরাগ, সুধানিধি, মেধাতিথি, সৌভরি নামক পাঁচজন বেদবিদ ব্রাহ্মণকে এদেশে নিয়ে আসেন। তার মধ্যে মেধাতিথি বাঁকুড়ার কংকগ্রামে বসতি স্থাপন করেন ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন বাঁকুড়ার অগ্রদ্বীপে। কোলাঞ্চ অর্থাৎ কনৌজ-আগত পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানগণের মধ্যে বাঁকুড়া

জেলার বড়া বা বোড়া বৈকণ্ঠপুরে বাস করতে লাগলেন বিকর্তন, এ'রাই পরবর্তী কালে হলেন 'বড়াল'। নীপ বাস করতে লাগলেন কেশরকোণায়, তার থেকে হল 'কেশরকোণি'। ধুরন্ধর বাস করতে লাগলেন অম্বিকানগরের নিকটবর্তী মুখটি গ্রামে, তার থেকে হল 'মুখৈটি' বা 'মুখোগাঞী'। ছাতনার নিকট কাঞ্জাড়া গ্রামে বাস করতেন নারায়ণ, তাঁর থেকে উৎপত্তি 'কাঞ্জিল্লাড়ী' গাঞীর। আমাদের প্রশ্ন, রাঢ় অঞ্চলে বিশেষ করে বাঁকুড়ায় রামায়ণের প্রভাব বহন করে কারা এনেছেন—জৈনরা, বৌদ্ধরা, নাকি ঐ রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা ?

রামায়ণে রাঢ়দেশের উল্লেখ নেই যদিও অঙ্গ, বঙ্গ, মগধের উল্লেখ আছে। কৈকেয়ী অভিমান করেছেন। তরুণী ভার্যার অভিমান ভাঙবার জন্য বৃদ্ধ দশরথ আপন সম্পদ-সামর্থের ইতিবৃত্ত বলছেন। তাঁর অধীনে দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দাক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী, কোশল প্রভৃতি দেশ আছে। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের চল্লিশতম সর্গে সীতা অন্বেষণের জন্য সুগ্রীব পাঠাচ্ছেন বিনতকে এবং নির্দেশ দান কালে মগধ, পুণ্ড্র ও অঙ্গদেশের উল্লেখ করছেন। কালিদাসের রঘুবংশম্ কাব্যেও বঙ্গদেশ ও সুহ্মদেশের উল্লেখ আছে।

রাঢ়ের বিখ্যাত রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় জগৎরাম রায় এবং শংকর চক্রবর্তী অর্থাৎ 'কবিচন্দ্র'। বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জগৎ-রামের জন্ম হয়। জন্মস্থান ছিল অতি রমণীয়। অবশ্য ভুলুই গ্রাম এখন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, আছে তাঁর কাব্যপুঁথি, সে পুঁথি গ্রন্থাকারে মুদ্রিতও হয়েছে। পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথসিংহের আদেশে ইনি রামায়ণ অনুবাদ করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে এই অনুবাদ রচনা শেষ হয়। তিনি 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' নামে আর একটি কাব্য রচনা করতে করতে মারা যান এবং তাঁর পুত্র রামপ্রসাদ গ্রন্থটি শেষ করেন। পিতা-পুত্র উভয়েই কবিপ্রতিভায় খ্যাত ছিলেন। দুর্গাপঞ্চরাত্রির বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব আছে। রামচন্দ্র কর্তৃক কিষ্কিন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবের বর্ণনা। এই বর্ণনার সঙ্গে এখানের 'রাবণকাটা' উৎসবের মিল আছে কিনা তা অনুসন্ধানযোগ্য।

'কবিচন্দ্র' উপাধি, প্রকৃত নাম শংকর চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যে 'কবিচন্দ্র চক্রবর্তি' ভণিতাও পাওয়া যায়। ১১৬ বৎসরের দীর্ঘ জীবন ছিল তাঁর। 'লেগোর দক্ষিণে ঘর, পানুয়ায় বসতি' ছিল তাঁর। তিনি মল্লরাজ বীর হাম্বির, রঘুনাথসিংহ, বীরসিংহ, গোপালসিংহ—এই চার নৃপতির রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ তিনি করেন এবং প্রায় ৪৬খানি পুঁথি রচনা করেন। রামায়ণ তিনি সংক্ষেপে অনুবাদ করেন, সম্প্রতি পুঁথিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।* কবিচন্দ্রের অধিকাংশ পুঁথিই বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ও পাশাপাশি গ্রাম থেকে পাওয়া গিয়েছে। পুঁথিগুলির মধ্যে লংকাকাণ্ড, রাবণবধ, সীতাহরণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অঙ্গদ রায়বার, লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি স্মরণীয়।

---

* 'শংকর কবিচন্দ্র রচিত বিষ্ণুপুরী রামায়ণ,' সম্পাঃ ড. চিত্রা দেব, ১৩৮৬

এ ছাড়াও বাঁকুড়ার টেরাকোটা মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির ভাস্কর্যে রামকথা, রামরাবণের যুদ্ধদৃশ্য। ভাদু ও তুষু গানে রামকাহিনীর ছিন্ন সূত্র। গিন্নীপালন উৎসবে দুই নারীকে রাম ও সীতা সাজিয়ে বিবাহবাসরের গান।** দশাবতার তাসের এক অবতার রামচন্দ্রের চিত্রশৈলী। রামযাত্রা ও রামায়ণ কথকথা। সোনামুখী অঞ্চলে প্রতিভাধর কথকদের বাসস্থান। সাঁওতালী গানেও রামকাহিনীর সূত্র আছে। গুহক চণ্ডালের বংশধর এই অঞ্চলেও আছে। সেই শ্রেণী সমাজের মানুষ রামকে ভালোবাসতেন। সেই ভালোবাসার স্রোতোধারা ফল্গুনদীর মতো কি এই অঞ্চলের জনমানসে প্রবাহিত হয়ে চলেছে? এ বিষয়ে সার্থক ও সত্য অনুসন্ধানী গবেষণা হওয়া দরকার॥

শারদীয়া মুক্তবিহঙ্গ। ১৩৯'

** এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আছে মৎপ্রণীত 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা' গ্রন্থে।

মন্দির টেরাকোটার উপাদান

বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে তেমন ভালো পাথর পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করলেও তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। উপরন্তু, পাথরে পালিশ তোলা, পাথরের রঙের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, পাথরের সহনক্ষমতা প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টিপাত করতে হয়। বাংলাদেশের রাঢ় ও মানভূম সংলগ্ন অঞ্চলে এককালে যে ধরনের জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি মন্দিরে, রাস্তাঘাটে, প্রান্তরে, প্রাঙ্গণে যেভাবে দেখা যেত সেইভাবে আজকাল দেখা যায় না। কষ্টিপাথর বা শ্বেতপাথরের এইসব মূর্তি নির্মাণের জন্য সৎ ও সহনশীল পাথর আনতে হয়েছে বাংলার বাইের থেকে। বাংলার থেকে অনেক বেশী ভাগ্যবান এ ব্যাপারে উড়িষ্যা, কিছুটা বা বিহার। ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চল বা দক্ষিণাঞ্চলের কথা নাই ধরলাম। বাঁকুড়ার মাকড়া পাথর মন্দিরের কাজে লাগে বা লেগেছে ভিত্তিবেদী নির্মাণে মাত্র। কারণ এই কোরওয়ালা পাথরে আর যাই হোক মূর্তি হয় না। এখানের গ্রানাইট পাথর খুব সহজ-লভ্য নয়, গ্রানাইট দিয়ে মূর্তি নির্মাণের চেষ্টা ভুল। কারণ এই পাথর অত্যন্ত শক্ত, রাস্তা নির্মাণের কাজে লাগে, মূর্তি নির্মাণে নয়। বাংলার শিল্পীদের তাই মাটিকেই তুলে নিতে হয়েছে, তাল তাল মাটি দিয়েই উচ্চচূড় মন্দির নির্মাণ করার স্পর্ধা দেখাতে হয়েছে। তারই সঙ্গে মাটির আয়ুকে পাথরের আয়ুর সঙ্গে সুদীর্ঘ করার চেষ্টাও তাঁদের করতে হয়েছে। মাটি সহজে ভঙ্গুর ও গলনশীল। তার উপর বাংলার জল হাওয়া মাটিকে ক্ষয় করার পক্ষে বড়ই উপযোগী। বাংলার আর্দ্র আবহাওয়া ধীরে ধীরে অথচ অবধারিত গতিতে মাটির মন্দির, মসজিদ, সৌধ, গড়, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতিকে ক্ষয় করে ফেলে, ক্ষয় করে ফেলেছে। কোন কোন পণ্ডিত দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতের মন্দির স্থাপত্যের, সৌধকলার সঙ্গে তুলনায় বাংলার স্থাপত্যের কোন মূল্য বা ঐতিহ্য দেখতে পান না বলে বাংলার নিন্দায় মুখর হন। তাঁরা ভুলে যান, পাথরের প্রতুলতার জন্যই মিশরে পিরামিড গড়া সম্ভব, রাজস্থানে দুর্গ নির্মাণ সম্ভব, বাংলায় নয়। যাও বা নির্মিত হয়েছিল কালের হস্তাবলেপে তাও মুছে গেছে। শুধু মন্দির মসজিদ নয়, বাংলার ভূইঞা বা বাংলার নরপতি নবাবেরা মাটির গড়, মাটির দুর্গ, বাঁশের কেল্লা রচনা করেছেন—ঐ পাথরের অভাবেই।

মাটিকে পুড়িয়ে হাজার বছরের আয়ু দেওয়া যায়, এর প্রমাণ বাঁকুড়াতেই আছে। বহুলাড়ার মন্দির। এই মন্দির নির্মিত হয়েছে প্রায় হাজার বছর পূর্বে। এর গাঁথনি মাটি পুড়িয়ে ইঁট দিয়ে, এর টেরাকোটার কাজও ঐ মাটি পুড়িয়ে। রোদ বৃষ্টি ঝড় এবং নিরন্তর বাতাসের সঙ্গে জলীয় বাষ্পের স্পর্শ সহ্য করেও মন্দিরটি সুউচ্চ শীর্ষ আকাশের দিকে তুলে আছে। পুরী বা কোনার্ক বা অজন্তা ইলোরার স্বপ্ন যাঁরা বাংলার মাটিতে শুয়ে দেখতে চান তাঁরা দেখতে পারেন, কিন্তু তা হবে দিবাস্বপ্ন মাত্র। বাংলার মৃৎশিল্পকে যাঁরা নিন্দার চোখে দেখেন তাঁরা দেখতে পারেন, কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা হবে টেরাচোখের কটাক্ষ।

॥ দুই ॥

মাটি পুড়িয়ে কি নির্মাণ করেছেন বাংলার শিল্পী জাদুকরেরা তার নিদর্শন

বাঁকুড়ার সর্বত্র। যেখানে যেমন করেই একটি মন্দির নির্মিত করা হোক না কেন, মাটির মধ্যে সহস্র প্রকারের মূর্তির কাব্যরস তাঁরা বণ্টন করতে চেয়েছেন। সেই কাব্যরসের উৎস সমাজজীবন ও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। বাংলার সমাজমানস ও বাংলার পৌরাণিক স্বভাব কি ছিল তা ভালো করে জানতে বুঝতে হলে একটি মন্দিরের সামনে আসুন। পুরাণ কত আপন হতে পারে তার প্রমাণ এখানে যেমন পাবেন, তেমনি পাবেন গত শতাব্দীতে গাঁথা মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান। দেবমুখীন মধ্যযুগ শুধু মন্দিরের মধ্যেই মূর্তিরূপে পূজিত হচ্ছে তা নয়, মধ্যযুগীয় বাস্তবতা—নগর ও গ্রামবাংলা, মন্দিরের সারা গায়ে, তিন দেওয়ালে, মন্দির অলিন্দে, গর্ভগৃহে ছড়িয়ে আছে। প্রায় সব মন্দিরের টেরাকোটা মূর্তিশ্রেণীর মধ্যে যেমন রামায়ণ আছে, তেমনি আছে মহাভারত, আর আছে অষ্টাদশ পুরাণ। রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য তৈরী করতে প্রায় সব শ্রেণীর মন্দিরশিল্পী বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। মন্দিরমধ্যে প্রবেশের প্রধান দ্বারের উপরে, খিলানের মাথায় দশমুণ্ডু বিশবাহু রাবণ এবং মুখোমুখী রাম ও লক্ষ্মণ যেভাবে যুদ্ধ করছে, তাতে শিল্পীর স্ফূর্তি কিসে প্রকাশ পেয়েছে তা সহজে বোঝা যায়। মহাভারতের কাহিনী এমন আগ্রহে মন্দিরচিত্রণে অবলম্বিত হয়নি। তারই সঙ্গে আমরা রাধাকৃষ্ণের দ্বৈত জীবনের লীলাপর্যায় অঙ্কিত হতে দেখতে পাই। একদিকে বীররসের আগ্রহ উৎসার, অন্যদিকে মাধুর্যরসের ধারাবর্ষণ—এই দুইয়ে মিলেই মন্দিরগুলি অভিষিক্ত। হনুমান, কুম্ভকর্ণ, দ্রৌপদী, পঞ্চপাণ্ডব, অভিমন্যু-উত্তরা প্রভৃতির সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম, রাধা-ললিতা ও গোপ-গোপিনীর দল, গোধন যেমন আছে তেমনি আছে বকাসুর বধ, কালিয়দমন, গোবর্ধন ধারণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কর্ণধার সারথি কৃষ্ণ প্রভৃতি বীররসাত্মক কাহিনীখণ্ড। বাংলার মন্দির বাংলার মাটির উপর সর্বাধিক নির্মিত হয়েছে বৈষ্ণবদের দ্বারা। বৈষ্ণবভক্তির মূল সুর মাধুর্যের সুর, অথচ ঐশ্বর্যের অধিকারী কৃষ্ণকাহিনী বলতেও উন্মুখ হয়েছিলেন মন্দিরশিল্পীরা। শুধুই রাসলীলা রসে পাঁচচূড়া শ্যামরায় মন্দিরটিকে অভিসিঞ্চিত করতে গিয়েও তাই যুদ্ধদৃশ্য, শিকারদৃশ্য তৈরী করেছেন মৃৎশিল্পী। এতে রসের দিক থেকে ছন্দোভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু ধরা পড়েছে শিল্পীমানস। অহিংসা পরমো ধর্মের দেশে, 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা'র দেশে, বীরপূজার চল যে চিরকালই ছিল তার প্রমাণ এইভাবেই মধ্যযুগের সাহিত্যে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় পিত্তল রথের কারুকলায়, পাটা চিত্রণে, পট অঙ্কনে। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে রামায়ণের পরেই তাই স্থান পেয়েছে ভাগবত। ভাগবতের কৃষ্ণ অবশেষে মাধুর্য অভিসারী, কিন্তু প্রধানতঃ ঐশ্বর্যে অধিষ্ঠিত। পুরাণের সঙ্গে অদূর অতীত ইতিহাসের কিছু খণ্ডচিত্রও কোন কোন মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়।

এই অদূর ইতিহাস মূলতঃ সামাজিক ইতিহাস। খুব আনন্দ পাওয়া যায় এই দিকে দৃষ্টি দিলে। পুরাণে সমাজে কেমন পাশাপাশি চলেছে, দুই জীবন-সূত্র কত সহজে বিন্যস্ত হয়েছে, কেউ কারও জন্য কুণ্ঠাবোধ করেনি। মেয়েরা চুল

বাঁধছে, মাছ কুটছে, পূজো করছে, গাই দুইছে, তারই সঙ্গে সন্ন্যাসী তপস্যা করছে, রাজা সিংহাসনে বসে আছে, দ্বারপাল গোঁফে তা দিয়ে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে, নাগরদোলায় মানুষ ঘুরছে। এককালে বিষ্ণুপুরে যে বহিরাগত সন্ন্যাসীদের জন্য 'অস্থল' ছিল, তার প্রমাণ আছে মন্দির টেরাকোটায়। বিষ্ণুপুর যে সংগীত সাধনায় একাগ্র ছিল তারও প্রমাণ খুব বেশী করে পাওয়া যায় মন্দিরগাত্রে। শুধু পরিবার রসের কথা নয়, শুধু সামাজিক আচার-উৎসব নয়, বিদেশী মানুষের আগমন কথা মন্দিরের মূর্তিতেই নিহিত আছে। হুগলী বর্ধমানের নিকটবর্তী মন্দিরগুলিতে, বিশেষ করে যেসব মন্দির অর্বাচীনকালের তৈরী, ফিরিংগীদের মূর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। গোপীদের বস্ত্রহরণ বা দশাবতার মূর্তির থেকেও কোন অংশে কম গুরুত্ব অর্জন করেনি এইসব ফিরিংগী মূর্তিশ্রেণী। নৌবাণিজ্যের আবেগ-আগ্রহ মন্দিরগাত্রেও খুঁজে পাওয়া যায়। টেরাকোটা শিল্পের একটা বিশেষ motif পোত নির্মাণে, যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে, বাণিজ্যযাত্রা কথনে প্রকাশ পেয়েছে। টেরাকোটার নবকুঞ্জর যেমন দর্শনীয়, তেমনি বাণিজ্যপোতও দর্শনীয় এবং স্মরণীয়। তারই সংগে আছে শিকারদৃশ্য। রাঢ় বাংলার অরণ্য সমাকুলতার মধ্যে বাংলার বীর সন্তানদের শক্তি ও দুঃসাহস প্রকাশের প্রসারিত অবকাশ ছিল। জঙ্গলমহালের বিদ্রোহী মানুষের দেখা ঐ শিকারদৃশ্য নির্মাণের মধ্যে পাওয়া যাবে। শুধু বাহ্যিক বাস্তব জীবন নয়, গোপন কাম জীবনও চিত্রিত হয়েছে, সামান্য হলেও, কোন কোন মন্দিরগাত্রে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বাংলার মৃৎশিল্পীদের সংযমের ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। পুরী কোনারকের অঢেল নগ্নতা তাঁরা কখনও স্বীকার করেননি।

বিশেষ কোন ধর্মের আশ্রয়ে শিল্প সৃষ্টির প্রসার ঘটে। মধ্যযুগে এই সত্য বিচিত্রমুখী প্রমাণ রেখেছে। বৌদ্ধধর্ম যেভাবে শিল্পকে উদ্বোধিত করেছে, ঠিক সেইভাবেই বৈষ্ণব ধর্মও উদ্বোধিত করেছে মন্দির ও মূর্তি শিল্পকে। মন্দিরের অভ্যন্তরে যে রাধাকৃষ্ণ আপন সৌন্দর্যে লীলাসুন্দর, সেই রাধাকৃষ্ণের জন্য মন্দিরসজ্জার মধ্যে অবশ্য শুধু ভাগবত আখ্যানই গৃহীত হল না, অনেক উদার আনন্দে সর্ববিধ পুরাণ কাহিনী নবরূপে রূপায়িত হল। পুরাণ ও বাস্তব কত সহজেই না মিলিত হয়েছিল মধ্যযুগে। মধ্যযুগের মুখ শুধু উর্ধ্বায়িত হয়েই ছিল, চোখ ছিল অন্ধ বিশ্বাসে বন্ধ, এ কথা একেবারে সত্য নয়। সত্য যে নয়, তার এক প্রমাণ যেমন মঙ্গলকাব্যগুলি, তেমনি প্রমাণ বাংলা-শৈলীর মন্দির টেরাকোটার উপাদানসম্ভার। মাটি পুড়িয়ে পুরাণকে ধরার চেষ্টা যেমন হয়েছে, সেই পোড়ামাটির মধ্যে বাস্তবের মাটিকে ভুলে যাবার কোন লক্ষণকেও তেমনি প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। এ যে কেমন করে সম্ভব হয়েছিল তা এ যুগের বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট থেকে ধরা যাবে না। কারণ এ যুগ মাটিকে আঁকড়ে ধরে ধুলোয় মুখ গুঁজে থাকতে অভ্যস্ত, পুরাণের সত্য ও সৌন্দর্যে যাবার প্রয়োজন যখনই হবে তখনই তাই আমাদের গিয়ে দাঁড়াতে হবে ভুবনমোহন মাটির মন্দিরগুলির সামনে॥

রাসলীলার পিরামিড ও অন্যান্য রাসমঞ্চ

অম্বিকাকালনায় মন্দিরগুলি দেখতে গিয়েছিলাম কয়েক বছর আগে। বিরাট বিরাট পঁচিশচূড়া মন্দির আর একশো আটটি শিবমন্দিরের বিহ্বল করা পরিবেশে একটি ভাঙা গোল রাসমঞ্চ দেখেছিলাম। ভাঙা হোক, বিধ্বস্ত হোক, তখনও সেখানে রাস হত, উৎসব হত। কালের করাল গ্রাসে, সৌধ সৌন্দর্য ভেঙে যায়, আর গড়ে ওঠে না। তবু মানুষের ভক্তি বাঁধ মানে না। ভক্ত মানুষ এখনো তাই তার প্রাণের ঠাকুরকে সেই ভাঙা মঞ্চে বসিয়েই পূজা করে, গান গায়, আনন্দ করে, কাঁদে।

বাঁকুড়া জেলার রাসমঞ্চগুলি দর্শনীয় এবং এখনো ভেঙে পড়েনি। বাঁকুড়ার মন্দিরগুলি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ। কিন্তু রাসমঞ্চগুলি নিয়ে তেমনভাবে স্বতন্ত্র আলোচনা চোখে পড়েনি। আমাদের এ আলোচনাও সম্পূর্ণ নয়। যা দেখেছি তার সুখী স্মৃতিচারণা মাত্র।

চৈতন্যদেব জন্মালেন ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে এবং তিরোধান করেন ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। তিনি বাঙালীর প্রাণের দরজায় এমন কি স্পর্শ দিয়ে গেলেন যার ফলে সাহিত্যে, শিল্পে-স্থাপত্যে, সঙ্গীতে এমন অজস্র নতুনত্ব সৃষ্টি হল? প্রাণ জাগলেই সবকিছু হয়। প্রাণের জাগরণই নবজাগরণ। ষোড়শ শতাব্দীর সেই নবজাগরণের স্বাক্ষর রয়ে গেছে মন্দিরস্থাপত্যে, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ শৈলীতে। আমরা রাসলীলা কাহিনী পেয়েছি সংস্কৃত মহাগ্রন্থ ভাগবতে, জয়দেবের গীত-গোবিন্দে, বাংলা অনুবাদ কাব্যে।

বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চটি অভিনব। আজ থেকে ষোল বছর আগে ঐ রাসমঞ্চের মাঠে বসেছি আমার প্রিয় রমণীর সঙ্গে। সে ছিল রাসমঞ্চের দিকে পিছন ফিরে বসা। প্রিয়তমা হারিয়ে গেছে। তবু বারবার গেছি ঐ রাসমঞ্চটি দেখতে।

বোবা নিথর একটি মাকড়া পাথর ও ইঁটের তৈরী পিরামিড। কিন্তু এককালে এমন বোবা ছিল না। গোটা মল্লভূমি রাজ্য জুড়ে সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপ্ত হয়ে যখন বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণার জোয়ার এসেছিল তখন এখানে প্রতি বৎসর রাজ-উৎসাহে রাসলীলা উৎসব হত। সে এক অবিস্মরণীয় উৎসব। একশো আটটি রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি আসতো রাজ্যের বিভিন্ন মন্দির থেকে। তাদের স্থাপন করা হতো এই রাসমঞ্চের প্রতি প্রকোষ্ঠে এবং সমগ্র সুবৃহৎ মঞ্চটিকে পুষ্পেপত্রে সজ্জিত করা হত। সংখ্যাতীত দর্শক সমাগমের আনন্দ মঞ্চটিতে মণ্ডিত করতো নতুন ব্যঞ্জনায়। কীর্তন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় জাগ্রত হত এই অদ্ভুত স্থাপত্যের প্রাণ।

মঞ্চটি চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখা যায়। প্রতিটি সুড়ঙ্গেও ছোটাছুটি করা যায় লুকোচুরি খেলার কৌতুকে। এমনকি পিরামিডাকৃতি মঞ্চটির মাথায় ওঠা যায় উৎসাহী পদক্ষেপে। সুদূর মিশর সুদানের নীল নদের তীরবর্তী পিরামিডের জ্যামিতিক গড়ন

ও শীর্ষবিন্দু সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন বিশ্বখ্যাত গবেষক দ্যানিকেন, তা মনে রেখে এই বিষ্ণুপুরী স্থাপত্যকীর্তিটির বিচার করা যেতে পারে।

মিশরের বিশেষ একটি পিরামিডের শীর্ষবিন্দু থেকে যদি একটি সরলরেখা টানা যায় এবং সেই সরলরেখাটি যদি পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করে, তাহলে দেখা যাবে যে পৃথিবীটি সমান সমান দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এই নিখুঁত জ্যামিতিক জ্ঞান মানুষের নয়, গ্রহান্তর থেকে আসা 'মানুষ' দেবতাদের। বিষ্ণুপুরের পিরামিড রাসমঞ্চ দেবতারা গ্রহান্তর থেকে এসে তৈরী করেনি। করেছে বিষ্ণুপুরের মন্দিরশিল্পী স্থপতিরা। তবু প্রশ্ন জাগে, কেমন করে এই মঞ্চটির মধ্যে এতগুলি জ্যামিতিক সুড়ঙ্গের সমাবেশ ঘটলো?

বিষ্ণুপুরের আলোচ্য রাসমঞ্চটি দেখার আগে পিরামিড সম্বন্ধে আরও কিছু জেনে নেওয়া দরকার। নীল নদের তীরে যুগ যুগ ধরে মিশরের 'ফারাও' রাজারা বহু পিরামিড নির্মাণ করেছিলেন। জ্যামিতিক বিশেষ গঠনরীতি অনুসৃত হয়েছিল। নীল নদের পশ্চিম তীর জুড়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল ভূমিভাগে বহু পিরামিড আজও আছে। মিশরে আছে। সুদানেও আছে। মিশরের অতীত ইতিহাস কয়েকটি রাজত্বকালে বিভক্ত। 'তৃতীয় রাজত্বকাল' থেকে 'দ্বাদশ রাজত্বকাল' পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে মিশরের পিরামিডগুলির গঠনে অবশ্য বৈচিত্র্যও আছে। সাধারণত গ্রানাইট পাথরে এগুলি নির্মিত অথচ ইঁটের ব্যবহারও হয়েছে কোন কোন পিরামিডে। সাধারণভাবে এর গঠনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে—**a monumental structure built of stone or the like, with a polygonal (usually square) base, and sloping sides meeting at an apex.'** 'তবে নানা রকমের পিরামিড আছে, যেমন—**Step pyramid, Great pyramid, Pyramid of Meidum, Pyramid of Giza** প্রভৃতি। গঠনগত, স্থানগত, কালগত এইসব ভাগ। দুইশত ফুট, পাঁচশত ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পিরামিডও আছে। **Great Pyramid**-এর উচ্চতা ৪৮১ ফুট এবং ভিত্তিবেড় প্রতিদিকে ৪৫৬ ফুট। কী বিরাট অবয়ব, এতেই অনুমান করা যায়। **Meidum** পিরামিডের গড়ন অনেকটা পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত মসজিদের মত, তবে মসজিদটি গোল আর ঐ পিরামিডটি চৌকোনো। মিশরের সাকারা অঞ্চলে ছোট ছোট ইঁটের পিরামিড দেখতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চটির সঙ্গে তুলনাযোগ্য এই পিরামিডগুলি। **"At Saqqara, but at a distance from the Step Pyramid, are the small brikbuild Pyramids of the Kings of the 6th dynasty."** তুলনামূলক আকারে ছোট হলেও গুরুত্বে ছোট নয় এগুলি। এগুলির মধ্যে আছে মৃতের ঘর, সেইসব ঘরে আছে ধর্মগ্রন্থ, গানের বই, মন্ত্রের পুঁথি, তন্ত্র-আচারের বস্তুনিচয়। এ সমস্তই রাখা হত মৃত রাজা বা রাণীর মমির প্রয়োজনে বা মঙ্গল সাধনের জন্য।

বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ দেবলীলার মঞ্চ, মিশরের পিরামিড মৃত রাজা-রাণীদের

মৃত্যুলীলার মঞ্চ। ঐসব পিরামিডে রাজার ঘর, রাণীর ঘর যেমন আছে, তেমনি একক ঘরবিশিষ্ট পিরামিডও আছে। এইভাবেই পিরামিড পৃথিবীর নবম আশ্চর্যের একটি। আর বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ স্থাপত্যকলার দিক থেকে বাঁকুড়ার তথা বাংলার 'একক,' আশ্চর্য। অদ্বিতীয় বিস্ময়।

বহু সুড়ঙ্গ, বহু স্তম্ভ, বেশ কয়েকটি দোচালা মন্দিরের চূড়া, চারচালা মন্দিরের চূড়া সুউচ্চ ভিত্তিবেদী, গোল খিলান ক্রমহ্রস্বমান থাক্ কাটা-কাটা শীর্ষ গঠন, ফুলকারি কাজ ও নক্সা প্রভৃতি মিলিয়ে এর যে গঠন-বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তা বাঁকুড়ার অন্য কোন রাসমঞ্চে চোখে পড়ে না, যেসব স্থপতি শিল্পী বিষ্ণুপুরের পাঁচচূড়া শ্যামরায় মন্দির, মদনমোহন মন্দির প্রভৃতি প্রথাগত বাংলা ও রত্ন মন্দিরের ধ্রুপদী ধ্যান সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা সেই প্রথাবন্ধন থেকে বেরিয়ে এলেন কি করে? এ আদর্শ তাঁরা কোথায় পেলেন? মল্লরাজাদের উদারতাও প্রশংসনীয়। পিরামিড, চালা মন্দির, স্তম্ভসজ্জা, ভিত্তিবেদী প্রভৃতি বিভিন্ন শৈলীর সমাবেশ,—এই একটি নির্মিতিতে ঘটলেও, এটা যে জগাখিচুড়ীতে পরিণত হয়নি, তা সহজ দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। বিশেষজ্ঞরাও দেখতে পাবেন, এই স্থাপত্য নিদর্শনটি যেমন মজবুত, তেমনি পরিমিত শিল্পবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন। বাঁকুড়ার মাচান, গীর্জা, নীলকুঠি, বাংলা মন্দির, রেখদেউল প্রভৃতির স্থাপত্যরীতি ভিন্ন ভিন্ন এবং দর্শনীয়। তাদের মাঝখানে বিষ্ণুপুর রাসমঞ্চটি অভিনব, একক, মহান।

সাম্প্রতিককালেও পিরামিড-বাড়ী তৈরী হচ্ছে। ইলিনয়ের ওমান (OMAN) দম্পতি সাত হাজার স্কোয়ার ফুট বেড় ও ৫৪ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বসতবাড়ী নির্মাণ করেছেন। **Statesman** এবং **Amritabazar** পত্রিকায় সেই পিরামিড-বাড়ীর ছবি ছাপা হয়েছিল যথাক্রমে ২৩ এবং ২৫ আগস্ট, ১৯৮৪।

বিখ্যাত মল্লরাজেশ্বর বীর হাম্বির (?) বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চটি নির্মাণ করেছিলেন আনুমানিক ১৬০০ খৃষ্টাব্দে। এই পিরামিড রাসমঞ্চটি পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু, মাকড়া পাথরের বেদীর উপর নির্মিত, বেদীর বহির্গাত্রে পদ্মপাপড়ির মতো সাজানো অর্ধবৃত্তাকার ডিজাইনের শ্রেণী। বেদীর উপর প্রথমেই নজরে পড়ে স্তম্ভগুলি। শ্যামরায় বা জোড়বাংলা মন্দিরের স্তম্ভের তুলনায় গড়নগত পার্থক্য আছে। গোল গোল খিলানের মাথার উপরে সমতল গাত্রে পোড়ামাটির পদ্ম, সামান্য নক্সা। বাহুল্য নেই। প্রতিদিকে দশটি করে খিলান। স্তম্ভগুলি আটকোণা এবং রীতিমতো পৃথুল। খিলানের মাথার উপরে প্রতিদিকে সারিবদ্ধ চারটি করে দোচালা চূড়া নির্মিত হয়েছিল, সবই প্রায় ভেঙে লুপ্ত হয়ে গেছে। পিরামিডের গড়নের সঙ্গে দোচালা খড়ের চালের গড়ন। বিস্ময় এখানেই। বাংলার খড়ের চাল এমনি করেই প্রভাব বিস্তার করেছে রাজস্থানের রাজকীয় ইমারতে, যোধপুর, জয়পুর উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ-গুলিতে। এমনকি আগ্রা দুর্গে বন্দী সাজাহানের শেষ বাসগৃহের দুপাশে তাঁর দুই কন্যা জাহানারা ও রোশেনারার যে দুটি গৃহ, সেগুলিও বাংলার খোড়োঘরের ঢালু চালের আদলে তৈরী।

যাই হোক, ঐ চালাসজ্জাগুলির পর থেকেই ধাপে ধাপে সিঁড়ির রেখা তুলে চূড়াটি উঠে গেছে উপরের দিকে এবং ক্রমশঃ সরু হয়েছে। মাথার উপরে একটা খুব ছোট্ট সমতল ছাদের মতো সৃষ্টি করেছে। মিশরের পিরামিডের সঙ্গে পার্থক্য এখানেও। বাইরের দিকে মিশরের পিরামিড এমন অলংকৃত নয়, মিশ্ররীতির নয়। বিষ্ণুপুরের পিরামিড-রাসমঞ্চটি অলংকৃত এবং মিশ্ররীতিময়।

রাসমঞ্চটির অভ্যন্তরে আরও গভীর অভিনবত্ব। ঐ যে খিলান সংখ্যা ১০ এবং সব দিকেই তাই, মৌচাকের ঘরের মতো সুড়ঙ্গগুলি এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত দেখা যায়। অভ্যন্তরেও আটকোণা থাম ও খিলানের সমাবেশ, প্রায় ভুলভুলাইয়ার মতো কিন্তু শুধু ধাঁধায় ফেলার জন্য এই নির্মাণশৈলী গ্রহণ করা হয়নি। প্রতি দিক থেকেই যাতে দর্শকেরা রাসের সময় রাধাকৃষ্ণ মূর্তিগুলি দেখতে পায় তার জন্যই এই অভিনব গঠন কারিগরি।

বর্তমানে ইমারতটির নানা অংশ খসে খসে পড়ছে। পুনর্গঠন চল'ছ কিন্তু ফুল-কারি নকশা ইত্যাদির সমাবেশ যথাযথভাবে হচ্ছে না। এখানের বন্ধ হয়ে যাওয়া রাস উৎসব পুনরায় চালু করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তাও নিয়মিত নয়।

এখন অন্য রাসমঞ্চগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। দিল্লীর কুতুবমিনার, আগ্রার তাজমহলের চারটি মিনার, চিতোর গড়ের কীর্তিস্তম্ভ ও বিজয়স্তম্ভ, কলকাতার মনুমেন্ট প্রভৃতি সুবিখ্যাত স্থাপত্যকীর্তিগুলি বহুকোণাকৃতি গোল অথবা মসৃণ গোল এবং সুউচ্চ। বাঁকুড়া জেলার রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চগুলি সেইরকম রাজকীয় নবাবী গরিমা লাভ করেনি। লাভ করার কথাও নয়। এখানের রাসমঞ্চগুলি পাথরের তৈরী নয়, ইঁটের তৈরী। সুউচ্চ সুবিশাল নয়। কিন্তু এগুলির গঠনও বহুকোণাকৃতি গোল। বঙ্গদেশের স্থাপত্যকলার বিচিত্র অভিনবত্বের মধ্যে রাসমঞ্চের স্থাপত্যকলা একটি দর্শনীয় সংযোজন। একদিকে পাঁচ নয় পঁচিশ চূড়াসমন্বিত মন্দির, অন্যদিকে খাঁজকাটা রথপগসংযুক্ত গোলাকার রেখদেউল—এই দুয়ের মাঝখানে যেন এই দুয়ের সমন্বয়ে রচিত রাসমঞ্চের স্থাপত্যকলা। অবশ্য তারই সঙ্গে স্মরণ করা দরকার বাঁকুড়া জেলার 'সিমাফোর' স্তম্ভগুলি। আট মাইল দূরে দূরে ১০০ ফুট উঁচু এই গোল ফাঁপা ইঁটের স্তম্ভগুলি অবশ্য ২০০ বছরের বেশী প্রাচীন নয়। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর বাস রাস্তার ধারে দু-একটি এখনও দেখা যায়। স্থানীয় ভাষায় এগুলিকে 'মাচান' বলে। মিনার বা মাচান গোল হলেও রাসমঞ্চের কাঠামো তাদের সঙ্গে তুলনাযোগ্য নয়।

রাসমঞ্চের চূড়া সংখ্যার বৈচিত্র্য আছে। প্রথমে ভিত্তিবেদী, তারপর গর্ভগৃহকে ঘিরে খিলানসমন্বিত মূল কাঠামো, তার উপরে দু' থাকে বা তিন থাকে চূড়া সমাবেশ—এইভাবেই হয়েছে রাসমঞ্চের অঙ্গবিন্যাস। ৮ / ১০টি খিলান দিয়ে ঘুরে ঘুরে গোল কাঠামো, তার ফলে সব দিক থেকেই রাধাকৃষ্ণ মূর্তিগুলি দেখা যায়। কাব্যে বর্ণিত রাসের বৃত্তনৃত্যের আদল পাওয়া যায় তাতে। খিলানের পরে গোল ঢাকা বারান্দা

এক বা একাধিক। একেবারে মধ্যখানে গর্ভগৃহ। একেবারে মাথার উপরে চূড়াগুলি প্রধানত দুই থাকে সমন্বিত। চূড়াগুলিও গোল করে সজ্জিত। চূড়াগুলির গড়নের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। ১৭টি চূড়ার সমন্বয়ই বেশি। সর্বোচ্চে মধ্য চূড়াটি সর্ববৃহৎ। বাঁকুড়া সদর শহরের দুটি পাড়ার নাম দোলতলা ও রাসতলা, দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চ অনুযায়ী। এই দুটি মঞ্চের গড়ন বিশেষ ভিন্ন নয়। দোলতলা ঐতিহাসিক স্থান। দোলতলার মঞ্চটি 'দোলমন্দির' নামে খ্যাত। তুলনায় অনেকবড় এবং গঠন-সৌষ্ঠবে সুন্দর। দোলতলার মঞ্চ সযত্নে রক্ষিত। রাসতলার মঞ্চ অবহেলিত। দোলতলার মঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২৬ অগ্রহায়ণ, ১২৪৯ বঙ্গাব্দে। সম্মুখভাগের একটি সংস্কৃত প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় 'বাকুণ্ডা' গ্রামের বাঁকুড়া জনৈক কৃষ্ণদাসের কন্যা সুকৃতির দান এই মঞ্চটি। সামান্য উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রায় ৩০ ফুট উঁচু এই মঞ্চটির মধ্যে গর্ভগৃহ ও দুটি গোল অলিন্দ আছে। খিলান দরজাগুলির নীচে বড় সাইজের হংসলতা ও উপরে ময়ূরলতা ছাড়াও ফুল গাছ এবং নানা প্রাণীর মূর্তি উৎকীর্ণ। ১৭ চূড়ার সমাবেশ দুই থাকে। প্রথম থাকে ৮ এবং তার উপরের থাকে ৮+১টি চূড়া। মধ্য চূড়াটি আটটি চূড়ার মাঝে একই তলে নির্মিত এবং সুবৃহৎ।

বিষ্ণুপুর থেকে বাসে গিয়ে জয়কৃষ্ণপুরের বাস স্টপেজে নেমে অযোধ্যা যাবার পথে শতাধিক দেউল ও ধরাপাটের বিখ্যাত রেখদেউলটি পড়ে। প্রায় চার মাইল পথ হেঁটে যাওয়াই ভালো। এই পথে অনেকগুলি রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, ঝুলনমঞ্চ দেখার সৌভাগ্য হবে। পাত্রবাগড়া গ্রামের গাঙ্গুলী পাড়ায় ১৯ চূড়াসমন্বিত একটি রাসমঞ্চ আছে। তারও পরে দেখা যাবে একটি পাঁচচূড়া রাসমঞ্চ। কুণ্ডুপাড়া, খয়রাপাড়া পার হয়ে ব্যানার্জীপাড়ায় বহুতর মন্দিরের মাঝখানে মাঝারি সাইজের ১৩ চূড়া রাসমঞ্চ, একটি ছোট ঝুলনমঞ্চ, দোলমঞ্চ এবং একটি অভিনব তুলসীমঞ্চ দেখতে পাওয়া যাবে। হাতির পিঠে তুলসীমঞ্চ।

অযোধ্যার নামোপাড়ার একটি ঘেরা চত্বরে বারোটি শিবমন্দির, বিখ্যাত গোবর্ধন মন্দির, দুর্গামন্দির, রাসমঞ্চ, ঝুলনমঞ্চ প্রভৃতির অবস্থান। এখানে দোল, রাস, ঝুলন, রথ প্রভৃতি উৎসব হয়। কুলদেবতা দামোদর বংশীবদনকে কেন্দ্র করে। এখানের পিতলের রথটিও দ্রষ্টব্য। ১৯ চূড়াসমন্বিত রাসমঞ্চের প্রতিটি চূড়ায় আমলক কলস পিতলের। ঝুলনমঞ্চের পঙ্খের কাজ অপূর্ব। রাসমঞ্চটি সুবৃহৎ। মন কেড়ে নেয় এর গঠনসৌন্দর্য। প্রায় দুশো বছরের পুরনো এই মঞ্চটি উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরম যত্নে নির্মিত।

বাঁকুড়া শহরের সন্নিকটে বিখ্যাত সোনাতোপলের ভগ্ন সূর্যমন্দির দেখতে যাবার পথে কংসাবতী খালের তীরে মালাতোড় গ্রামের রাসমঞ্চটিও দুই তলে ১৭টি চূড়া-সমন্বিত। এখানে মাঘী পূর্ণিমায় উৎসব হয়। দূর খাতড়ার সন্নিকটে জিওড়দা গ্রামের রাধাশ্যাম এখানে এসে থাকেন কয়েক মাস।

বিষ্ণুপুর থেকে সোনামুখী যাবার পথে পড়ে অবন্তিকা গ্রাম। নামটি রোমান্টিক

ও সংস্কৃত। কিন্তু এখানের নয়চূড়া রাসমণ্ডটির গায়ে জাফরির সমাবেশ মুসলিম স্থাপত্যকলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিষ্ণুপুর-আরামবাগ পথে পড়ে রাজগ্রাম বা রাহাগ্রাম। মাকড়া পাথরের ভিত্তিবেদীর উপর প্রায় ৩৫ ফুট উঁচু রাসমণ্ডটি ১৭ চূড়াসম্বলিত। ঐ পথেই কোতুলপুর থেকে যেতে হয় ভগলপুর। এখানেও আছে একটি রাসমঞ্চ।

ইন্দাস থানার অন্তর্গত সাসপুর গ্রাম। এখানে আছে ১৭ চূড়ার রাসমঞ্চ। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে নির্মিত। বাঁকুড়া জেলার সুবৃহৎ ও দর্শনীয় রাসমঞ্চগুলির মধ্যে একটি আছে হৃদলনারায়ণপুরে। পাত্রসায়েরর থানার অন্তর্গত। বাস বা বি ডি আর ট্রেনে যাওয়া যায়। ব্রাহ্মাণীদেবীর মূর্তি ও মন্দির, পিতলের রথ প্রভৃতির সঙ্গে রাসমণ্ডটিও দেখে নেবার সুযোগ হয়। এই রাসমণ্ডটির গায়ে টেরাকোটার অলংকরণ আছে, যার সৌন্দর্য কম নয়। গ্রামের উত্তর প্রান্তে সাতমহলা প্রাসাদ। তার সামনের প্রাঙ্গণে রাসমণ্ডটি অবস্থিত। ১৭টি চূড়া। প্রায় ৪০/৪২ ফুট উঁচু। দেবদেবীর টেরাকোটা। মূর্তিগুলি সত্যই সুন্দর। এখানে রাসের সময় গ্রামের সমস্ত রাধাকৃষ্ণ ও শালগ্রামশিলা সমবেত হয়।

মাসিক বসুমতী। ফেব্রুয়ারী। ১৯৮৫

পিতলের রথের স্থাপত্য ও কারুকলা

মানুষের তৈরী 'অলৌকিক' শিল্প সৌন্দর্য দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার অনেকবার হয়েছে। সে সব সুখের সময়। কিন্তু তারই সঙ্গে মাঝে মাঝে জড়িয়ে যায় বেদনার স্মৃতি। সেই প্রিয় মানুষটি মারা গেছেন। বঙ্গ-বিদ্যালয়ের সামনে তাঁর খড়ের চালের সাজানো বাড়ী। তিনি ছিলেন সজ্জন সম্মানীয় ব্যক্তি। অজিত কুমার আইচ। পোদ্দারপাড়ার পিতলের রথের ইতিহাস তিনি আমাকে বলেছিলেন। সেবার আমার সঙ্গে ছিলেন আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার তৎকালীন কিউরেটার শ্রীশিবেন্দু মান্না। বাঁকুড়া জেলার গ্রামীণ চণ্ডী পূজার খোঁজখবর করতে এসেছিলেন তিনি।

বাঁকুড়া জেলার পিতলের রথগুলিকে আমি দেখছি দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে। চোখ ভরেছে, মন ভরেনি। মন ভরেছে, কিন্তু চোখের দেখার শেষ হয়নি। তাই আজও দেখতে যাই। ভবিষ্যতেও দেখতে যাবো।

ইসকনের রথ স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে চলে। সে বিস্ময় সবার জানা। সবাই জেনে গেছেন: "As the 55 feet high semi-mechanical RATH approaches a tram wire about 30 feet above the ground, there is feverish activity below, inside its wooden resessos. Buttons are pressed, and wheels turned ; gradually the top subsides to the required level to pass under the wires "

বোতাম টিপলে রথের মাথা নেমে যায় না, তবে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রথ যে এই বাঁকুড়া শহরেও চলে সে খবর কে রাখেন? ভক্তিবিহ্বলতার সঙ্গে আজ মিলে গেছে প্রযুক্তিবিদ্যার বাহাদুরী। এখানের পিতলের রথের স্টিয়ারিং ধরে বসেন শংকরচন্দ্র কুণ্ডু। বহু বছর ধরে এই দায়িত্ব পালন করছেন সুঠাম শরীর 'বাঁকুড়াশ্রী' শ্রীকুণ্ডু।

ইসকনের রথ বাংলা রত্নমন্দিরের প্যাটার্নে বহুচূড় নয়। একচূড়। কলকাতা, নিউইয়র্ক, সান ফ্রানসিসকো, বরোদা—শহরের রথ, ইসকনের রথ, একচূড় রথ। যদিও চূড়ার মাথায় আমলক, কলস এবং পতাকা আছে। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, নড়রা, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের পিতলের রথগুলি কিন্তু বহুচূড়। রত্নমন্দির বা চূড়া মন্দিরস্থাপত্যে ঐশ্বর্যবান বাঁকুড়া জেলার পিতলের নির্মাণশৈলীতে মন্দিরশৈলীর প্রভাব পড়েছে। সমগ্র বাংলার রথশৈলী মোটামুটি একই রকম। অন্যান্য জেলায় মাহেশ, দশঘরা, দেউলপাড়া, গুড়ফুলি, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের কাঠের রথগুলি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, এলোমেলো পথে প্রান্তরে ঘুরতে ঘুরতে। ঐসব কাঠের রথগুলির গড়নও বাংলার মন্দিরস্থাপত্যের অনুসারী।

বাঁকুড়া শহরের নতুনগঞ্জ পাড়ার রথ সুবৃহৎ ও কারুসৌন্দর্যে মণ্ডিত। সোনার বরণ এই পিতলের রথটি তৈরী হয়েছে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। রথের পিছনের দিকের দ্বিতলে খোদাই করা আছে—

"মিস্ত্রী শ্রীরাধারমণ কর্মকার। সাং পাত্রসাএর
রথ আরম্ভ সন ১৩১৮ সাল।
২৭ অগ্রহায়ণ।"

রথের দ্বিতলেই মূল কারুকাজ ও ছবিগুলি বিন্যস্ত। সবই বা-রিলিফের কাজ। ৮ ½ × ৪' ফুট পিতলের প্লেটের উপর দশভুজা দুর্গামূর্তিটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর আছে রাধাকৃষ্ণ, অপূর্ব কদম্ববৃক্ষ। রথের ডান দিকে লক্ষ্মীনারায়ণ। সবই বড় বড় প্লেটে অঙ্কিত। আরও আছে নানা পৌরাণিক মূর্তিমালা। শিব দুর্গা, অনন্তশায়ন বিষ্ণু, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, বালি সুগ্রীবের যুদ্ধ, তীর গেঁথে গেঁথে সেতু নির্মাণ, অহল্যা উদ্ধার, গজ-কচ্ছপ ও গরুড়ের যুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা। তারই সঙ্গে নানা দেবদেবী মূর্তি।

নতুনগঞ্জের রথের সামাজিক চিত্রগুলিও দর্শনীয়। তালপাখা হাতে নারী, পুঁথি হাতে ব্রাহ্মণ—চাঁদা তুলছে, বিউগল মুখে সেপাই, বৈঠকী গানের আসর, বি ডি আর ট্রেন চলেছে, ব্যায়ামের নানা কসরত, শ্রীখোল বাজাচ্ছে বৈষ্ণব। বিশেষ লক্ষণীয় জংবাহাদুর। কে এই মহাবীর? দুই বগলে দুই সিংহ এবং দুই পায়ের খাঁজে দুই হাতিকে চেপে ধরে আছে। আর একটি মজার চিত্র—খেজুর গাছের মাথায় এক ব্যক্তিকে চাপানো হয়েছে। অর্থাৎ নরক যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে। এই রথকর্মিটির বিপক্ষ দলের কোন একজনকে মনে রেখে নাকি এই চিত্রায়ন।

নতুনগঞ্জের রথের নকশা, ফুলকারি, মূর্তিমালা প্রভৃতি দেখার পর মনে হয়েছে শিল্প-সুষমার অভাব আছে। অভাব আছে সার্বিক সংহতির। তবু প্রত্নমূল্যে মূল্যবান এই রথটির দেখাশোনা আরও ভালো করে করতে হবে। একান্ত সচেতন যত্ন নিতে হবে। বাঁকুড়া শহরের গর্ব এটি। কারুকার্য করা পিতলের পাত এমন করে চুরি হয়ে যাচ্ছে কেন? ভেঙে পড়ছে কেন রথের চূড়া?

পোদ্দারপাড়ার পিতলের রথটি শিল্পকলা-সুন্দর সর্বশ্রেষ্ঠ রথ। এমন নিপুণ, নিখুঁত, ঘনসন্নিবদ্ধ, কারু ঐশ্বর্যে মণ্ডিত পিতলের রথ আমি অন্যত্র দেখিনি। বীরভূম জেলার 'বনকাটি' গ্রামের পিতলের রথের প্রশংসা আমি পড়েছি, কিন্তু সে রথ এখনও 'দেখা হয় নাই'। ৩০ বৈশাখ, ১৩৬৩ সাল, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন পূজা অর্চনার মাধ্যমে পোদ্দারপাড়ার রথটি 'প্রতিষ্ঠিত' হয়। প্রথম যাত্রা—২৫ আষাঢ় ১৩৬৩ সাল (৯ জুলাই ১৯৫৬)। রথটি তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়েছিল ৭ জুলাই, ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে। রথের ব্লু-প্রিন্ট করে দেন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তৎকালীন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল যতীন্দ্রনাথ বসু। বর্ধমান জেলার অমরপুর গ্রামের রাধাবল্লভ কর্মকার ছিলেন প্রধান শিল্পী। মাহিনা পেতেন মাসিক ২০০ টাকা। সহযোগী সুযোগ্য

শিল্পী হচ্ছেন প্রাণকৃষ্ণ দে, চন্দ্রমোহন কর্মকার, রমানাথ কর্মকার। কাঠের কাজও কিছু করতে হয়েছিল নমুনা হিসাবে, শিল্পী ছিলেন নন্দ সূত্রধর। আরও অনেক শিল্পী সহযোগী হিসাবে কাজ করেছেন। স্থানীয় বিখ্যাত দত্ত, কুন্ডু, নন্দী, দরিপা, দে বংশের মানী মানুষদের আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতার কথাও স্মরণ করতে হয়। নীলকান্ত দে মশায় রথরক্ষা ও পরিচালনার সঙ্গে আজও সবিশেষ যুক্ত।

পোদ্দারপাড়ার এই নবরত্ন রথটির উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। নিচের ঘের প্রায় ১২ বর্গফুট। নতুনগঞ্জের নবরত্ন রথটির চেয়ে সামান্য ছোট। পোদ্দারপাড়ার রথের চাকা ছয়টি, নতুনগঞ্জের রথের চাকা চৌদ্দটি। কিন্তু পোদ্দারপাড়ার রথের নিজস্ব দেবতা নেই, দেব মন্দির নেই। বিশুদ্ধ রথপ্রেমেই এর সৃষ্টি। না হলে প্রভূত অর্থব্যয় করে কারা এ যুগে রথ তৈরী করান!

পোদ্দারপাড়ার রথের সব কারুকলার, সব মূর্তিকলার কথা বলা যাবে না। কারণ স্থানাভাব। তবু আসুন একটু ভালো করে দেখি। দেখবার মতো শিল্পবস্তু এটি। প্রতিভাধর শিল্পীদের কাজ প্রতিটি তলে উঠে, চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে।

রথটির মূল শরীর চারটি তলে বিন্যস্ত। তার মধ্যে দ্বিতল ও ত্রিতলে চিত্ররচনার সুযোগ বেশি করে নিয়েছেন শিল্পীরা। জটায়ু বধ ও গোপীবস্ত্র হরণ দৃশ্যের ছবি দুটি সব থেকে সুন্দর। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী রবি বর্মার ছবির কথা মনে পড়ে যায়। পূজারিণী, পদ্মনাভি ব্রহ্মা, গরুড়বাহন বিষ্ণু, রাসলীলা, যমুনা পাররত কৃষ্ণকোলে বাসুদেব, কালিয়দমন, গঙ্গাবতরণ, নৌকাবিলাস, শ্রীচৈতন্যদেব। সবই বড় বড় পিতলের পাতের উপর বা-রিলিফের কাজ। দুর্গা, বামনদেব, বরাহ-অবতার, শান্তনু ও গঙ্গা, দশ অবতার—কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখবেন! অজস্র পদ্মফুল ও পদ্মলতার ললিতসুন্দর কাজ, হস্তিমুখ ও শীর্ষচূড়ায় পাখীর জোড়। সমগ্র রথটির কোথাও এমন একটু স্থান নেই, যেখানে কারুকার্যের সৌন্দর্য-চিহ্ন নেই। রথ যখন চলে তখন রথের সামনে যুক্ত হয় দুটি পিতলের অভিনব পক্ষিরাজ, উড্ডীন বিস্তৃত তাদের পক্ষ। আর যুক্ত হয় সুদর্শন পিতলের সারথি। দেবমূর্তি বয়ে আনার জন্য পিতলের নক্‌শাকাটা পাল্‌কিটিও দর্শনীয়। রথটির সারা গায়ে উৎকীর্ণ হয়েছে সামবেদের শান্তিবাণী, শাস্ত্রবচন, মহাপুরুষদের উক্তি। সবই পরম যত্নে, পরম নিপুণতায় সৃষ্টি।

এই ধরনের বড় বড় পিতলের প্লেটে বা-রিলিফের কাজের অপূর্ব উদাহরণ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে রাজস্থান যোধপুরের বিখ্যাত 'উমেদ ভবন' গৃহে। আটটি কুলুঙ্গিতে আটটি কাজ সাজানো রয়েছে। পিতলের প্লেটগুলি প্রায় ৫৫ × ৩৬ ইঞ্চি আয়তাকার। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় বলেছেন ১৩৪৫ সালে নির্মিত হাজিপুরের পিতলের রথটিই প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে সবচেয়ে আধুনিক। তথ্যটি ভুল। পোদ্দারপাড়ার রথটি প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে ১৩৬৩ সালে নির্মিত। এরই

মধ্যে পোদ্দারপাড়ার রথটির রঙ কালো হয়ে গেছে। মোটর গাড়ির ধোঁয়া আর উপরে বাস করা এক হাজার পায়রার বিষ্ঠা তার জন্য দায়ী। প্রতি বছর রথের সময় আলোক-সজ্জার দাপাদাপি রথটির নিদারুণ ক্ষতি করছে। বাঁকুড়ার সুধীজনের কাছে অনুরোধ রথ দুটির অঙ্গ জুড়ে বিজলী আলোর প্রতিপত্তি এখনই বন্ধ করুন, না হলে পদ্মবনে মত্তহস্তীর ফলভোগ করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি বাঁকুড়া শহরের রথ উৎসব হয় রাত্রে।

বিষ্ণুপুর শহরে দুটি বড় ও দুটি ছোট পিতলের রথ আছে। আজ অবশ্য সব কটিকে পিতলের রথ বলা ভুল। মাধবগঞ্জে বিশাল ল্যাটারাইট পাথরের মদনগোপাল মন্দির ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মল্ল রাজরাণী শিরোমণির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং আজও অক্ষত। কিন্তু মদনগোপালের পিতলের রথটি অক্ষত নেই। প্রায় সব পিতলের পাত চুরি হয়ে গেছে। এর পাশেই আছে ছোট রথটি। সেটির অবস্থাও ভালো নয়। কৃষ্ণ-গঞ্জের পিতলের রথটি তুলনামূলকভাবে সৌষ্ঠবময়। যদিও কারুকার্য ও মূর্তিময়তা নেই। সামনের একটি ছোট পঞ্চচূড় বিষ্ণুমন্দিরের অনুকরণে আজ থেকে প্রায় ৮৪ বছর আগে রথটি নির্মিত। রথটির শিল্পকাজের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এক একটি চৌকো বা আয়তাকার পাতে এক একজন শিল্পী মূর্তি ও নক্শা তুলেছেন এবং নিজ নিজ নাম খোদাই করে দিয়েছেন। সকলেই স্থানীয় শিল্পী। যেমন কয়েকটি নাম—গিরিশচন্দ্র দে, ফকির দে, গণেশ দে প্রভৃতি। এঁরা ছিলেন স্বর্ণ-শিল্পী। স্বর্ণশিল্পীদের হাতের পিতলের কাজের নমুনা বহন করছে রথটি। বাহাদুরগঞ্জে রাধাদামোদরজিউর রথটি স্থানীয় চৌধুরী পরিবারের রথ। দেবী-দাস চৌধুরী বললেন, রথটি প্রায় ২০০ বছরের পুরানো। রথটি প্রায় ১৫ ফুটের মতো উঁচু। ১০টি চাকায় চলে। প্রথা অনুযায়ী পাঁচ চূড়া। কারুকার্য নেই, তবে অঙ্গহানি হয়নি, রথদেহ অটুট আছে। দেববিগ্রহ বহনের জন্য পিতলের পালকিটি তৈরী করেছেন বৈলাপাড়ার বিখ্যাত গোষ্ঠবিহারী কাঁসারি।

অযোধ্যা বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সংস্কৃত পঠন-পাঠনের পীঠস্থান। এখানের দশহরা আর দুর্গাপূজার খ্যাতি বিশ্বজোড়া।* দ্বারকেশ্বর নদ তীরবর্তী এই গ্রামের নামোপাড়ায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ৮।৯ ফুট উচ্চ রথটি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, চূড়াটি ভেঙে গেছে। তবে ফুলকারি, দেবমূর্তির কাজ খুবই সুন্দর। পাশের রাসমঞ্চের ১৭টি চূড়াও পিতলনির্মিত।

হৃদয়নারায়ণপুর গ্রাম পাত্রসায়র থানায় উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। এখানের প্রায় ১০ ফুট উচ্চ পিতলের রথটি নয়টি চূড়া সমন্বিত এবং শিবনারায়ণ মণ্ডল কর্তৃক ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। দশাবতার ও সামাজিক মূর্তিমালা অলংকৃত এই রথটি রথচিত্রণ ও মন্দির টেরাকোটার চিরাচরিত প্রথা বহন করছে।

---

* অযোধ্যার দশহরা সম্বন্ধে আলোচনা আছে মৎকৃত 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা' গ্রন্থে।

নড়রার পাত্রপাড়ার পিতলের রথটি ১৫।১৬ ফুট উচ্চ। পাঁচচূড়া রথ। বারোটি লোহার চাকা। মূলতঃ দু'থাকের রথ। প্রতিটি চূড়ায় আছে আমলক কলস। মধ্য চূড়াটিতে আছে চক্র। পুরানো দলিল অনুযায়ী ১২৫৮ বঙ্গাব্দে ১০ আষাঢ় রথটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। স্থানীয় বর্ধিষ্ণু জমিদার অম্বিকাচরণ পাত্র বিষ্ণুপুরের শিল্পী ক্ষুদিরাম কর্মকারকে দিয়ে এই রথটি নির্মাণ করান।

বালিঠা যেতে হয় কোতুলপুর থেকে। প্রায় দু মাইল। লোকদেবী 'বড়মার' পীঠস্থান বালিঠার পিতলের রথটিও দর্শনীয়। কয়লাখনি অঞ্চল মেজিয়া। মেজিয়ার পিতলের রথটি আসলে বাঁকুড়া শহরের পুরানো রথ। বাঁকুড়া শহরের 'পুরানো রথতলা'র রথটি এককালে বিক্রী হয়ে যায় এবং পোদ্দারপাড়ার রথটি তৈরী হয়।

পুরুলিয়া যেতে বাসরাস্তায় পড়ে ঝাঁটিপাহাড়ী। ছোট শহর। এখানের রথের সব পিতলের কারুকাজ, পিতলের পাত লুপ্ত হয়ে গেছে। প্লেন টিন সিট্ দিয়ে পুন নির্মিত এই রথটি ছোট ও সৌষ্ঠবহীন। পিতলের রথের পরিণতি যে কি হয় ঐ শ্যামুলীপাড়ার রথটির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। বড় কষ্ট হচ্ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ। ১২ আগষ্ট ১৯৮৪

দুটি পিতলের রথের চিত্রসৌন্দর্য ও অতীত ইতিহাস

১

পথে পথে ঘুরেছি রথ দেখবার জন্য। সারা বছর ধরে ঘুরেছি। রথের মেলায় গেছি। এবং মেলা যখন নয় তখনও রথের কাছে গেছি রথ দেখতে। তাই আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতাটির নিপুণ ব্যঙ্গের কোন মূল্য নাই। কেন যে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

রথযাত্রা, লোকারণ্য মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি
মূর্তি ভাবে আমি দেব—হাসে অন্তর্যামী।

'রথ ভাবে আমি দেব'—আমার কাছে ব্যঙ্গ নয়, রথই আমার কাছে দেবতা। মূর্তির জন্য নয়, রথের জন্যই আমি পথে নেমেছি। পথের দেবতাকে প্রণাম করতে হয়তো ভুলে গেছি। কিন্তু রথের দেবতাকে প্রণাম করতে ভুলে যাইনি। রথের দেবমূর্তি নয়, রথের প্রতি তলে অঙ্গে অঙ্গে যে রূপসৌন্দর্যের লীলা তাকেই আমি দেবতা জ্ঞানে প্রণাম করেছি। সৌন্দর্যের দেবতাকে।

এমনি দুই সৌন্দর্যের দেবতাকে প্রণাম করার সুযোগ হয়েছিল সদর শহর বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়া শহরে নতুনগঞ্জ ও পোদ্দারপাড়ায় দুটি পিতলের রথ আছে। দুটি রথই চিত্ররূপময়। বাঁকুড়া জেলার বালিঠা, বিষ্ণুপুর, অযোধ্যা, নড়রা, মেজিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এক বা একাধিক পিতলের রথ এখনো আছে। রথের মেলায় সেইসব রথ সাজানো হয়, যথারীতি দেবতার অধিষ্ঠান ঘটে, রথ টানা হয়। কিন্তু বাঁকুড়া শহরের রথযাত্রার গরিমা ও চমৎকারিত্ব তাদের তুলনায় অনেক বেশী।

রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে পুরীতে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ দর্শকের সমাগম হয়। তাঁরা প্রায় সবাই পুণ্যার্থী অথবা উৎসব-আগ্রহী মানুষ। শুধু সৌন্দর্য দর্শনের জন্য যান কোটিকে গুটিক। জগন্নাথ মন্দিরের স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্যের লীলা-বৈচিত্র্য, নানা মন্দিরের দেওয়ালে অজস্র দেওয়ালচিত্রণ যাঁরা দেখতে যান, তাঁরাই দেখতে পান কাঠের রথ তিনটির নির্মাণবৈশিষ্ট্য, দারু-ভাস্কর্যের ঐশ্বর্য, পটচিত্রণের রূপময়তা। ওদিকে সফেন সমুদ্র, এদিকে মানুষের হাতে গড়া কাঠের রথের সৌন্দর্য। কোনটি অধিক আকর্ষণীয় কে জানে! কাঠখোদাই মূর্তিমালা, অলংকরণ ও বর্ণসুষমার কবিত্ব, পটুয়াদের তুলির নৈপুণ্য—তেমন করে আর কে দেখেন! বলরাম, জগন্নাথ আর মাঝখানের সুভদ্রার রথের তিন সারথির তিনমূর্তি, দশাবতারের মূর্তিসারি,

সিংহাসনকক্ষের অলংকরণ দেখার জন্য রথ উৎসবের ঠিক আগে বা পরে যেতে হবে পুরীতে।

বাঁকুড়ার রথ উৎসবের সময় সন্ধ্যারাতের আলোকসজ্জা আর পত্রপুষ্পসজ্জা নিশ্চয়ই খরাক্রান্ত রাঢ়-বাঁকুড়াকে মুগ্ধ করে। কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম দুটি রথের কারুকার্য দেখে এবং রথনির্মাণের ইতিবৃত্ত জেনে। পুরীর কাঠের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করবো না, মাহেশের রথের পুণ্যগরিমাও এদের নেই। তবু যা আছে তা যেমন দেখার তেমনি দেখানোর।

২

নতুনগঞ্জ পাড়াটি বাঁকুড়া রেলস্টেশনের কাছে এবং পাড়াটি ব্যবসায়ী পাড়া। রথটি সুবৃহৎ এবং কারুকার্যখচিত। সোনারবরণ এই রথটির চারটি তলা। পুরীর রথস্থাপত্যের সঙ্গে পার্থক্য আছে এই রথস্থাপত্যের। বাংলার রথ সাধারণত পঞ্চচূড় বা নবচূড়। অনেকটা পোড়ামাটির পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন মন্দিরের মতো। নতুনগঞ্জের রথটি সমগ্রভাবে দেখার আনন্দ নিশ্চয় আছে। দেখতে হবে দূর এবং নিকট থেকে। নিকট থেকে দেখলে চোখে পড়বে পৌরাণিক ও সামাজিক উভয়বিধ চিত্রের প্যানেল বা ছোট-বড় ফ্রেমগুলি।

প্রশস্ত কংক্রিটের পথের উপর দিয়ে রথটি টানা হয়। নতুনগঞ্জ থেকে রাসতলা পর্যন্ত আগে আসতো, আজকাল আসে না। কারণ অন্য একটি রথের সঙ্গে সংঘর্ষে রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়েছে। দুটি রথের সঙ্গে সংঘর্ষ ও দাঙ্গা যাতে না হয় তাই রাসতলা পর্যন্ত গমন এবং প্রস্থান।

রথটির গায়ে বড় বড় অক্ষরে একটি লিপি খোদাই করা আছে রথের পিছনের দিকে দ্বিতলে—

মিস্ত্রী শ্রী রাধারমণ কর্মকার। সাং পাত্রসাএর
রথ আরম্ভ, সন ১৩১৮ সাল।
২৭ অগ্রহায়ণ

এই তারিখ বলে দিচ্ছে রীতিমতো প্রাচীন রথ এটি। প্রাচীন হলেও এখনো অবয়ব ও কারুকলা অটুট আছে। পিতলের ঔজ্জ্বল্য মরেনি। প্রখর সূর্যালোকে রথটি ঘিরে সৃষ্টি হয় সোনারঙের পরিমণ্ডল। অবশ্য নষ্টও হয়ে গেছে অনেক অংশ। পিতলের পাত খুলে পড়েছে। মাথার মধ্যচূড়া ভেঙে গেছে। রথকর্মিটি এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন বলে মনে হয় না। এই অপূর্ব শিল্পবস্তুটি রক্ষা করার সচেতন সক্রিয় দায়িত্ব নিলে ভালো হয়।*

রথের দ্বিতলেই মূল কারুকাজ ও ছবিগুলি বিন্যস্ত। রথের সামনের দিকে একটি

---

* বেদনার সঙ্গে জানাই, দায়িত্ব কেউ নেয়নি। রথটি ভেঙে পড়েছে। ১৯৮৮ থেকে রথ টানা হচ্ছে না। বর্তমান প্রবন্ধটি রচনার কয়েক বছর পরে এ ঘটনা ঘটেছে।

বেশ বড় প্লেটে (৩'৭ × ৪ ফুট) দশভুজা দ্ুর্গার সুবৃহৎ ছবি। বা-রিলিফের কাজ। রথের চিত্রাবলী, ফুলকারি, নকসা প্রভৃতি সবই বা-রিলিফের কাজ। দ্বিতলের পিছনের দিকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, অপূর্ব কদম্ববৃক্ষ ও মূর্তিকলা সত্যই নয়নলোভন। ৪ × ৩½ ফুট একটি প্লেটের উপর অংকিত। রথের ডান দিকে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ। বামদিকে দ্ু'পাল্লার পিতলের দরজা। দরজার পাল্লায় ছোট ছোট প্লেটে নানা ছবি। পৌরাণিক ও সামাজিক ছবি।

সামাজিক ছবিগুলি দেখতে হয় স্বতন্ত্র দৃষ্টি মেলে। তবেই আয়ত্ত হয় তার সম্পূর্ণ রসসৌন্দর্য। যেমন হনুমান লাফাচ্ছে, শায়িত রোগীর উপর ডাক্তার ডাক্তারি করছে, কয়েকটি কামরা জুড়ে লম্বা ট্রেন চলেছে এঞ্জিন সহ—এটি স্থানীয় ন্যারোগেজ ট্রেন বি ডি আর-এর প্রতিচ্ছবি। সেতার ডুগিতবলা সহ গানের আসর বসেছে। বন্দুক হাতে সেপাই, মুখে বিউগল বাজাচ্ছে। ফণাতোলা সাপের জটিল নকসা। পুঁথি হাতে ব্রাহ্মণ চাঁদা আদায় করছে রথের জন্য। পুঁথির পাতায় লেখা—১৩১৯ সাল। তালপাতার পাখা নিয়ে ব্যজন করছে নারী। ফুলের সাজি হাতে ও চামর হাতে রমণীবৃন্দ। এইসব ছোটবড় সামাজিক ছবির মধ্যেই আছে রথের 'মিস্ত্রীর' নিজের ছবি। আর বিশেষভাবে লক্ষণীয় রথের সম্মুখভাগে জংবাহাদুরের একটি ছবি। কে এই জংবাহাদুর জানি না, কিন্তু তাঁর শক্তিপ্রতিপত্তির যে অসাধারণ খ্যাতি ছিল এই ছবিটি দেখলেই বোঝা যায়। উচ্চাসনে উপবিষ্ট জংবাহাদুর দুই বগলে দুই বৃহৎ সিংহ এবং দুই পায়ের খাঁজে দুটি হাতিকে চেপে ধরে আছেন। তাঁর পালোয়ানী মুখ নির্লিপ্ত, প্রশান্ত। তাছাড়া রথের চৌকোনা বর্ডারগুলিতে, উপর থেকে নিচে পালোয়ানী কসরত, ব্যায়াম কসরত ছবির ধারাবাহিকতা দেখবার মতো। আরও দেখতে পাওয়া যায় শ্রীখোল বাজাচ্ছে বৈষ্ণবভক্ত, একতারা বাজাচ্ছে বাউল পথিক। সামাজিক চিত্রগুলির মধ্যে আর একটি লক্ষণীয় চিত্র—খেজুর গাছের মাথায় একটি মানুষকে বসানো হয়েছে কাঁটার উপর। এটি বাস্তব নরকযন্ত্রণার দৃশ্য। এই রথকমিটির বিপক্ষ দলের কোন একজনকে ঐভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে (স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের মন্তব্য)।

পূর্বেই বলেছি, রথটির দ্বিতলেই চিত্রপ্রাধান্য। সামাজিক চিত্রাবলীর সঙ্গে আছে পৌরাণিক চিত্রাবলী। শিবদুর্গা, কৃষ্ণবলরাম, গরুড়, অনন্তশায়ন বিষ্ণু (১ × ৩ ফুট প্লেটে), ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত বহন, তীরের পিছনে তীর গেঁথে সেতু নির্মাণ প্রভৃতি। বালি রাবণকে লেজে বেঁধে সাগরজলে ডোবাচ্ছে। বালি সুগ্রীবের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, অহল্যাউদ্ধার, বিষ্ণুমূর্তি, কৃষ্ণকর্তৃক কালীয়দমন, কালীনাগের পত্নীদের কৃষ্ণবন্দনা, গণেশজননী ও শিব, গজকচ্ছপ ও গরুড়ের যুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা, বাল্মীকির আশ্রমে লবকুশ কোলে সীতা, কৃষ্ণ যশোদা। তাছাড়া গোপিনীদের বস্ত্রহরণ, উড়ন্ত পরী, বকাসুর বধ, নৃসিংহ অবতার, নাড়ুগোপাল, ময়ূরচড়া কার্তিক, কালীমূর্তি, সরস্বতী মূর্তি, বলরাম-সুভদ্রা-জগন্নাথ, কল্কি অবতার প্রভৃতি চিত্রকলা

রথের অঙ্গসৌষ্ঠব যেমন বৃদ্ধি করেছে, তেমনি রথটিকে চিত্ররূপময় করে তুলেছে। আর একটি ছবির কথা বলি—শরীর ঘোড়া এবং মুখ মানুষের, এই বীরত্বব্যঞ্জক ছবিটি কি শুধুই ফ্যানটাসি, না কি মিশরীয় প্রস্তরমূর্তির প্রভাব?

রথটির দ্বিতলেও ছবির প্রাচুর্য। তবে ছবিগুলি পরিসরে ছোট। এখানেও আছে সামাজিক ও পৌরাণিক নানা ছবি। ছাতা মাথায় পথচারী, সন্তান কোলে মাতা ও পিতা, কুকুর ও প্রভু, বীণাবাদিনী নারী, কমণ্ডলু হাতে পূজারী প্রভৃতি সামাজিক ছবি। পৌরাণিক ছবিগুলির মধ্যে লক্ষণীয় মকরবাহনা গঙ্গা এবং রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের ক্রমিক দৃশ্যাবলী।

চোদ্দটি বড় বড় লোহার চাকার দ্বারা রথটি বাহিত হয়। রথটি নবরত্ন মন্দিরের মতো নবচূড়। পরম প্রযত্নে প্রত্যেকটি চূড়া তৈরী হয়েছে। বৌদ্ধমন্দিরের দীপাবলীর মতো ঊর্ধ্বমুখ বহু দীপশিখার সাজানো সারি দিয়ে তৈরী এক-একটি চূড়া। অথবা দীপশিখা নয়, পদ্মপাপড়ি। পদ্মপাপড়ির ঊর্ধ্বমুখ সমাবেশ ঘটেছে জ্যামিতিক নিয়মকে মান্য করে। প্রতিটি চূড়ার উপর আমলক, কলস, চক্র ও চক্রদণ্ড। রথের চারপাশের চারটি বাঁকানো চাল বিষ্ণুপুরের 'জোড় বাংলা' মন্দিরের বাঁকানো চালের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ১১×১২ ফুট বর্গক্ষেত্রের ফ্রেমে রথটি বাঁধা এবং উচ্চতা প্রায় ৩০-৩৫ ফুট। রথটি নাকি আরও উঁচু ছিল, ইলেকট্রিকের তারে লেগে যায় বলে উচ্চতা কমানো হয়েছে।

বাঁকুড়া শহরের প্রাচীনতম এবং বাঁকুড়া জেলার মধ্যে উচ্চতম পিতলের রথ হিসাবে এই নতুনগঞ্জের রথের কারুকাজ পোদ্দারপাড়ার (বাঁকুড়া শহর) রথের কারুকার্যের সমতুল্য নয়। আলোচ্য নতুনগঞ্জের রথের কারুকাজ ঠিক সুনিয়ন্ত্রিত সংহতি লাভ করেনি। বেশ একটু এলোমেলো এবং খাপছাড়া। তবুও উচ্চতা, বিশালতা, প্রাচীনতা এইসব মিলিয়ে নতুনগঞ্জের রথটি দর্শনীয় এবং চিরস্মরণীয়।

৩

পোদ্দারপাড়ার পিতলের রথটিই শিল্পকলাসুন্দর সর্বশ্রেষ্ঠ রথ। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এমন নিপুণ, নিখুঁত, ঘন সন্নিবেশিত কারুকার্যময় পিতলের রথ আমি অন্যত্র দেখিনি। অথচ রথটি তুলনামূলকভাবে অর্বাচীন কালের। ৩০ বৈশাখ, ১৩৬৩ সাল, পুণ্য অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন পূজো অর্চনার মাধ্যমে রথটির 'প্রতিষ্ঠা' হয়। প্রথম রথযাত্রা ২৫ আষাঢ়, ১৩৬৩ সাল (৯ জুলাই, ১৯৫৬)। রথ তৈরীর কাজ আরম্ভ হয় ৭ জুলাই ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ। ঐ দিনই কলকাতার Paris Collapsible Gate কোম্পানীকে ৩০৫১ টাকা অ্যাডভান্স পাঠানো হয়। এঁরাই পিতলের রথটির লোহার স্ট্রাকচার তৈরী করেন। কারুকাজ সমেত রথটি সম্পূর্ণ করতে মোট খরচ হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। রথের স্ট্রাকচারের ব্লুপ্রিন্ট ছকে দেন যতীন্দ্রনাথ বসু, তিনি যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক রামশশী কর্মকারের

চেষ্টায় খ্নজে পাওয়া যায় পিতল-শিল্পী রাধাবল্লভ কর্মকারকে। শিল্পীর বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার আদ্নলিয়া গ্রামে। রামশশীবাব্ন West Bengal Karmakar Association-এর সঙ্গে য্নক্ত ছিলেন বলেই শিল্পীর সন্ধান সম্ভব হয়েছিল। শিল্পী যে প্রতিভাধর ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজের নম্ননা বাঁকুড়া শহরের পোদ্দারপাড়ার ঐ রথটি।

এই রথের আদি কমিটির প্রথম মিটিং হয় ২০ | ১ | ১৯৫১ তারিখে। কমিটির গড়ন ছিল এই রকম—

প্রেসিডেন্ট ঃ—নগেন্দ্রনাথ ম্নখাজী', গোয়েঙ্কা স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক

ভাইস প্রেসিডেন্ট ঃ— অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিজয় দরিপা।

সেক্রেটারী ঃ—অজিতকুমার আইচ, সরকারী চাকুরীজীবী।

অ্যাঃ সেক্রেটারী ঃ—নিমাই কুণ্ডু, নরেন্দ্র নন্দী, সঞ্জয় নাগ।

ট্রেজারার ঃ—দ্নঃখভঞ্জন কুণ্ডু।

উৎসাহী সদস্য ঃ—পঞ্চানন চ্যাটাজী'।

এরই সঙ্গে স্মরণীয় যে, রথ-কমিটির প্রথম মিটিং অন্নষ্ঠিত হয় গোপালচন্দ্র নন্দীর আন্তরিক আগ্রহে। সেক্রেটারী অজিতকুমার আইচ ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী এবং এই স্নন্দর শিল্পবস্তুটি সম্প্নর্ণ করার নেপথ্যে তাঁরই মানসিক অবদান ছিল সর্বাধিক। তার সঙ্গে য্নক্ত হয়েছিল স্থানীয় বিখ্যাত কুণ্ডু, দত্ত, নন্দী, দরিপা, দে বংশের আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা।

পোদ্দারপাড়ার রথটির নির্মাণ পরিকল্পনা সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ আছে। আজকাল বাঙালী হিন্দ্নদের ধনসম্পদ হলে রথ বা মন্দির তৈরী করান না, বাড়ি করেন গাড়ি কেনেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক কালে তৈরী একটি সার্থক রথ রচনার নেপথ্য ইতিহাস জানার আগ্রহ স্বাভাবিক।

প্রধান শিল্পী রাধারমণ কর্মকার কিভাবে কতজন সহযোগী শিল্পী নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন সে খবরও আমরা নিয়েছি। কলকাতা থেকে রথটির লোহার স্ট্রাকচার এসে পেঁছাল লরীর পিঠে, দ্নর্গাপ্নর ব্রীজ পার হয়ে। বাঁকুড়া সহরের রক্ষাকালীতলার সামনের মাঠে শিল্পীদের কাজ আরম্ভ হল। প্রথমে চারজন শিল্পীকে নিয়োগ করা হয়েছিল—রাধাবল্লভ, রমানাথ, চন্দ্রমোহন, সত্যনারায়ণ। তারপর প্রয়োজন মতো ধীরে ধীরে অন্য শিল্পী বা কারিগরদের নিয়োগ করা হয়। যোগ্যতা অন্নযায়ী এঁদের মাস মাহিনা কি ছিল তার তালিকা নিচে দেওয়া হল। মাস মাহিনার সঙ্গে খোরাকিও দেওয়া হত আলাদা করে। যথা—

রাধাবল্লভ কর্মকার	২০০ টাকা
প্রাণকৃষ্ণ দে (উখরা, বর্ধমান)	১৬০ „
চন্দ্রমোহন কর্মকার	১৪০ „
রমানাথ কর্মকার (রাধাবল্লভের প্নত্র)	১২০ „

প্রহ্লাদচন্দ্র কর্মকার	১১০ "
নন্দ সূত্রধর (কাঠের কাজ)	১০০ "
দুঃখভঞ্জন কর্মকার	৯০ "
গোলকচন্দ্র দে	৫০ "
শংকরলাল দে	৩০ "
শক্তিপদ কর্মকার	৬০ "
সত্যনারায়ণ কর্মকার	৬০ "
করুণা দে	২২.৫০ "
শ্যামাপদ কর্মকার	৯০ "

রথ আচ্ছাদন ও শিল্পকারুকাজের জন্য পিতলের সিট্ কেনা হয়েছে প্রধানতঃ কলকাতা থেকে। কখনো বা বাঁকুড়ার বাজার থেকেও কেনা হয়েছে। পিতলের উপর বা-রিলিফের সমস্ত কারুকর্মের, মূর্তি চিত্রণের, ফুলকারি নক্শার পরিকল্পনা ছিল প্রধান শিল্পী রাধাবল্লভ কর্মকারের। রথের চূড়াগুলি কিরকম হবে তারও নমুনা তৈরী করা হয়েছিল কাঠ দিয়ে। চূড়াগুলির গড়ন 'শিখর' দেউলের চূড়ার মতো। প্রধান শিল্পী কি গভীর শ্রদ্ধায় কাজ আরম্ভ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে রথের গায়ে খোদাই করা একটি লিপিতে। লিপিটি আছে রথের সম্মুখভাগে দ্বিতলে বন্ধ দরজার পিতলের প্লেটে।

রথের ফ্রেম, রথের কারুকাজ প্রভৃতির সঙ্গে স্মরণীয় আর একটি টেকনিক্যাল দিক। রথটি চলে ছয়টি চাকায়—পিছনে চারটি, সামনে দুটি। ছয় চাকার এই রথটিতে ব্রেক সিস্টেম আছে, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রথটির গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দাড়ি ধরে রথটি টানা হলেও কিন্তু রাস্তার মোড় ও বাঁকগুলি ঘোরার জন্য স্টিয়ারিং ঘোরান হয়। গত প্রায় ২৭|২৮ বছর ধরে স্টিয়ারিংয়ে বসছেন 'বাঁকুড়া শ্রী' শ্রীশংকরচন্দ্র কুণ্ডু। অধুনা কলকাতার ইসকন (ISKCON) পরিচালিত বিখ্যাত ৫৫ ফুট উচ্চতার Semi mechanical রথটিও চলে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে। মাত্র পনের বছর আগে ইসকনের রথযাত্রা কলকাতায় শুরু হয়েছে! আর পোদ্দারপাড়ার রথ চলছে বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে। টেকনিক্যাল দিক থেকে শ্রেষ্ঠ না হলেও পোদ্দারপাড়ার রথটি কারুশিল্পসুষমার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

পোদ্দারপাড়ার নবরত্ন রথটির উচ্চতা, প্ল্যান অনুযায়ী ২২ ফুট এবং প্রস্থ ১১ ফুট। কারুকার্য ও চূড়ার ত্রিশূল সমন্বিত হয়ে দাঁড়ালো ৩৩½ ফুটের মতো এবং প্রস্থ ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি। পোদ্দারপাড়ার রথটি নড়রা গ্রামের পিতলের রথটি থেকে বড়, কিন্তু বাঁকুড়া নতুনগঞ্জ-এর পিতলের রথটির চেয়ে ঈষৎ ছোট।

রথটি তৈরী হয়েছে কোন বিশিষ্ট গৃহদেবতা বা বারোয়ারী মন্দিরদেবতার জন্য নয়। পোদ্দারপাড়ার রথকমিটির নিজস্ব কোন মন্দির বা দেবতা নেই। যে শ্যামসুন্দর মূর্তি বসানো হয় রথের সর্বোচ্চ চূড়ায় একটি পিতলের সিংহাসনে,

সেই ম্বর্তি আগে আসতো ঘটকপাড়ার শ্যামসুন্দর মন্দির থেকে, এখন আসে নিত্যানন্দ আশ্রম থেকে। এখন এই রথের জন্য স্থায়ী মন্দির ও নিজস্ব দেব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চলছে। বাঁকুড়া শহরের মধ্যেই গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ রোড, ইঁদারাগোড়া, বড়বাজার, চকবাজার হয়ে মাচানতলার মোড় পর্যন্ত রথটি আসে রথযাত্রার সময়। এখান থেকেই ফিরে যায় পোদ্দারপাড়ার রথের ঘরে অর্থাৎ স্থানীয় ভাষায় 'গ্যারেজে'। কোন 'মাসীর বাড়ি' নেই।

বাঁকুড়ার দ্বটি পিতলের রথই টানা হয় রাত্রে। আধ্বনিক বিজলী আলোকসজ্জার চমৎকারিত্বে। কোন বছর পোদ্দারপাড়ার রথ জয়ী হয় আলোকসজ্জায়, কোন বছর নতুনগঞ্জের রথ। অবশ্য এই আলোকসজ্জার জন্য রথের কারুকাজ, গড়ন, অবয়ব-সংস্থান নষ্ট হচ্ছে ক্ষতি হচ্ছে, সম্বহ ক্ষতি হচ্ছে রথ দ্বটির। সেদিকে কারও কোন দ্বষ্টি আছে বলে মনে হয় না।

পোদ্দারপাড়ার রথটি দেখতে দেখতে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার অধিকারী সংহত ও সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনার সত্যটি সবিশেষ ধরা পড়ে। এখানে আছে প্রধানতঃ পৌরাণিক পটচিত্র, সামাজিক চিত্র নেই বললেই চলে। টেরাকোটা মন্দিরের অলংকরণ রীতি-পদ্ধতির মতো এই রথেও আছে বিষ্ণুর দশাবতার ম্বর্তি—রথের চারপাশে বড় বড় প্লেটে উৎকীর্ণ। রথটির ম্বল কাঠামো চারটি তলে বিভক্ত। তার মধ্যে দ্বিতলে ও ত্রিতলে চিত্র রচনার সুযোগ শিল্পী বেশি নিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও রথের পা-ভাগ থেকে শীর্ষচ্বড়া পর্যন্ত সর্বত্র সুন্দর ফুলকারি, লতাপাতা, ম্বর্তি ও নক্শার কাজ। তার মধ্যে একটি জটায়্ব বধের ও একটি বস্ত্রহরণের ছবি আমাকে সর্বাধিক ম্বগ্ধ করেছে। বীরত্বব্যঞ্জক ঊর্ধ্বম্বখ খড়্গহস্ত য্বদ্ধজয়ী রাবণের সামনে জটায়্বর দ্বিখণ্ডিত দ্বটি ডানা আকাশে খসে পড়ছে,—চমৎকার দ্বশ্য! রবি বর্মার ছবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। রাবণের চোখম্বখের কাজে, নগ্ন ঊর্ধ্বাঙ্গে, কোমরবন্ধে, কোথাও কোন খ্বঁত নেই। কৃষ্ণকর্তৃক স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্রহরণের শত শত ছবি আমরা দেখেছি, কিন্তু এমন শিল্প-রসোত্তীর্ণ মধ্বর দ্বশ্যাংকন খ্বব কমই দেখতে পাওয়া যায়। বিস্ময় এইখানে যে, সব ছবিই মোটা পিতলের পাতের উপর বা-রিলিফ পদ্ধতিতে আঁকা অর্থাৎ উচ্চাবচ।

আহা কী অপ্বর্ব দ্বটি ঘোড়া! পক্ষীরাজ ঘোড়া। উড়ন্ত ডানা দ্বটি মেলে আছে। ঘোড়া দ্বটির বর্ণ, সৌন্দর্য, গঠন-পারিপাট্য তুলনাহীন। সরল চকচকে পিতলের নয়। ঘোড়ার পিঠে জিন পরানো কাজ, কারু আলপনাময়। ঘোড়ার ম্বখে লাগাম কারুকার্যময়। বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া বিশ্বখ্যাত। তা বহ্বলভাবে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। পাঁচম্বড়া, রাজগ্রাম, বাঁকি-স্যান্দরা, সোনাম্বখী, ম্বরল্ব, কেয়াবতী অঞ্চলের পোড়ামাটির ঘোড়ার পারিপাট্য ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যময়। বেলেতোড়ের ধর্মরাজের বিরাট বিরাট কাঠের ঘোড়াও দেখেছি। কিন্তু এই পোদ্দারপাড়ার পিতলের রথের পিতলের পক্ষিরাজ ঘোড়া দ্বটিও চোখ মেলে

দেখার জিনিস। তার সঙ্গে দর্শনীয়, পিতলের প্রমাণ সাইজের সারথি। নতুনগঞ্জের রথে সদ্য নির্মিত মাটির তৈরী বৃহৎ দুটি ঘোড়া ও বাবুবেশী সারথি, প্রতি বছর রথযাত্রার সময় নতুন করে গড়ে, রথের সঙ্গে যুক্ত হয়। খাঁটিপাহাড়ীতে টিনের রথে কাঠের ঘোড়া, কাঠের সারথি। পোদ্দারপাড়ার রথের সারথি ও ঘোড়া দুটির মহার্ঘতা অর্থমূল্যে নয়, শিল্পমূল্যে।

আরও কয়েকটি ছবির পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। কোনটি ১২ × ২৫ ইঞ্চি প্লেটে, কোনটি বা ২৫ × ৪০ ইঞ্চি প্লেটে অংকিত। শংখ চক্র গদা পদ্ম হস্তে বিষ্ণুমূর্তি, পদ্মনাভ ব্রহ্মা, গরুড়বাহন বিষ্ণু প্রভৃতি খুবই সুন্দর। ভিতরের অংশে, স্টিয়ারিংয়ের পাশে খুব বড় প্লেট 'বস্ত্রহরণ' দৃশ্য। এগারটি নগ্ন নারীমূর্তি, জলরাশি, কদম্ববৃক্ষে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন। আর আছে রাসলীলার দৃশ্য। রাধাকৃষ্ণের মূল মূর্তি ঘিরে অনেকগুলি কৃষ্ণগোপিনীর নৃত্যরত জোড়। তাদের অঙ্গসজ্জা, ফুলের গহনা ইত্যাদি দেখবার মতো। একেবারে নিচের থাকে রথের পা-ভাগে দুটি পুজারিণী মূর্তি। বড় কলাগাছ, তার নিচে ডান হাতে শংখ, বাম হাতে নৈবেদ্যর থালা নিয়ে পুজারিণী সামনে যার দেবদেউল। অন্যদিকে, নিচের তলে কালীয়দমন ও কৃষ্ণকোলে বাসুদেবের যমুনা পার হবার দৃশ্যও চমৎকার কাজের নমুনা। কালীয়র ফণার উপর কৃষ্ণের নৃত্যরত মূর্তি অপূর্ব, তাঁর দু'পাশে কালীয় নাগের যুক্তকর দুই পত্নী। অন্যদিকে ধ্যানস্থ পদ্মাসনবদ্ধ বুদ্ধদেব এবং অশ্বপৃষ্ঠে তরবারি হস্তে কল্কিমূর্তি। দ্বিতলের একটি প্লেটে অনন্তশায়ন বিষ্ণু—পদসেবা করছেন লক্ষ্মীদেবী, মাথার উপর পঞ্চমুখী বিশাল ফণা এবং নিম্নে সমুদ্র-তরঙ্গের ছন্দ সুচারু সুন্দর। বৃহৎ আর একটি প্লেটে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ঊর্ধ্ববাহু মূর্তি অংকিত। আর একটি ছবির বিষয় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে অস্ত্রত্যাগী কৃষ্ণপদাশ্রিত অর্জুনকে কৃষ্ণ গীতার মহাবাণী শোনাচ্ছেন। এখানে 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলাভস্য' বাণীটি উৎকীর্ণ করা আছে। আর এক দিকে বড় দুটি প্লেটে গোপিনীসহ শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস এবং গঙ্গাবতরণ দৃশ্যে আলুলায়িত কেশ মহাদেবের দাঁড়ানোর রুদ্ররসাশ্রিত ভঙ্গিটি অপূর্ব। এ ছাড়াও আছেন—লক্ষ্মী ও বিষ্ণু, আলাদা আলাদা ফ্রেমে। বিষ্ণুর মাথায় সপ্তফণাছত্র। আর আছে সামবেদীয় শান্তিবচন লিপি, বিবেকানন্দের বাণী। 'জীবে প্রেম করে যেই জন' উক্তিটি খোদাই করা হয়েছে।

নিচের তলে একপাশে ত্রিপাদ বামনদেবের অপূর্ব মূর্তি। অন্য পাশে বরাহবতার বিষ্ণু। দুর্গামূর্তি। শান্তনুর কাছ থেকে গঙ্গার বিদায় দৃশ্য। নাটকীয় নৃসিংহ মূর্তি। ত্রিতলে দেখতে পাওয়া যায় ঝুলনদোলায় রাধাকৃষ্ণ ও গঙ্গা-শান্তনুর প্রথম পরিচয় দৃশ্য। রামচন্দ্র কর্তৃক অহল্যা উদ্ধারের দৃশ্যটিও অসাধারণ। এই ধরণের বড় বড় পিতলের প্লেটে বা-রিলিফের কাজ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে রাজস্থান-যোধপুরের 'উমেদ ভবনে'। বর্তমানে এই বিরাট রাজভবনের একাংশে হোটেল। ভবনের মধ্য অংশে বসার ঘরে সুউচ্চ শত ফুট উচ্চ গম্বুজের থেকে চোখ নামিয়ে দেওয়ালের চারদিকে

দৃষ্টি দিলে আটটি কুলুঙ্গিতে আটটি পিত্তলচিত্র পাওয়া যাবে। প্রতিটি কুলুঙ্গি ৩৬ × ৫৫ ইঞ্চি আয়তাকার।

ধনু হাতে দণ্ডায়মান রামচন্দ্র, পায়ের কাছে অহল্যা। তাছাড়া পরশু হাতে পরশুরাম, মৎস্যাবতার, কূর্মাবতার ও পদ্মফুলের প্যানেল বা খণ্ড খণ্ড কাজ, চালু চালের পাড় ইত্যাদিতে অসাধারণ সৌন্দর্যে বিন্যস্ত হয়েছে। রথের চূড়া থেকে পা-ভাগ পর্যন্ত কোথাও এমন একটু পিতল নেই যেখানে কারুকাজ নেই। একেবারে নিচের দিকের সর্বশেষ বর্ডারে পদ্মফুল-লতার কাজ থেকে শীর্ষচূড়ায় পাখীর জোড়— সবই সাবধানে স্থির অভিনিবেশে সমাধা করা কারুকাজ। দ্বিতলের চালু চালের চারকোণে চারটি হস্তিমুখ ছিল, একটি ভেঙে পড়ে গেছে।

পদ্মফুল ও পদ্মলতার কারুকাজ দেখতে দেখতে মনে পড়ছিল সংস্কৃতি-শিল্পরসিক পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তি। 'বাঙ্গালার শিল্প' সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি বলেছেন—"অজন্তার চিত্রে অধিক স্থলেই শুধু পদ্মের ছবি পাই। বৌদ্ধগণ পদ্ম-চিহ্নকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য অজন্তার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে পদ্মের এত ছড়াছড়ি। কিন্তু বাঙ্গালার কাঁথায় ফুলের ছবি দেখুন। পদ্ম ইঁহারাও আঁকিয়াছেন, কিন্তু এখানে শিল্পী পদ্ম নকল করেন নাই। পদ্মের ছাপ শিল্পীর মনের ভিতর পড়িয়াছে, এজন্য শত শত ভাবের পদ্ম তিনি ছুঁচ সূতা দিয়া আঁকিয়াছেন। প্রকৃতির পদ্ম এক রকমের, কিন্তু মানস-পদ্মের সংখ্যার অবধি নাই।" পোদ্দারপাড়ার রথের গায়ের পদ্মচিত্র মানসপদ্ম নয়, প্রকৃতির পদ্মেরই সুচারু অনুকৃতি এবং বিচিত্র সুন্দর সে-সব পদ্ম।

রথের দ্বিতলে ও ত্রিতলে বহু সংবাণী, সংস্কৃত শ্লোক, বাংলা কবিতা উৎকীর্ণ হয়েছে। তার মধ্যে দুটি লিপি এখানে তুলে দিচ্ছি। দ্বিতলের দুদিকের দুটি দরজায় লিপি দুটি উৎকীর্ণ হয়েছে। শিল্পীদের নাম ও সাল তারিখ আছে বলে লিপি দুটির গুরুত্ব অনেক—

১। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর নবরথ
প্রতিষ্ঠা দিবস
সন ১৩৬৩ ২৫ আষাঢ়
সাল সোমবার

২। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর রথকমিটি
বাঁকুড়া চকবাজার
নবরত্ন তৈয়ারী ও প্রতিষ্ঠাতা
সন ১৩৬৩ সাল ২৫ আষাঢ়
শিল্পীগুরু ৺কাঙ্গালচন্দ্র কর্ম্মকার।
সেবক রাধাবল্লভ কর্ম্মকার অমরপুর

প্রাণকৃষ্ণ সূত্রধর	জেলা বর্ধমান
রাধানাথ কর্ম্মকার	গোকুলবিহারী কর্ম্মকার
সত্যনারায়ণ কর্ম্মকার	(সবার উপর সত্য)

আমরা শিল্পীদের নামের যে তালিকা পূর্বে দিয়েছি, আমরা তা পেয়েছি প্রথম রথকমিটির সেক্রেটারী অজিতকুমার আইচের কাছে। সেই তালিকায় নেই এমন একটি নাম অবশ্য এই লিপিতে পাচ্ছি।

এত অভিনব আনন্দদর্শনের পর বেদনার কথা এই যে সাম্প্রতিক কালে তৈরী হলেও পোদ্দারপাড়ার রথটির রঙ কালো হয়ে গেছে। তেল দিয়ে বা তেঁতুল দিয়ে মেজে পরিষ্কার করা হয় না। রথ তৈরীর পর থেকে কোনদিনই হয়নি। সেই কারণেই কি কালো হয়ে গেছে? স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন—পিতলের মান নিকৃষ্ট, তাই পাতগুলো কালো হয়ে গেছে। আরও একটি কারণ আছে—বাস লরি রাস্তার পাশে 'গ্যারেজ', বাস ট্রাকের ধোঁয়া ধুলো সব সময় পড়ছে রথটির উপর, পায়রার বিষ্ঠা জমছে সারা বছর ধরে। সে কারণেও রথটির বর্ণ নষ্ট হয়ে যাচেহ বা গেছে। প্রতি বছরই বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জার হিসাবহীন বাড়াবাড়ি রথটির সমূহ ক্ষতি করছে, রথটি সব অঙ্গ নিয়ে আর কতদিন অটুট থাকবে? বিষ্ণুপুরে বা ঝাঁটিপাহাড়ীর রথের দৃশ্য দেখলে পোদ্দারপাড়ার রথটির জন্য ভাবনা হয়। রথটির দ্বিতলের চারপাশের আধুনিক লোহার গ্রীলের বারান্দা অত্যন্ত অরুচিকর, অশোভন। তবু সর্বাঙ্গীণ সচেতনতায় এই পরম গৌরবের শিল্পবস্তুটি রক্ষিত হোক, এই কামনা বাঁকুড়াবাসীর মনে জাগ্রত হবে নাকি!?

বাঁকুড়া হিতৈষী। ১৩৯২।

বাঁকুড়ার লোকশিল্পধারা

বাঁকুড়া জেলার ভৌগোলিক অবস্থান মধ্যরাঢ়ে। বাঁকুড়ার লোকশিল্পের ঐতিহ্য ও বর্তমান ধারা গুণগত ও পরিমাণগত দিক থেকে রাঢ়ের লোকশিল্পের অনুগামী। তবু কোন কোন ধারা বাঁকুড়ায় আজও প্রাণাবেগে জীবিত, কোন ধারা রাঢ়ের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পধারার তুলনায় হয়তো ক্ষীণ। 'Narrowness, depth and intensity are the qualities of folk-cultures'—লোকসংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্য মনে রাখলে বোঝা যাবে 'Narrowness'-এর নিয়মে কোন্ কোন্ লোকশিল্পের মূল উৎস ছিল এই জেলায়, কোন্ শিল্পধারার প্রান্তিক রেখাটুকু চলে গিয়েছে এই জেলা দিয়ে। যেমন মন্দিরশিল্প বা পোড়ামাটির হাতিঘোড়া শিল্পের উৎসমুখ ছিল বাঁকুড়ায়—তাই এখানেই এই শিল্পের অতুলনীয় প্রাধান্য বা অনবদ্য ঐশ্বর্য। কিন্তু পটশিল্পের দিক থেকে বীরভূম-মেদিনীপুরের থেকে এই জেলা তুলনামূলকরূপেই ক্ষীণতর ধারার অধিকারী। গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ম ও যামিনী রায়ের পটসংগ্রহের কথা মনে রেখেও এ সিদ্ধান্ত করা যায়। অর্থাৎ পটশিল্পের মূল উৎস নয়, পটশিল্পের প্রান্তিক রেখাটি মাত্র এই জেলা দিয়ে চলে গেছে। আবার দারুশিল্পের যে উৎকর্ষ ঘটেছিল হুগলী জেলায়, বাঁকুড়া জেলায় তা ঘটেনি। অর্থাৎ এখানেও বাঁকুড়ায় প্রান্তিক রেখাটির স্পর্শমাত্র ঘটেছে।

অনেকে চারুকলা ও কারুকলাকে পৃথক দৃষ্টিতে দেখতে ও বিচার করতে অভ্যস্ত। লোকায়ত চারুকলা ও কারুকলা (Folk art and craft) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এই বিভাজনের সম্মুখীন হতে হয় এবং অস্বস্তি অনুভূত হয়। চারুকলা ও কারুকলার পার্থক্য যতটা না নন্দনতাত্ত্বিক তার থেকে বেশি আর্থনীতিক। আর্থনীতিক বলেই বুঝি কারুকলার সম্মানদক্ষিণা চারুকলার থেকে কম। তবু জানি লোকায়ত চারু ও কারুকলার ভাগটি কৃত্রিম। একদিনের নিছক গোষ্ঠীশিল্প আজকে কুটিরশিল্প বা ক্ষুদ্রশিল্পের সংজ্ঞায় পরিণত হয়েছে। অতীতের মানদণ্ডে যা ছিল উদ্বৃত্ত প্রাণের আনন্দ লালন, আজ তা ক্ষুধাহরণের আর্থিক প্রয়োজনের উপায়। সুদীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী বলেই লোকায়ত শিল্পের ধারায় এই রকমটি ঘটেছে। আমরা তাই মধ্যমপন্থী 'লোকায়ত শিল্প' শব্দটিকে গ্রহণ করেছি, যার মধ্যে চারু ও কারু উভয়বিধ কলাই অন্তরঙ্গ অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছে। "Folk visual arts created by groups that exist within the framework of a developed society (as distinguished from prehistorical and preliterate groups) but, for geographical or cultural reasons, are largely separated from the sophistica-

ted artistic developments of their time and produce distinctive styles and object for local needs and tastes." (The New Encyclopaedia Britannica, Vol IV, 1978). দর্শনীয় লোকশিল্পের এই সূত্র অনুযায়ী আমাদের আলোচনা অগ্রসর হলেও আমরা দৃষ্টি দিয়েছি প্রধানতঃ নিকট অতীত ও পরিচিত বর্তমানের উপর। আমরা জানি, সীমাবদ্ধ কোন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ-শিল্প-সাহিত্য-বিশ্বাস ও বিন্যাস আজ বাঁকুড়া জেলায় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ কালের নিয়মে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ঐ মিলিত সত্তারই আমাদের সাধ্য।

সারা বাঁকুড়া জেলায় সংখ্যাতীত মন্দির আছে। প্রধানতঃ শিবমন্দির ও রাধাকৃষ্ণ মন্দির। এইসব মন্দির নির্মাণ করেছেন নৃপতি বা ধনপতিদের আদেশে এক বিশেষ শ্রেণীর শিল্পীগোষ্ঠী। এই শিল্পীগোষ্ঠী মন্দির অলংকরণের কাজ করতেন দীর্ঘ-দিন ধরে। এঁরা মূলতঃ ছিলেন যাযাবর। এক স্থান থেকে আর এক স্থানে এঁরা চলে যেতেন মন্দির নির্মাণের আহ্বান অনুসারে। আজ বাঁকুড়া জেলায় এই শিল্পী-গোষ্ঠীর কোন অস্তিত্ব নেই। যদি কোথাও থাকে তবু তাঁরা তাঁদের শিল্পশিক্ষা হারিয়ে ফেলেছেন বা অন্য পরিচয়ে বিদ্যমান আছেন। নৃপতি ও মন্দির-প্রেমিক ধনপতিরা যেমন বিলুপ্ত হয়ে গেছেন, তেমনি মন্দিরস্থাপত্য ও মন্দির টেরাকোটার শিল্পধারাটিও থেমে গেছে। আজ আর কেউ বাঁকুড়ার মাটির উপরে মন্দির নির্মাণ করান না। চলিষ্ণু ইতিহাসের নিয়মে কালের কপোলতলে স্মৃতির অমৃতবিন্দুর মতো যাঁরা শিল্পস্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের আমরা লোকশিল্পী বলবো কি? তাঁদের সৃষ্ট শিল্প কি হবে না লোকায়ত শিল্পের নমুনা? নৃপতি বা ধনপতিদের আর্থিক সাহায্যে তাঁরা শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি করতেন—একথা ঠিক এবং এ কথাও ঠিক যে তাঁদের কলাকৃতি দরবারী শিল্পের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছে। কিন্তু তৎসত্বেও তাঁদের শিল্প তো এক ব্যক্তির জন্য একক শিল্পীর সৃষ্ট নয়; নয় একক মনের নিঃসঙ্গ সৃষ্টি। তাঁরা ছিলেন গোষ্ঠীজীবনে অভ্যস্ত, তাঁদের সৃষ্টির সম্ভারে জনমানস অভিব্যক্তি লাভ করেছে। জনমানসের অভিব্যক্তি বিষয়টি যে কত সত্য তার প্রমাণ সরাসরি পাওয়া যাবে বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা বা শ্যামরায় অথবা মদনমোহন, শ্রীধর, রাধাবিনোদ মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে। এরই সঙ্গে দেখতে বলি হদলনারায়ণ-পুরের রাধাদামোদর, আকুইয়ের রাধাকান্তজীর মন্দির, সোনামুখীর পঁচিশচূড়া শ্রীধর মন্দির, রাজগ্রামের নবরত্ন শ্রীধর মন্দিরগুলি। সেখানে প্রধানুগত দশাবতার বা রামরাবণের যুদ্ধদৃশ্য বা শিবদুর্গা বা পৌরাণিক প্রসঙ্গ চিত্রায়িত হয়েছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি সমান আগ্রহে উচ্চ বা নিম্ন, দূর বা নিকট সমাজজীবনের শত খুঁটিনাটি বিষয়ও চিত্র-ফলকে ধরে রাখা হয়েছে। তৎকালীন সাধু সন্ন্যাসী পীর ফকিরদের জীবন, নদী-জীবন, সাধারণ মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, নারী ও পুরুষের মিলিত জীবনছন্দ, বিদেশীদের জীবন দৃশ্য, পশুপাখী প্রভৃতি পরম

নিষ্ঠায় চিত্রে বিধৃত হয়েছে। সব মিলিয়ে সমগ্র মধ্যযুগ স্তরে স্তরে ধরা আছে ঐসব সহস্র টেরাকোটা ফলকের মধ্যে। মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শিবমঙ্গল, রামায়ণ ও মহাভারত, বৈষ্ণব পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্য জীবনী, নাথ সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী, মৈমনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে যেসব সমাজ বিষয় বর্ণিত হয়েছে সেগুলিই কমবেশি উদাহৃত হয়েছে মাটি পুড়িয়ে নির্মিত পোড়ামাটির মন্দির কারু শিল্পে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি—মন্দিরগাত্রে তৎকালীন লোকমানসেরই প্রতিফলন ঘটেছে। পৌরাণিক বিষয়বস্তুর সীমাহীন প্রাচুর্যও ঐ একই লোকমানসের প্রতিফলনের উদাহরণ। তা না হলে মন্দিরের গর্ভগৃহে মধুরাশ্রয়ী কান্তাপ্রেমের দেবতা রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত থাকলেও মন্দিরগাত্রে কেন পৌরাণিক ও লৌকিক যুদ্ধদৃশ্য চিত্রায়িত, কেন কালীমূর্তিও নির্মিত? কেন ফিরিঙ্গীদের, হার্মাদ ওলন্দাজ জলদস্যুদের, বর্গীহাঙ্গামার নায়কদের চিত্র? উত্তর একটিই। লোকমানস। শুধু পরিপোষক নৃপতি বা ধনপতিদের মানস-প্রাধান্য ঘটলে মন্দিরগাত্রে সমাজ বিষয়, পুরাণ বিষয় এমন প্রাচুর্যে আসতো না। তাছাড়া রাজদরবারের রুচিমাফিক তা হত কামঘন। বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের কামঘন দরবারী রুচি বাঁকুড়ার মন্দিরগাত্রে কিঞ্চিৎ দেখা গেলেও পুরীকোণার্কের মিথুন মূর্তি বাঁকুড়ার মন্দিরশিল্পে প্রভাব ফেলেনি। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাঁকুড়ার মন্দিরশিল্প লোকশিল্পেরই উজ্জ্বল উদাহরণ।

বাঁকুড়ায় আজ মন্দিরশিল্পীরা হারিয়ে গেছেন, মল্লভূম বা সামন্তভূমের রাজারা হারিয়ে গেছেন, কিন্তু থেকে গেছে টেরাকোটা শিল্পসমৃদ্ধ মন্দিরগুলি। হাজার বছরের পুরানো বহুল্যাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির যেমন আছে, তেমনি আছে শত বৎসরের ছাতনার নতুন বাসুলী মন্দির (ছাতনার রাজগড় এলাকার নতুন পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত)। এর মাঝখানে শত সহস্র মন্দির, বাঁকুড়ার মৃৎশিল্প ঐতিহ্যের পরম প্রত্ননিদর্শন। বাঁকুড়ার এই ঐতিহ্যধারাটি বোধ হয় আজ অন্য আর এক খাতে বইছে। সাম্প্রতিক বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের সেরা নিদর্শন টেরাকোটার হাতিঘোড়া, মনসার চালি ও মনসার বারিঘট, বোঙা হাতি, মাটির শংখ প্রভৃতি। বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া, রাজগ্রাম, স্যান্দরা, সোনামুখী, কেয়াবতী, মুরলু প্রভৃতি অঞ্চলে পোড়ামাটির ঘোড়া তৈরী হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন গঠন, ভিন্ন ভিন্ন অলংকরণ। ঐ বিশিষ্ট স্থানগুলি ছাড়াও বাঁকুড়া জেলার প্রায় সব কুম্ভকারই কমবেশি হাতিঘোড়া তৈরী করেন। কারণ আদিম শিল্পনিদর্শনের ঐতিহ্য ও অবয়ব সৌষ্ঠব বহনকারী একানে ছোট ছোট ঘোড়া মানত করার রেওয়াজ বাঁকুড়ায় ছিল এবং আজও আছে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে আছে, আছে আদিবাসী জনসমাজে। গ্রামথানে, মন্দির অভ্যন্তরে তাই রাশি রাশি একানে মাটির ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায়। হাতিও দেখতে পাওয়া যায়। তবে হাতির চেয়ে ঘোড়ার সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। বাঁকুড়ার রকমারি অশ্বশিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন পাঁচমুড়ার

ঘোড়া। পাঁচমুড়ার বড় গড়নের মাটির কালো রং হাতিও সুন্দর এবং সুমহান। পাঁচমুড়ার বা অন্যান্য অঞ্চলের মনসার চালিও অনবদ্য শিল্পনিদর্শন। মানুষসমান উঁচু কালো রঙের মনসার চালিও আমরা দেখেছি বাঁকুড়া শহরের রামপুরের একটি মনসা মন্দিরে। পাঁচমুড়ার মাটির শাঁখও বিচিত্র শিল্পসম্পদ। সামুদ্রিক শাঁখের মতোই এই মাটির শাঁখ ফুঁ দিলে চমৎকার বাজে।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের সঙ্গে বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের চরিত্রগত পার্থক্য আছে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ফটোগ্রাফির মতো অনুকৃত বস্তু বা প্রাণীর অবয়ব নকল করে—হুবহু নকল—মনে হবে জীবন্ত এবং সত্য। সত্যিকার এলাচদানার মতো মাটির এলাচদানা, গাছের ডাবের মতো সবুজ ডাব, ঘরের দেওয়ালের মাকড়সার মতো মাটির মাকড়সা। কিন্তু বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পে অবয়ব সংস্থানে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার অনুকরণ ঘটে না। এখানের হাতিঘোড়া, অ্যানাটমি নয়, শিল্পদৃষ্টির অভিনবত্বে অভিনব। ঘোড়ার দৃপ্ত শক্তি ও দুরন্ত গতিময়তা পাঁচমুড়ার ঘোড়ার মৌল শিল্পপ্রাণ। তাই তার গ্রীবা উচ্চকিত, উচ্চ এবং সরল দীর্ঘায়িত, তার পদ চতুষ্টয় সোজা এবং মাটির সঙ্গে দৃঢ়লগ্ন। তার লেজ ক্ষুদ্র, কর্ণদ্বয় উৎকর্ণ। লাল ও কালো রঙের এই অশ্বশিল্প বাঁকুড়ার আদিম অশ্বশিল্পের সঙ্গেও অবয়ব নির্মাণে পৃথকধর্মী। ছোট ছোট পাঁচ পয়সা দশ পয়সা দামের ছোট ছোট ঘোড়া আর পাঁচ টাকা দশ টাকা পনের টাকা দামের বড় বড় ঘোড়ার পার্থক্য তাঁরাই বুঝবেন যাঁরা উভয় রীতির ঘোড়া ভালো করে দেখেছেন। সোনামুখীর ঘোড়া গড়নে স্থূল ও ভারি। রাজগ্রামের ঘোড়া সুন্দর স্বাস্থ্যবান অলংকৃত। স্যান্দরার ঘোড়া 'স্লিম' অর্থাৎ একহারা এবং সুঅলংকৃত। মুরলুর ঘোড়া স্থির শান্ত এবং জিরাফের মতো গলায়, মোটা লেজে, পদসর্বস্ব অবয়বে অনেকখানি আদিমতার অধিকারী। বিগত ৫/৬ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে সারা বাঁকুড়া জুড়ে মৃৎশিল্পীরা পাঁচমুড়ার ঘোড়ার অনুকরণে লাল ও কালো রঙের ঘোড়া তৈরী করছেন এবং নানান কৃত্রিম রঙ তুলি দিয়ে ঘোড়ার গায়ে চিত্র বিচিত্র আলপনা ও ফুলকারি নক্শার কাজ এঁকে দিচ্ছেন। এইভাবে মাটির ঘোড়া লোকায়ত শিল্পের মৃত্তিকাধর্মী গ্রামমগ্নতা হারাচ্ছে। বাঁকুড়ার ঘোড়াও এখন শহুরে শিল্পের স্পর্শদুষ্ট হয়ে উঠছে।

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের এইসব চারুনিদর্শন ছাড়াও মাটির পাত্র, হাঁড়ি, কলসি, গেলাস, খুরি, জলনল, টালি, খোলা, ফুলদানি, টব প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যও তৈরী হয়। এর মধ্যে মুরলুর মাটির টালিও প্রশংসা অর্জন করেছে। মাটির বাইসন, ছাইদানীও চোখে পড়ার মতো। চারুশিল্প নিদর্শনের মধ্যে কোলে পুত কাঁখে পুত মাটির ষষ্ঠী ঠাকরুণও রূপে রঙে আনন্দ দেবার মতো। মাটির মঙ্গলঘট ও লক্ষ্মীঘট সুচিত্রিত শিল্পনিদর্শন হিসাবে বেলিয়াতোড় অঞ্চলে দেখা যায়।

বাঁকুড়ার পিতল ও কাংস্যশিল্পের নিদর্শনও প্রচুর। বাঁকুড়া শহরেই আছে দুটি সুবৃহৎ পিতলের রথ। নড়রা, অযোধ্যা, হদলনারায়ণপুরের পিতলের রথও দেখার

মতো। এইসব পিতলের রথ কোন্ শিল্পীরা নির্মাণ করেছেন ? অপরূপ কারুকার্যময় এইসব সুন্দর রথগুলি বাঁকুড়ার পিত্তলশিল্পের অতুলনীয় অতীত নিদর্শন বহন করছে। পঞ্চরত্ন নবরত্ন মন্দিরের মতো এইসব রথের গায়েও পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্রাবলী খোদিত হয়েছে। চিত্রাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনায় দেখার যোগ্য। মন্দির টেরাকোটা চিত্রাবলীর সঙ্গে রথের চিত্রাবলীর বিষয়গত ও বিন্যাসগত মিল আছে। তবে মন্দির চিত্র 'বা-রিলিফে' তৈরী, কিন্তু রথচিত্র সমতলিকও।

রথ শিল্পের পরেই স্মরণীয় ঢোকরা শিল্প। ঢোকরা শিল্পীরাও যাযাবর। বাঁকুড়া শহরের সন্নিকটে বিগ্না গ্রামে ঢোকরা শিল্পীদের একটা পাড়া আছে। সরকারী অর্থব্যয়ে এঁদের জন্য গ্রামের একপ্রান্তে বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। সরকার থেকে এঁদের পিতল ধাতু দেবার ব্যবস্থাও আছে। তাঁদের হাতে গড়া শিল্পবস্তু যাতে বিক্রী হয় তার জন্যও সরকারী স্মল ইন্ডাস্ট্রি বা কটেজ ইনডাস্ট্রি সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। ভারত বা বঙ্গদেশীয় ঢোকরা শিল্পীদের সম্বন্ধে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ব-পণ্ডিত নির্মলকুমার বসু বলেছেন—

> "ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে পিতলের কাজ জানে এমন কিছু কামার আছে যারা নিঃসন্দেহে কোনো উপজাতি বংশোদ্ভূত; বাংলায় এদের বলা হয় ঢোকরা কামার, অন্যত্র এদের ডাকা হয় অন্য নামে। যেখানে যে নামেই এরা থাকুক না কেন, এককালে যে এরা যাযাবরের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াত, কোনো একটি জায়গায় স্থিতিশীল হয়ে থাকত না তার অকাট্য প্রমাণ আছে। ঘুরতে ঘুরতে ঢোকরা কামার কোনো গ্রামের উপান্তে এসে ঘর বেঁধে থাকতো বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করে আনত ভাঙা ফুটো পেতলের বাসন, তারপর মোমে মাটিতে ছাঁচ গড়ে বানাত চাল মাপা কুনকে, খেলনা, টাকা জমাবার বাক্স এবং আরো কত কি। গরম ও তরল পেতল ছাঁচে ঢালতেই মোম যেত গলে, বেরোত ঢোকরার কাজ করা এই সব সামগ্রী। কিন্তু হিন্দু সমাজের কাংস্যকারদের তুলনায় ঢোকরা কামারদের জাতি কয়েক ধাপ নীচু। ঢোকরা কামারদের মধ্যেও আবার দুটি ভাগ আছে—তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে সাদী হয় না। একদল ছাঁচ বানায় মৌচাকের মোম দিয়ে, অপর দল শাল গাছের রজন দিয়ে। মোমগলা ঢোকরার কাজ বেশ হাল্কা ও সূক্ষ্ম হতে পারে, তুলনায় রজনগলা ঢোকরার কাজ একটু ভারী গোছের। উপাদানের তারতম্য থেকে ঢোকরা কামারদের যে দুটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ঘটলেও এক গোষ্ঠী নিজেকে অপর গোষ্ঠীর তুলনায় উঁচু জাতের বলে মনে করে। সহজেই বুঝতে পারি দুটি গোষ্ঠীই উপজাতিভুক্ত। পিতল ঢালাইয়ের কাজে এরা নিজ নিজ পদ্ধতি এখনো আঁকড়ে ধরে আছে—যদিও উভয়েই এখন উপজাতি পরিচয় হারিয়ে হিন্দু সমাজে ঢোকরা কামার নামে পরিচিত।" (পৃ ৪৬, ভারতের উপজাতি জীবন)।

বাঁকুড়ার (বিগনার) ঢোকরা শিল্পীরা শাল আঠা ব্যবহার করেন শিল্পদ্রব্যের ছাঁচ হিসাবে। তাঁরা পিতলের হাতি ঘোড়া, নানা পশু পাখী, বহুবিধ মানব পুতুল, লক্ষ্মী, রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিমুখ, কলমদান, হারের লকেট, পেপার ওয়েট, চাল ও চিঁড়ে মাপার কুনকে, জালি মাছ, সিংহাসন প্রভৃতি তৈরী করেন। শাল আঠার মূর্তি গড়ে তার উপর আবরণ (তুঁস মাটি মাখিয়ে তৈরী কাদামাটি) দিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। পিতল ধাতুর টুকরো এঁরা গলিয়ে নেন কাঠকয়লার আগুন করে নিজস্ব পদ্ধতিতে। ঐ মাটির আবরণে রাখা ছিদ্র দিয়ে তরল ও গরম ধাতু ঢেলে দেওয়া হয়। গরম লেগে ভিতরের শাল আঠা গলে গলে অন্য ছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর ঠাণ্ডা হলে কয়েকদিন পরে মাটির আবরণটা ভেঙে দিলেই কাঙ্ক্ষিত পিতল মূর্তিটি সঠিক রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ঢোকরা শিল্পকর্ম অনেকটা খসখসে, চাকচিক্যহীন। এই অমসৃণতাই এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য। লোকসংস্কৃতি পণ্ডিত বিনয় ঘোষ বাঁকুড়ার লক্ষ্মীসাগর (খাতড়া থানা) গ্রামের ঢোকরা শিল্পীদের কথাও বলেছেন। যাই হোক, ঢোকরা শিল্পী হিসাবে, বিগনার শিল্পীদের কাজ বেশ মনোহর ও পুরস্কৃত হবার যোগ্য এবং পুরস্কৃতও হয়েছে।

পিতল কাঁসার পারিবারিক ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরীর ক্ষেত্রস্থান হিসাবে বাঁকুড়া শহর, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, পাত্রসায়ের, কেঞ্জাকুড়া, অযোধ্যা, মদনমোহনপুর, লক্ষ্মীসাগর প্রভৃতি বিখ্যাত। থালা, বাটি, গেলাস, গাড়ু, কলসী, বদনা, প্রদীপ, পিলসুজ, গামলা, জামবাটি, দেবদেবী মূর্তি প্রভৃতি তৈরী হয় এইসব জায়গায়।

পাথরের জৈন তীর্থংকর বা জৈন দেবদেবী মূর্তি বাঁকুড়ায় আজও অজস্র। এগুলি সবই প্রত্ননিদর্শন। কিন্তু এগুলি শুধুই প্রত্নবস্তু নয়, অপূর্ব শিল্পসুন্দর প্রস্তর-মূর্তি রূপেও দর্শনীয়। ছোট বড়, ভগ্ন অভগ্ন, মসৃণ, সুমহান নানা ধরণ ও গড়নের জৈন মূর্তিগুলি কোথাও প্রাচীন মন্দিরগাত্রে প্রোথিত, কোথাও বা মন্দির অভ্যন্তরে সযত্নরক্ষিত, কোথাও নদীবালুকায় শায়িত, অথবা মন্দিরপ্রাঙ্গণে, বনপ্রান্তে পথপ্রান্তে, অরণ্যগভীরে অবহেলিত ভাবে পড়ে আছে। ধরাপাটের দেউলগাত্রে, এক্তেশ্বরের সামান্য ঘরের মধ্যে, বহুল্যাড়া ও নারিচায় মন্দির গর্ভগৃহে, দেউলভিড়্যার (বাঁকুড়া জেলায় তিনটি দেউলভিড়্যা—তালডাংরা, ছাতনা, ইঁদপুর থানার অন্তর্গত) অরণ্যে, অম্বিকানগরের মন্দিরে ও প্রান্তরে, বিহারীনাথ পর্বত অঞ্চলে, হাড়মাসড়ার পুকুরঘাটে, পোরকুলের কংসাবতী নদীগর্ভে, বিষ্ণুপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংরক্ষণশালায় এই ধরণের জৈনমূর্তি আমরা দেখেছি। এ ছাড়াও দেখা যায় বিষ্ণু-মূর্তি, সূর্যমূর্তি, নটরাজ ও শিবমূর্তি, যুগল রাধাকৃষ্ণ মূর্তি বা নিঃসঙ্গ কৃষ্ণমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি, অম্বিকা চণ্ডী, বাশুলী, ধর্মরাজ মূর্তি, দুর্গা বা গণেশ মূর্তি, কুবের বা বরাহ মূর্তি বা যক্ষ-যক্ষিণীমূর্তি। বাঁকুড়া তথা রাঢ় অঞ্চল প্রধানতঃ মাকড়া বা ল্যাটারাইট পাথরের দেশ। মাকড়া পাথরে মূর্তি ভালো হয় না। তথাপি মন্দিরগাত্রে

টেরাকোটা শিল্পের মতো মাকড়া পাথরের নানা মূর্তি ও ফুলকারি নকশা নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে বিষ্ণুপুরের রাধাশ্যাম ও মদনগোপাল মন্দিরে, ভিহরের শিবমন্দির দুটিতে, মুনিনগর, সাত্রাকোণ, গোকুলনগর, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগাত্রে, রেখদেউল গাত্রে। পূর্বে উল্লিখিত বৃহৎ জৈনমূর্তি বা দেবদেবীর মূর্তিগুলি কিন্তু মাকড়া পাথরের নয়, প্রধানতঃ কষ্টিপাথরের বা বেলেপাথরের। অন্যদিকে ইঁটের মন্দিরের গায়ে যেমন পাথরের অলংকরণ আছে তেমনি পাথরের মন্দিরের উপর পোড়া-মাটির অলংকরণের বিচিত্র নিদর্শনও বাঁকুড়ায় পাওয়া যায়। এইসব মূর্তি ও মন্দিরের শিল্পীরা যে সকলেই বাঁকুড়াবাসী ছিলেন তা বলা যায় না। বৃহৎবঙ্গ বা বঙ্গদেশের বাইরে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান থেকেও অতীত কালে এইসব মূর্তি আনা হতে পারে। তৎসত্ত্বেও বাঁকুড়ার প্রস্তরশিল্পের ঐতিহ্যধারা অনুধাবন করতে এগুলিও যে স্মরণীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে স্থানীয় পাথর থেকে নানা ছোটবড় দেবদেবীর মূর্তি, হাতি ও ঘোড়া, ধূপদানী, খল নুড়ি, গেলাস থালা বাটি ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। এগুলি প্রধানতঃ খড়িপাথরে তৈরী।

বাঁকুড়ার দারুশিল্পের প্রাচীন নিদর্শন মন্দিরদ্বারে, সদরঘরে, অন্তর্বাটিতে, আট চালা মণ্ডপ বা চণ্ডীমণ্ডপে, কাঠের রথে, দেবদেবী মূর্তিতে খুঁজে পাওয়া যাবে। অরণ্যসমাকুল 'জঙ্গলমহল'-এর দেশ বাঁকুড়ায় তক্ষণশিল্পের নিঃসঙ্গ কোন উন্নতি হয়েছিল কিনা আজ আর সঠিক বলা যায় না। বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা জেলার বিখ্যাত আটপুর, শ্রীপুর, রামগড়, উলা-বীরনগর, মহেশপুর প্রভৃতি গ্রামের আটচালা চণ্ডীমণ্ডপের সমান্তরাল কারুকৃতি হয়তো বাঁকুড়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু স্মরণে আসে, বিহারজুড়ী (গঙ্গাজলঘাটি থানা) গ্রামের চারটি চণ্ডীমণ্ডপে আটচালার কাঠের কারুকলার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। ভেলাইডির (সিমলাপাল থানা) রাজবাড়ীর আটচালা শিলাবতী নদীর বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে, তবু কিছু দর্শনীয় নিদর্শন এখনো আছে। সাতমোল (তালডাংরা থানা), মাদারবনি (ওন্দা থানা) গ্রামের আটচালার কাঠের কাজও দর্শনীয়। বাঁকুড়ার পিতলের রথের কথা আগেই বলেছি। কাঠের রথের শিল্পকরণ ও মূর্তিময়তার দিক থেকে স্মরণীয় তিলুড়ী, ভড়া, বাঁকাদ, সাত্রাকোণ, মুড়াকাটি, পাঁচমুড়া, জয়পুর, মাধবপুর (ওন্দা), দেশড়া প্রভৃতি গ্রামের রথগুলি। পৌরাণিক ও লৌকিক বিষয়ক রথের পুতুল, ফুলকারির কাজ, কৌণিক ঝুলন্ত মূর্তিলতা প্রভৃতি দারুশিল্পের কৃতিত্বে বাঁকুড়া জেলা অন্য জেলা থেকে পিছিয়ে নেই। দেবদেবীর মূর্তি হিসাবে সারদা-রামকৃষ্ণের মূর্তি, অম্বিকা গৌর নিতাই রাধাকৃষ্ণ মূর্তিও বহুল-ভাবে আছে বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ায় হাতে লেখা পুঁথির প্রাচুর্য অনস্বীকার্য। অনেকগুলি পুঁথির পাটার সুচারু চিত্রিত নিদর্শন আছে বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখায়। বিষ্ণুপুর সঙ্গীত সাধনার জন্য ভারতবিখ্যাত। কাঠের বাদ্যযন্ত্র

শিল্পও এখানে এককালে বিশেষ উন্নতি করেছিল। এসব নিদর্শন ছাড়াও কাঠের পাল্কী, বৃষকাষ্ঠ, খাট পালঙ্ক, সিংহাসন প্রভৃতি বাঁকুড়াতেও তৈরী হত এবং আজও কিছু কিছু হয়। রাজগ্রাম বা বেলিয়াতোড়ের কাঠের পুতুলও দর্শনীয়। এ ছাড়াও চোখে পড়ে কাঠের পালি, মিষ্টির ছাঁচ, রান্নাশালের নানাবিধ কাঠের সরঞ্জাম, কাঠের থালা বাটি ইত্যাদি। নিম, পিয়াল, মুর্গা, মহুয়া, পলাশ, তেল কদম প্রভৃতি গাছের প্রাচুর্য বাঁকুড়া জেলার কাষ্ঠশিল্পের চিরন্তন সহায়ক। সুঅলংকৃত কাঠের ছোটবড় ঘোড়া তৈরী করে বাঁকুড়া বর্তমানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। সম্পূর্ণ লোকায়ত শিল্পের ধারা না মানলেও কাষ্ঠশিল্পের আধুনিক নিদর্শন হিসাবে এইসব কাঠের ঘোড়াকে নিশ্চয়ই স্মরণ করতে হবে। বাঁকুড়া শহরের রামপুর নামক পাড়ায় কাঠের ঘোড়া তৈরী করছেন মনোযোগী শিল্পীরা, ওখানে যে কোন সময়ে গেলেই দেখা যাবে সেই আনন্দজনক দৃশ্য।

পূর্বে আমরা পিতল শিল্পের কথা বলেছি। ধাতুশিল্পের আর একটি দিক হচ্ছে লৌহশিল্প। এ বিষয়েও বাঁকুড়ার ঐতিহ্য সুবিদিত। মাকড়া পাথর থেকে লৌহ নিষ্কাশনের পদ্ধতি জানতেন বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের 'লোহার' শিল্পীরা। তাঁরাই অতীতে কামান নির্মাণ কৌশলও আয়ত্ত করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কামান 'দলমাদল' তাঁদেরই শিল্পকৃতির সার্থক নিদর্শন। দলমাদল ছাড়াও বাঁকুড়ার শিল্পীরা নির্মাণ করেছিলেন গোরক, ঝুলঝাড়া, চড়কবিজলী, বাঘামুয়া প্রভৃতি কামান। বাঁকুড়া বিষয়ক পণ্ডিত শ্রীমানিকলাল সিংহ লিখেছেন—"মল্লরাজা বীর হাম্বীর কামান তৈয়ারী করাইবার জন্য বর্তমান জোড়বাংলা মন্দিরের পূর্বে পরিখা এবং মূর্চা দ্বারা পরিবেষ্টিত এক সুরক্ষিত অঞ্চলে কামান ঢালার ব্যবস্থা করান।" (পৃ ১৬৪, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি)। বিষ্ণুপুরের লোহার শিল্পীরা এককালে অসি ও বর্ম তৈরীতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মল্লরাজাদের কাল কেটে গেছে, মল্লরাজত্বের যুদ্ধবাজ সৈনিকগোষ্ঠীও লুপ্ত হয়ে গেছে। কামান, অসি, বর্ম, বল্লম তৈরীর হাত আজ মাছধরা বঁড়শি, জালের কাঠি, কুড়ুল, কাস্তে, দা, বঁটি তৈরী করায় নিয়োজিত। বাঁকুড়ায় ধীবর জাতির প্রাচুর্যের কথা মনে রাখলে বোঝা যায় বঁড়শি ও জালের কাঠি নির্মাণের খ্যাতি আজও কেন বাঁকুড়া জেলা থেকে হারিয়ে যায়নি।

অন্যান্য বহু শিল্পের গরিমা বাঁকুড়া থেকে লুপ্ত হয়ে গেলেও বস্ত্রশিল্পের গরিমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই মনে হয়। মৃৎশিল্পের শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসাবে বাঁকুড়ার ঘোড়া যেমন দেশবিদেশ জয় করে ফিরছে তেমনি বস্ত্রশিল্পের সৌন্দর্য ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে চলেছে। অতীতের মতো আজও বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, রাজগ্রাম, কেঞ্জাকুড়া প্রভৃতি স্থান বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত। সুতিবস্ত্র, পাটের কাপড়, তসর, কেটে কাপড় তৈরীতে বাঁকুড়ার শিল্পীরা আজও সিদ্ধহস্ত। বিষ্ণুপুরী সিল্ক আজও কাশ্মীরি সিল্ক, বেনারসী বা মুর্শিদাবাদী সিল্কের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। বিষ্ণুপুরের বালুচরী

শাড়ীও বিখ্যাত। যদিও বিষ্ণুপুরী বালুচরী শাড়ীর ইতিহাস বেশি দিনের নয়। রাজগ্রামের নানাবিধ সুতিবস্ত্রের বৈচিত্র্য মনোমুগ্ধকর। মাদ্রাজী সুতি বস্ত্রের সঙ্গে কোন অংশে কম নয় রাজগ্রামের সুতিবস্ত্রের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। সুতাশিল্পের আর একটি ধারা মাছধরা জাল। ধীবর জাতির মানুষেরাই আদি যুগে বস্ত্র-শিল্পের উদ্ভাবক। বাঁকুড়ার প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদের মধ্যে ধীবররাও ছিলেন এবং তাঁরা আজও লক্ষণীয় সংখ্যায় জেলার প্রায় সর্বত্র আছেন।

বাঁকুড়ায় লিপিশিল্পের একটি বিশেষ উন্নত ধারা ছিল। সেদিকে তেমন করে কারও দৃষ্টি পড়েনি। তক্ষণশিল্পের আলোচনাকালে আমরা বাঁকুড়ার পুঁথিপত্রের প্রাচুর্যের কথা বলেছি। এক বিষ্ণুপুর সংগ্রহশালাতেই প্রায় সাত হাজারের মতো পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। কোন কোন ব্যক্তির সংগ্রহেও অনেক পুঁথি আছে। তাছাড়া বাঁকুড়ার বহু প্রাচীন পরিবারে এখনও সংখ্যাতীত পুঁথি রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত। তবু বাঁকুড়া থেকে পাটাচিত্রণ শিল্পের মতো পুঁথিলিখন শিল্পও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

পুঁথি লেখা ও পুঁথির কাগজ তৈরী করার দক্ষ শিল্পী বাঁকুড়ায় বিশেষভাবে ছিল। আজও কোন কোন পুঁথির অক্ষরসৌষ্ঠব দেখে চমকিত হতে হয়। ধনী বা জমিদার বা রাজা বা পণ্ডিত পরিবারের আহ্বানে পুঁথিলেখকেরা পুঁথি লিখতে বসতেন, পুঁথি নকল করতেন। তুলোট কাগজ বা তালপাতা বা গাছের ছাল থেকে তৈরী মোটা লম্বা কাগজে তাঁরা শরের বা পাখির পালকের কলম দিয়ে লিখতেন। তাঁরা ঐসব পুঁথি পুনরায় নানা রং দিয়ে চিত্রে ও আলপনায় অলংকৃত করতেন। মল্লরাজ বীর হাম্বীরের সময় (রাজত্বকাল ঃ ১৫৮৭-১৬১৮ খৃঃ) যেসব পুঁথি ভুলক্রমে লুঠ হয়েছিল (বৃন্দাবন থেকে নবদ্বীপ যাচ্ছিল পুঁথিগুলি গাড়ী বোঝাই করে শ্রীনিবাস আচার্যের তত্ত্বাবধানে) সেগুলি ফেরৎ দেবার আগে সবই নকল করে নেওয়া হয় বাঁকুড়ার লিপিকরদের দিয়ে। বাঁকুড়ায় সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথি-লিখনের ঐতিহ্য না থাকলে তা সম্ভব হত না।

বাঁকুড়ায় সংস্কৃত ও বাংলা লিপিচর্চার আর একটি ধারা লক্ষ্য করা যায় মন্দির, মসজিদ, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চের নির্মাণলিপিতে। পর্বতগাত্রে বা পোড়ামাটির ইঁটেও লিপিচিত্রের ধারা লক্ষ্য করার মতো। পুষ্কর্ণা অধিপতি সিংহবর্মা-চন্দ্রবর্মার যে প্রস্তর-লিপি পাওয়া গেছে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে তার হরফ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের এবং ঐ প্রত্নলিপিটি ব্রাহ্মী হরফে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এটিই বাঁকুড়া জেলার প্রাচীনতম লিপি। বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত গ্রাম ছাতনার প্রাচীন বাশুলী মন্দিরের চারপাশে কয়েক বছর আগেও অসংখ্য ইঁট পড়ে থাকতে দেখা যেত যেগুলিতে নানা উক্তি খোদাই করা ছিল। এবার মন্দিরগাত্রের দিকে তাকালেও লিপি খোদাইয়ের প্রাচুর্যে বিস্মিত হতে হয়। বিষ্ণুপুরের লালজী, শ্যামরায়, জোড়বাংলা, মুরলীমোহন প্রভৃতি মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি, ধরাপাটের ন্যাংটা শ্যামচাঁদ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি,

সাল্লাকোণের রামকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি প্রভৃতি সহস্র সহস্র ছোটবড় মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি প্রমাণ করে যে লিপিশিল্পীদের সিদ্ধহস্ত বাঁকুড়া জেলাতেও লিপি-বৈচিত্র্যের অমূল্য ইতিহাস রচনা করে গেছে। দুঃখের বিষয় এই লিপিকররা কালের অমোঘ নিয়মে বাঁকুড়া থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে কারণ তাঁদের প্রয়োজন কালের নিয়মেই ফুরিয়ে গেছে।

পুঁথি ও পাটাচিত্রণ, পুঁথিলিপি ও প্রস্তরলিপির কথা প্রসঙ্গে বাঁকুড়া জেলার পটোরিদের কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায়, বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস ও নক্সা তাসের কথা।* বাঁকুড়া জেলায় গান গেয়ে পটুয়ারা এখনো পট দেখিয়ে বেড়ান, যদিও তাঁদের গান ও পটের চাহিদা আজ অনেক কমে গেছে।**

বেলিয়াতোড়ে মহাশিল্পী যামিনী রায়ের পৈত্রিক বাড়ীর অদূরে আজও পটোরি পাড়া আছে। তাঁদের যমপট, কিন্টপট, জগন্নাথ পট, কালীপট, চক্ষুদানপট আজও দর্শনযোগ্য। দেশি ও মৃত্তিকাজাত রঙে দেশি পদ্ধতিতে পটচিত্রণ শিল্প যে বীরভূম মেদিনীপুরের মতো বাঁকুড়াতেও স্মরণীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ আজও বিদ্যমান গুরুসদয় মিউজিয়ামে বা যামিনী রায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ যা তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ীতে আছে।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে মল্লরাজারা মধ্যযুগে মোঘল তাসের অনুসরণে এক ধরণের তাস খেলার প্রচলন করেন। দু'ধরণের তাস ও তাসের খেলা প্রচলিত ছিল। প্রথম শ্রেণীর তাস দশাবতার তাস—১২০টি তাসের খেলা। দ্বিতীয় শ্রেণীর তাস নক্সা তাস—৪৮টি তাসের খেলা। ৪×৪½ ইঞ্চি ব্যাসের এই গোল তাসগুলি তৈরী হয় তেঁতুল-বিচির কাই দিয়ে এবং তাসগুলি বিচিত্র রঙে ও রেখায় চিত্রিত হয়। এই তাসচিত্রণ শিল্প পটচিত্রণ শিল্পের ধারায় পড়ে। দশাবতার তাসের রাজা ও উজীর তাসের চিত্রগুলি এবং নক্সা তাসের পরী বা পালোয়ান চিত্রগুলি বাঁকুড়ার পটচিত্রণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইদানীং বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে দশাবতার বা নক্সা তাসের খেলা প্রচলিত নেই, কিন্তু দু'একজন শিল্পী প্রত্ননিদর্শন হিসাবে এই তাসগুচ্ছ আজও নির্মাণ ও অঙ্কন করে চলেছেন চাহিদা অনুযায়ী। এগুলি এখন গ্রামীণ লোকায়ত চারুকলার নিদর্শন হিসাবে সমাদৃত হচ্ছে।***

বাংলার মালাকারদের হাতের শোলার কাজ অর্থাৎ ডাকের কাজ চিরপ্রশংসিত শিল্প-সৌন্দর্য। ফুলের মালা গাঁথার কাজেও তাঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নায়ক সুন্দর হীরামালিনীর হাত দিয়ে যে পুষ্পমাল্য পাঠিয়েছিলেন রাজকুমারী বিদ্যার কাছে তার গ্রন্থনচাতুর্য ছিল অসাধারণ। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে মালাকারদের শিল্প ঐতিহ্য সৃষ্টির সুযোগ হয় মল্লরাজাদের পৃষ্ঠ-

---

* এ বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা' গ্রন্থে।

** ঐ একই গ্রন্থে পট ও পটোরিদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা আছে।

*** এ বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা আছে মৎপ্রণীত 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা' (১৯৮১) নামক গ্রন্থে।

পোষকতায়। বিষ্ণুপুরে আজও বহু শঙ্খশিল্পী বাস করেন। তাঁরা অতীত কালের মতো আজও নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টির দ্বারা নতুন ইতিহাস রচনা করে চলেছেন। শাঁখের আংটি, বালা, কর্ণাভরণ, কণ্ঠাভরণ, কবরী আভরণ ছাড়াও বড় বড় গোটা শাঁখের উপর দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী প্রভৃতি দেবদেবী, সুভাষচন্দ্র, লেনিন, গান্ধীজী প্রভৃতি মহামানবদের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। বিষ্ণুপুর ছাড়া বাঁকুড়ার অন্য অঞ্চলেও শঙ্খশিল্পীরা অর্থসংকটের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে আজও পিতৃপিতামহের পারিবারিক বৃত্তি অনুসরণ করে চলেছেন। শাঁখারীদের মতো চুনারুরাও বাঁকুড়া জেলায় আছেন। তাঁরা শামুক, ঝিনুক, গুগলি পুড়িয়ে চুন তৈরী করেন। তাঁদের পূর্বপুরুষেরা মন্দির বা রাজগৃহে পঙ্খের কাজ করতেন। সেই বিগত শিল্পনিদর্শন আজও বাঁকুড়ার নানা স্থানে বিদ্যমান আছে—যদিও কালের ক্ষয়কারী হস্তাবলেপ সেসব কাজের সৌন্দর্য বহুলাংশে ম্লান করে দিয়েছে।

ভাদু ও তুষু মূর্তি যেমন ভাদ্র ও পৌষ মাসে সারা বাঁকুড়া জেলাতেই তৈরী হয়, তেমনি তৈরী হয় 'চৌদল'। বাঁকুড়ার মন্দিরস্থাপত্যের অনুকরণ এগুলি। পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন মন্দিরের আদলে রঙীন কাগজ, বাখারি দিয়ে এগুলি তৈরী করেন স্থানীয় শিল্পীরা। এইসব চৌদলের মধ্যে ভাদু বা তুষু মূর্তি বসিয়ে গান গাইতে গাইতে নদী বা বাঁধ দীঘি পুকুরের জলে ভাসান দিতে নিয়ে যাওয়া হয়।**

বাঁকুড়ার লোকায়ত চারুকলার আর একটি বড় দিক গ্রামীণ ফ্রেস্কো অর্থাৎ গ্রামীণ দেওয়াল চিত্রণ। সারা বাঁকুড়ার মাটির রঙ সাধারণতঃ লাল। কোথাও কোথাও সামান্য অংশে হলেও স্বচ্ছ সাদা। সাঁওতাল বা আদিবাসী জনসংখ্যা বাঁকুড়ায় কম নয়। এঁদের মেয়ে ও পুরুষেরা নিজ নিজ মাটির বাসগৃহের বাহির ও ভিতরের দেওয়াল পরিচ্ছন্ন ও সমতল করে তোলে সাদা মাটির প্রলেপ দিয়ে। তারপর তার উপরে দেশি বা মৃত্তিকাজাত রং দিয়ে নানা আলপনা নক্সা মূর্তি ইত্যাদি আঁকে। এই দেওয়াল চিত্রণের বিষয় ও বর্ণাঙ্কনগত সরলতা দৃষ্টিনন্দন ব্যাপার।

এইসব দেওয়াল চিত্রণ যে সমাজে হয় সেই সমাজের মানুষ নারী পুরুষ নির্বিশেষে দেহ-চিত্রণ করে। অর্থাৎ উল্কি আঁকে। উল্কি বা চিতাকাটা দেহচিত্রকরণেরই রকমফের। আদিবাসী নারী ও পুরুষেরাই শুধু নয়—বর্ণহিন্দু মুসলমান খৃষ্টানদের মধ্যেও দেহে কমবেশি উল্কি এঁকে নেওয়ার আগ্রহ দেখা যায়। বিশেষ গাছের আঠার সঙ্গে স্তনদুগ্ধ মিশিয়ে নিয়ে উল্কি আঁকার রঙ বানানো হত। সূঁচ ফুটিয়ে দেহের কোন অংশে চিত্র করে ঐ রঙ দিয়ে উল্কি তোলার নিয়ম ছিল। আজও আছে। তবে আজকাল যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলন বেশি হচ্ছে। উল্কিতে জ্যামিতিক অলংকরণ ছাড়াও ফুল পাতা পশু পাখির ছবি, মানুষ বা দেবতার মুখের ছবি আঁকা হয়।

** দ্রঃ 'টুসুব্রত কেন্দ্রিক চারুকলা' প্রবন্ধ (পৃ. ৯৪, টুসু : ইতিহাসে ও সঙ্গীতে, পম্পা, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, ১৯৮২)

উল্কিতে ব্যবহৃত রঙের মধ্যে নীল বা ধূসর রঙেরই প্রাধান্য, কখনো কখনো কালো রঙ।

মেয়েলি বারব্রত উপলক্ষে দুয়ারে, ঘরের মেঝেয় বা উঠোনে আলপনা দেওয়ার রেওয়াজ আজও বাঁকুড়ায় আছে। এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সারা বাংলার লোকচিত্রণের ইতিহাসে এই ব্রত আলিম্পনের গুরুত্ব যতখানি বাঁকুড়ার লোকচিত্রণের ইতিহাসে ব্রত আলিম্পনের গুরুত্বও ততখানি। বাঁকুড়ার তুষুব্রত, লক্ষ্মীব্রত, শিয়াল শকুনি ব্রত, পুণ্যিপুকুর, সেঁজুতি ব্রত প্রভৃতি উপলক্ষে আলপনা দেওয়ার প্রবণতা ও নিয়মে সমতলভিত্তিক গ্রামীণ চিত্রকর্মের আনন্দ মেয়েরা আজও উপভোগ করে। নদীজীবন ও গ্রামজীবনের দৃশ্য, চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র, ফুল পাতা পাখি প্রাণী, বিশেষ করে পদ্ম বা মাছ বা পঁ্যাচা, আর তারই পাশাপাশি কামনা নিবেদন করা হচ্ছে যাঁর কাছে সেই দেবদেবীর মুখ, মূর্তি বা পায়ের ছাপ আলপনা সহ দেখা যায়। এই ব্রত আলপনার অন্য রকম উদাহরণ—পিঁড়িচিত্রণের বহু উদাহরণ, ঘট বা কলসী চিত্রণের বহু উদাহরণও বাঁকুড়া থেকে পাওয়া যাবে।

মিষ্টান্ন শিল্প বাঁকুড়ার আর একটি স্মরণীয় ঐতিহ্য। বাঁকুড়ার বহু লোক-শিল্পের উদ্গাতা ও উৎসপ্রেরণা বৈষ্ণবধর্ম ও প্রাণের ঠাকুর রাধাকৃষ্ণ। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন শিল্প রাধাকৃষ্ণ সেবা ও বৈষ্ণবদের অন্নের প্রয়োজন মেটাতে উদ্ভূত হয়েছিল। বৈষ্ণবরা নিরামিষাশী, তাই তাঁদের জন্য ক্ষীর ছানা দধি দুগ্ধ থেকে মিষ্টান্ন পর্যন্ত নানা আহারের বন্দোবস্ত। রাধাকৃষ্ণের ভোগসেবার প্রয়োজনে বৈষ্ণব মল্লরাজাদের আহ্বানে মধ্যযুগে বিষ্ণুপুরে এসে বাসা বেঁধেছিলেন বহু কারিগর। আবার বিষ্ণুপুর থেকে মদনমোহন মূর্তি যখন কলকাতা-বাগবাজারে স্থানান্তরিত ও হস্তান্তরিত হল তখন বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন শিল্পীরা বাগবাজারে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। বাংলা মিষ্টান্ন শিল্পের ইতিহাসে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন কারিগরদের দান এইভাবেই বিষ্ণুপুর সংগীত ঘরাণার মতো অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। 'গান বাজনা মতিচুর / তবে জানবি বিষ্ণুপুর'—এই প্রবাদবাক্য আজও মিথ্যা হয়ে যায়নি। শুধু বিষ্ণুপুর নয়, ছাতনা, অম্বিকানগর, রাইপুর, সোনামুখী, সিমলা-পাল, খাতড়া অঞ্চলের অধিবাসী মোদকদের মিষ্টান্ন শিল্পের খ্যাতি বাঁকুড়া জেলার মিষ্টান্ন শিল্পের উৎকর্ষের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। উড়িষ্যা থেকে আগত বর্ণ-হিন্দুদের গৃহিণীরা পিঠা পায়স প্রস্তুতিতেও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। বাঁকুড়ার 'কাকড়া' পিঠার আস্বাদ যিনি একবার গ্রহণ করেছেন তিনি জীবনে তা ভুলতে পারবেন না।

বিষ্ণুপুরের তামাক শিল্প মিষ্টান্ন শিল্পের মতোই খ্যাতি অর্জন করেছিল। বিষ্ণুপুরের সুগন্ধি 'ভুরা' তামাক এখনও ধূমপায়ীদের আমোদিত করে। তবে এই শিল্প এখন বিলুপ্তির মুখে। এরই সঙ্গে স্মরণীয় বাঁকুড়ার বিড়ি শিল্প ও জর্দা শিল্প এবং গুড়াকু শিল্প। এইসব শিল্পে এখন আধুনিকীকরণ ঘটেছে।

ঘুনি, খালুই, পোলো, চাঙারি, কুলো, ডালা, চুবড়ি, ধুচুনি, ধামা, ঝুড়ি প্রভৃতি বাঁশ-বেতের কাজও বাঁকুড়ায় বিশেষ গ্রামীণ শিল্পকর্মের নিদর্শন। তার সঙ্গে দড়ি, শিকা, কড়ির চুবড়ি প্রভৃতির কথা মনে রাখতে হবে। বাঁশ বা কাঠের ফ্রেমে দড়ির কারিগরী করে খাটিয়া তৈরীতে আদিবাসী ও তফসিলী সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ পারঙ্গম। দোচালা, চারচালা, আটচালা খড়ের ঘর—তার ছাউনি, বাঁশ বা তার কাঠামো প্রভৃতিও লোকশিল্পের ধারার অন্তর্গত। এইসব খড়ের চাল নির্মাণের স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করেই এককালে বাঁকুড়া জেলা জুড়ে বাংলা রীতির জোড়বাংলা মন্দির, চারচালা মন্দির, আটচালা মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ও সভ্য সামাজিক জ্ঞানে আমরা জানি যে বাঁকুড়া খরাপীড়িত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশ। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনার বাস্তব রূপ ও স্বরূপ যদি কেউ সাগ্রহে দেখতে আসেন, তাহলে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন সহজে যে, এ দেশ ঐশ্বর্যময়ী। এখানের প্রায় সব মানুষ কোন না কোন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এখানের প্রায় সব মানুষই শিল্পী। শিল্পসৌন্দর্য ও কারিগরী বিদ্যার মেলবন্ধনের ইতিহাস এখানে দূর ও প্রাক্‌-ইতিহাসকাল পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায়। বহমান কাল, অতীত কাল, আদি মানব সভ্যতার সূচনা কাল—সব সময়েই এই 'বৃদ্ধভূমি' বাঁকুড়া শিল্প-সমৃদ্ধ। শুশুনিয়া বা ডিহর বা বনবিষ্ণুপুর বা ছাতনা পরিমণ্ডল থেকে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু প্রমাণ করে ঐ সত্য। কুঠার, মাল্যদানা, ভগ্ন মৃৎ পাত্রের যুগে বাঁকুড়ার আদিম মানুষ যে শিল্পধারা সৃষ্টি করেছিল তার সঙ্গে হয়তো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে আধুনিক লোকশিল্পধারার, কিন্তু মানসিকতাটা বোধ হয় কোথাও বা এক রয়ে গেছে। আজও তাই বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া, বোঙা হাতি আদিম abstract মূর্তিময়তায় লগ্ন। বালুচরী শাড়ীর আঁচলে অথবা পটেরিদের পট আঙ্গিকেও সেই একই অনুকৃতি, একই আদিম লোকশিল্পকলার অভ্যাস মূর্ত হয়ে ওঠে। বাঁকুড়ার চারুশিল্পকলা বাস্তব অনুকরণ নয়, মূলতঃ ইম্‌প্রেশান্‌। আধুনিকতার হাত ধরে চলতে চলতেও সেই রূপসত্তা বিসর্জিত হয়নি॥

বাঁকুড়া হিতৈষী। ১৩৯০

বাঁকুড়ার চারু মৃৎশিল্পকলা*

দেখতে জানলে কত কি দেখা যায়। কত নয়নমনোহর শিল্প-বস্তু। তার জন্য নন্দনতত্ত্বে তালিম নিতে হয় না। গোলাপের দিক চেয়ে বললুম সুন্দর, সুন্দর হল সে। এ রকম নয়। কত যুগ ধরে, কত নিত্য সাধারণ অথচ ধারাবাহিক শিল্প-মানসিকতা এগুলির সঙ্গে সংযুক্ত। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। তৈরী হয়েছে নিত্য ব্যবহারের জন্য। অথবা তৈরী হয়েছে পুজো পার্বণের প্রয়োজনে। অনেক দিন ধরে গড়তে গড়তে একটি বিশেষ গড়নে এসে দাঁড়িয়েছে। তখন মনে হয়েছে—চমৎকার! আজও চলছে সেই চমৎকারিত্বের পুনরাবৃত্তি। এদের মধ্যে ধরা পড়েছে একটি বিশেষ অঞ্চলের মৃত্তিকালগ্ন জনগোষ্ঠীর চারু শিল্পবোধ। শিল্প-সংস্কৃতি হচ্ছে উদ্বৃত্ত প্রাণের লালন। বাঁকুড়ার মানুষ বড় অভাবী। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বাসস্থান নাই। তবু তাদের প্রাণরসধারা শুকিয়ে যায়নি, আজও হারিয়ে যায়নি শিল্প সুকৃতির প্রতি ভালোবাসা। নিভৃত নিষ্ঠায় উদ্বৃত্ত প্রাণের লালন তারা আজও করে চলেছে।

আমার এক চিত্রশিল্পী বন্ধু তপন কর যেখানেই গেছে, নানা ধরণের ছোট ছোট মাটির ঘট ও ভাঁড় সংগ্রহ করে এনেছে। সুবিখ্যাত সুভো ঠাকুরের কালির দোয়াত সংগ্রহের মতো, নকশি কাঁথা সংগ্রহের মতো। অথবা পবিত্র সরকারের দেশলাই বাক্স সংগ্রহের মতো। ঐসব ফালতু ঘট হয়তো 'গ্রীসিয়ান আর্ণ' নয়, কিন্তু ওদের কোন একটাকে নিয়েও বিখ্যাত কবিতা লেখা যায়।

বাঁকুড়ার মাটির ভাঁড় বা ঘট ঠিক খুরি নয়, কলসীও নয়, তার মাঝামাঝি। মাটির ভাঁড়ের কত রকম গড়ন। কোনটার কানা মোড়া, কোনটা তির্যক, কোনটা বা ন্যাড়া। কোনটার পেট গোলাকার এবং ফুলো। কোনটাতে ত্রিভুজের একটি কোণের মতো তীক্ষ্ন বাহারী খাঁজ। ঠিকমতো বসিয়ে রাখার জন্য তলায় গোল খুরো। সেও কত রকমের। কোন ভাঁড়ের গায়ে কাঁচা অবস্থায়, কাঠি দিয়ে টেনে টেনে রেখা আঁকা হয়েছে। তাতেই একটা রূপ ফুটে উঠেছে। কোনটাতে রেখা টেনে সযত্ন নক্সা বা ফুলকারি কাজ। আর ভাঁড় বা ঘটের গায়ে, উপর ভাগে, এক ধরণের ধূসর সাদা প্রলেপ ফোটানো হয়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের যুগে, মাটির ভাতের হাঁড়ি, মাঝারি তিজেল হাঁড়ি, জলের কুঁজো বা পাত্র প্রভৃতি তো লুপ্ত হতে বসেছে। তবু গরীব দেশ বাঁকুড়ায় আজও কুমারের ঘোরানো চাকে কাদার তালে সামান্য আঙুলের টিপনি

* এই বিষয়ে আরও একটি সৌন্দর্যমুগ্ধ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৪ সালের ২৫ নভেম্বর 'দৈনিক আজকাল' পত্রিকার 'রবিবাসর' পৃষ্ঠায়।

দিয়ে কত রকম গড়ন তৈরী হচ্ছে। কোন কোন ভাঁড় বিচিত্র রঙে চিত্রিত। শুধু 'পণে' পোড়ানো পাকা রঙ নয়। কাঁচা রঙ। হস্তেল, এলা, মেটে সিঁদুরের রঙ। তার পাশে লাল, হলুদ, সবুজ। বেলেতোড়ের বাজারে এমন বহুবর্ণরঞ্জিত চিত্রিত ভাঁড় অনেকবার দেখেছি। বিষ্ণুপুরের পোকা বাঁধের ধারে চকবাজারে মাঝারি সাইজের লম্বা ঘট, ধুসর ঘট বিক্রী করতে বসে গ্রামের কুমোরেরা।

তারপরেই চোখে পড়ার মতো—মৃৎশিল্প বস্তু—লক্ষীভাঁড়। বাংলার সর্বত্র আছে লক্ষীভাঁড়। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের যুগেও। গড়নের বৈচিত্র্যে, রঙের বৈচিত্র্যে বাঁকুড়ার লক্ষীভাঁড়ও অভিনব। কদর আছে সৌন্দর্যরসিকের কাছেও। বেলে রঙের সুন্দর সুন্দর লক্ষীভাঁড় দেখেছি সোনামুখীর হাটে। সারা গায়ে রকমারী 'কালার স্প্রে' করা বড় সাইজের তুম্বো লক্ষীভাঁড়ও ওখানের হাটে আসে।

আর পাঁচমুড়ায় গেলে পোড়ামাটির শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনগুলি দেখতে পাওয়া যায়। পাঁচমুড়া আজ বিশ্ববিখ্যাত। যেমন বিখ্যাত মুখোশের জন্য চড়িদা (পুরুলিয়া), তাঁতবস্ত্রের জন্য ধনেখালি (হুগলী), ঢোকরা শিল্পের জন্য বিগনা (বাঁকুড়া)। প্রথমেই মন কেড়ে নেয় মনসার চালি। 'চাল' বা 'চালচিত্র' থেকে চালি শব্দটি এসেছে। পাঁচমুড়ার ঘোড়ার পরেই শিল্পসৌন্দর্যের দিক থেকে, মনসার চালির স্থান। সাপের ফণা সাজিয়ে আর সাপের লতানে শরীরের জোড় মিলিয়ে তৈরী। বড় বড় আকারেরও হয়। চারফুট প্রশস্ত, তিনফুট/চারফুট উঁচু মনসার চালির দাম হাজার টাকা। অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া শহরের রামপুর পাড়ায় একটি মনসার মাড়ে আরও উঁচু একটা পুরোণো কালের মনসার চালি আছে। পুজো করা হয়, মনসার গানও হয়। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদ মিউজিয়ামেও আছে। বাঁকুড়া সদর সহরের ম্যাজিস্ট্রেট বাংলোর সংগ্রহশালাতেও আছে। আর দেখেছি রুচিশীল ধনী পরিবারের গৃহসজ্জায়।

বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র তৈরী হয় ছোট সাইজের মনসার চালি। যে কোন কুমারের দোকানে বা শিল্পসামগ্রীর দোকানেও বিক্রী হয়। মা মনসার দাঁড়ানো বা বসা মূর্তির মাথায় সাজানো বিস্তৃত ও উদ্ধত সর্পফণাগুলি ভয়ংকর কিন্তু সুন্দর। একফুট/দেড়ফুট। মোটামুটি এই রকম সাইজের। রঙ কালো। কখনও কখনও সিঁদুরে লাল। যার যেমন পছন্দ কিনতে পারেন। খুবই কম দাম। তবে বড় ভঙ্গুর। নিয়ে যেতে হয় অতি সাবধানে।

মনসার চালির পর মনসার 'বারি ঘট'। এখানে বলে শুধু—'মনসার বারি'। মনসার মন্দিরে জল বয়ে আনা ও বেদীর উপরে রাখার জন্য। একটু লম্বা গোল মাঝারী সাইজের ঘটের গায়ে ফণা তোলা সাপ। তিনটি সাপের চলই বেশী। ঘট সাজানো বেদী দেখেছি অযোধ্যার মনসা মাড়ে, এবং ধরাপাটের জৈন রেখদেউলের পাশের মনসা মাড়ে। 'মাড়' মানে মন্দির। পাঁচমুড়ায় এবং সারা বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র তৈরী হয় 'বারি ঘট'। এরই অনুকরণে ঢোকরা পিতলশিল্পীরা আজকাল

পিতলের ছোট ছোট 'বারি ঘট' তৈরী করছেন। দেখেছি বিগনায়। ঢোকরা কামারদের পাড়ায়। মনসা পূজার দেশ, মনসামঙ্গলের দেশ, সর্পবিষ মন্ত্রের দেশ, ঝাঁপানের দেশ রাঢ় বাঁকুড়ায়, এমন সযত্ন শিল্পবস্তু তৈরী হচ্ছে অনেক-অনেক দিনের শিল্প-ঐতিহ্যের ধারা বহন করে।

তুষু খলা আর এক রকমের মনোহর শিল্পবস্তু। এ দেশ ভেসে যায় ভাদু ও তুষু গানের সুরে। প্রতি বছর। সারা পৌষ মাস জুড়ে তুষু পূজা ও উৎসব। এ নিয়ে একান্ত আনন্দে আলোচনা করেছিলাম 'তুষু ব্রত ও গীতি সমীক্ষা' গ্রন্থে। লৌকিক পূজা পার্বণের অনুষঙ্গ লোকায়ত শিল্প। তুষুকে ঘিরে কত ধরণের শিল্পকৃতি গড়ে উঠেছে তার একটি ছোট আলোচনা করেছি—দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত 'টুসু: ইতিহাসে ও সঙ্গীতে' গ্রন্থে। এখানে শুধু মাটির তুষু খলার কথা বলবো। ভারি সুন্দর এইসব তুষু খলা। একটি ছোট ভাঁড় বা ঘটের উপরের কানায় গোল করে প্রদীপ সাজানো। পঞ্চপ্রদীপ নয়, প্রধানতঃ নয়, দশ, দ্বাদশ, পঞ্চদশ প্রদীপ। চক্রাকারে ও ছিমছাম। ভাঁড়ের বা খলার খোলের মধ্যে থাকে ব্রতচারিণীর হাতের ফুল আর প্রদীপগুলিকে দেওয়া হয় প্রজ্বলিত করে। তারপর পৌষ সংক্রান্তিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় বাঁধের জলে। বাঁকুড়ায় বৃহৎ জলাশয়কে বলে 'বাঁধ'। অথবা ভাসানো হয় স্থির নদীর জলে। জলের বুকে তখন আলোর শোভা। আহা মরি শোভা! ভাসানোর জন্য তৈরী তুষু খলার গড়ন আলাদা। তলাটা সুগোল,ফাঁপা এবং মুখটা ফাঁদালো। অভিজ্ঞ কুমোর ছাড়া তৈরী করতে পারেন না। মেঝেতে বা বেদীতে বসানোর জন্য তুষু খলার গড়ন পেটন ভিন্ন। আবার আছে একতলা, দুতলা, তিনতলা তুষু খলার বহুল প্রচলন। তিনতলা মানে উপর উপর তিনটি প্রদীপের, স্তর। আবার বহু প্রদীপের, শতাধিক সংলগ্ন প্রদীপের বহুতল তুষু খলা দেখেছি রাজগ্রামের দ্বারকেশ্বর নদ-তীরবর্তী কুমোরপাড়ায়। দেখেছি বাঁকুড়া শহরের রামপুর পাড়ায় পরিমল-বৌদির শিল্প-বিপণিতে।

পাঁচমুড়ার মাটির শাঁখ সাম্প্রতিক কালের উদ্ভাবনা। মৃৎ কারিগরী বিদ্যার আর একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা। সমুদ্র শঙ্খের মতই এই মাটির শাঁখও বাজানো যায়, গৃহে গৃহে সন্ধ্যারতির সঙ্গে বাজানো হয়। সমুদ্র শঙ্খের ভিতরে যেমন প্রাকৃতিক প্যাঁচানো 'কয়েল' (Coil) আছে, পাঁচমুড়ার মাটির শাঁখেও তাই আছে। শাঁখগুলি বেশ পুরু মাটির আস্তর দিয়ে তৈরী। এমন করে দুমুখ জোড় দেওয়া যে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। পোড়ানোর পর ভিতরের অর্থাৎ অন্তর্দেশীয় 'কয়েল' কিভাবে ওঁরা করেন তার 'টেকনিক' গোপন আছে। ওঁরা এই অভিনব শিল্প-'সিক্রেস' অপরের কাছে ভাঙেন না। বিষ্ণুপুরের সামুদ্রিক শাঁখের উপর শিল্পকাজের মতো, পাঁচমুড়ার মাটির শাঁখের উপরও ফুলকারি নকাশি কাজ হয়। এইসব মাটির লাল বা কালো রঙের কারুসুন্দর শাঁখ তাই শো-কেসেও সাজিয়ে রাখা যায়।

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পে যে সর্বজনবিদিত ঘোড়ার ঘরাণা সে কথা আমরা স্বতন্ত্র

নিবন্ধে বলবো। তেজদৃপ্ত ঘোড়ার পাশাপাশি আনন্দ-স্থির হাতির উপস্থিতিও দেখবার মতো। ফাঁপা, ভারি, বড় সাইজের পোড়ামাটির হাতি। কোনটার শুঁড় তোলা, কোনটার শুঁড় নামানো। এরা বিগত দিল্লী এশিয়াডের আপ্পু নয়। ধাতু, কাঠ, পাথর ও মাটিতে গড়া নানা শিল্পে সারা ভারতে আপ্পুর এখন খুব চল হয়েছে। বাঁকুড়ার হাতি অরণ্যশান্তিতে রাজকীয় এবং তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর, শালতোড়া, ছাতনা, খাতড়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া শহরে এদের তৈলচিক্কণ কালো মূর্তি আমি অনেক দেখেছি। এরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বাঁকুড়ার ঘোড়ার মতো উৎকর্ণ নয়, নয় উচ্চকিত। কয়েক বছর আগে বাঁকুড়া খৃশ্চান কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ দাসকে বিদায় সম্বর্ধনা দেবার সময় একটি বড় সাইজের হাতি উপহার দেওয়া হয়েছিল অন্যান্য উপহারের সঙ্গে। সেই হাতিটিই প্রথম আমার মন ভুলিয়েছিল। তারপর থেকেই আমি চোখ পেতে থাকি হাতি দেখার জন্য। পাঁচমুড়ার হাতি পাঁচমুড়ার ঘোড়ার মতই সৌভাগ্য লাভের অধিকারী। তবু কেন বঞ্চিত ?[১]

এই সুলভদর্শন হাতির মূর্তির সঙ্গে আর এক ধরনের হাতি এখানে তৈরী হয়। তার নাম 'বোঙা হাতি'। দেবস্থানে মানৎ উৎসর্গের জন্য তৈরী হয়। নিছক শিল্পসামগ্রীরূপেও এগুলি পরম সুন্দর। 'বোঙা' সাঁওতাল আদিবাসীদের দেবতা। পেটফোলা স্বাভাবিক হাতির মতো নয় এই 'বোঙা হাতি'। সামনে থেকে হাতিকে দেখলে যেমন দেখায়, সেই front facing view-টি, সেই প্রতীকী ইম্প্রেশনটি, এই বোঙা হাতির মূর্তিতে ধরা হয়েছে। আসলে চ্যাপ্টা গড়ন এই বোঙা হাতি যেমন অভিনব, তেমনই আদিম আরণ্য শিল্পকলার স্মৃতিবাহী। এগুলিও প্রধানতঃ কালো ও লাল রঙের।

হাতি ঘোড়ার পরেই এসে যায় বাইসন। বনের ষাঁড়। তার তেজী বন্য তেড়ে-যাওয়া রূপ ঠিক ঠিক ধরেছেন এখানের মৃৎশিল্পীরা। এ দেশ তো আর ম্যাটাডোরের (matador) দেশ নয়। বাঁকুড়ার কোথাও ষাঁড়ের লড়াই হয় না। অথচ মৃৎশিল্পে কেন ষাঁড়ের লড়াইয়ের motif? এখানের শিল্পীরা সহজেই ষাঁড় বা বাইসনের চরিত্র নিখুঁত ফুটিয়ে তুলেছেন। ষাঁড়ের অ্যানাটমি সহ। অথচ ষাঁড়ের দৃপ্ত ব্যঞ্জনা অতীব সুখের হয়েছে। মুখোমুখি দাঁড়ানো এবং শিং ঘাড় নামানো এক জোড়া বাইসন যে-কোন পরিবেশে নাটকীয় দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবার মতো। কালো এবং সিঁদুরে, দু' রঙের বাইসনই বাঁকুড়ার সর্বত্র তৈরী হয়।

ইদানীং বাঘমুখ ছাইদানীও তৈরী হচ্ছে। বারাণসীর ছাইদানীর গায়ে গালার উপর বসানো টুকরো আয়নার কাজ, কাশ্মীরের তৈরী ছাইদানীর নানা রঙের মিনা

---

১. বাঁকুড়ার হাতি অরণ্যবাসী সহজ সরল অকৃত্রিম, রাজস্থানের হাতির মতো অলংকারবাহুল্য নেই। বস্তারের টেরাকোটা হাতিও গরীয়ান অলংকরণ সমৃদ্ধ।

কাজ আমি দেখেছি। দেখেছি রাজস্থান-উদয়পুরে পাথরের টুকরো থেকে খোদাই কাজের ছাইদানী। নকসা তোলা বা ব্যাঙমুখ রূপা ও পিতলের ছাইদানীও দেখেছি। কিন্তু এখানের কালো রঙের বাঘমুখ—তিন দিকে তিনটি বা তিন জোড়া বাঘমুখ বসানো ছাইদানী, তুলনায় কম সুন্দর নয়। মাটির ছাইদানীর সঙ্গে স্মরণীয় বিগনার ঢোকরা পিতলের বাঘমুখ ছাইদানী।

হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ভারতবর্ষে দেব দেবীর মূর্তি কোথায় না তৈরী হয়? বাঁকুড়া জেলা পৌত্তলিক ভারতবর্ষের বাইরে নয়। যদিও বাঁকুড়া জেলার লোকশিল্প-সংস্কৃতিতে আদিম অনার্য সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষণীয় উপাদান যোগান দিয়েছে। এখানের একানে ভাদু মূর্তি ও তুষু মূর্তির গড়ন, অলংকরণ, সাজসজ্জা খুবই চোখে পড়ার মতো। কংসাবতীর চরে পোরকুলের মেলায় দেখেছি পঞ্চশরীর পঞ্চমুখ তুষু মূর্তি এবং সহস্র সহস্র একানে তুষু মূর্তি। বিবড়দা, হাড়মাসড়ায় দেখছি ভাদু-মূর্তি মাথায় নিয়ে মেয়েদের ভাসান যাত্রা। ছোট ছোট কিন্তু ভারি সুন্দর সব মূর্তি। অবশ্য মূর্তিগুলির শাস্ত্র নির্ধারিত কোন বাঁধা প্যাটার্ন নেই, যে যেমন পেরেছেন তৈরী করেছেন। সাজিয়েছেন। তাই এগুলিকে বড় ধরণের পুতুলের পর্যায়ে ধরা যায়।

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে হিঙ্গুল পুতুল অর্থাৎ বর-কনে পুতুল আজও দেখতে পাওয়া যায়। যদিও মাটির নাক-টেপা পুতুলের চল তেমন নেই। হিঙ্গুল পুতুল ছোট ছোট, এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি। দু'রঙের, সবুজ আর লাল রঙের। গালার 'কোটিং' দেওয়া। আগুনে পুড়িয়ে গরম থাকতে থাকতে গালার আস্তর দিতে হয়। জলে নষ্ট হয় না। বিয়ের সময় গায়ে-হলুদের তত্ত্বে পাঠাতে হয়।

আর আছে অপরূপা ষষ্ঠী-পুতুল। এ যুগ বৈজ্ঞানিক পরিবার পরিকল্পনার যুগ। তবু ছেলেপুলে নিয়ে যাঁরা ঘর করেন, সেই সুবিস্তৃত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, সেই ভূমিলগ্ন, বসুন্ধরা সমতুল মায়েরা, মা ষষ্ঠীর কৃপা আজও আন্তরিক প্রার্থনা করেন। কোলে পুত, কাঁখে পুত ষষ্ঠী পুতুল তাই সর্বত্র। আদরণীয় ও আকর্ষণীয় গড়ন। দেখতে ঠিক মহেঞ্জদড়োর নগ্ন স্থূলোদর মাতৃকা মূর্তি নয়। ষষ্ঠী পুতুলের গড়ন এখানে শিল্পকলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। দাঁড়ানো অথবা পা ছড়িয়ে বসা পুতুল। সব পুতুলেই ভারি, বড়, দুধে পুষ্ট, সদ্য মাতৃস্তনের উচ্চ-মুখ অবয়ব। কোলে, কাঁখে, কাঁধে, পায়ের কাছে একাধিক শিশু। চোখ মুখ হাত পা, সব মিলিয়ে প্রজনন ক্ষমতার নান্দনিক সম্পূর্ণতা। একে "বুড়ী পুতুল'ও বলে।[১]

---

১. Jasleen Dhamija রচিত 'Indian Folk Arts and Crafts' গ্রন্থে ষষ্ঠী পুতুলের বর্ণনা ভিন্ন রকম—During one of the VRATAS the image of Shashti, children's goddess who protects them from all harms, is

অবশ্য বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের যে রাজকীয় দরবারী ধারা, সেটি লুপ্ত হয়ে গেছে। বাংলার অন্যান্য জেলার মতো বাঁকুড়াতেও টেরাকোটা মন্দিরশিল্প আর সজীব নয়। অথচ এখানে মন্দির মৃৎশিল্প যে কী আসাধারণ গরিমা লাভ করেছিল তার প্রমাণ আজও অক্ষয় অটুট আছে, বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় ও জোড়বাংলা মন্দিরে, সোনামুখীর পঁচিশ চূড়া শ্রীধর মন্দিরে, হাজার বছরের পুরাণো বহুলাড়ার মন্দিরে। তারই যেন লোকায়ত অনুবর্তন চলছে হাতি ঘোড়া চালি ষষ্ঠীপুতুল প্রভৃতির মাধ্যমে।

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্প এখন সর্বাংশে লোকায়ত। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি অঞ্চলের মাটির পুতুলের মতো হুবহু অনুকরণ এরা নয়। নয় ফটোগ্রাফিক অন্ধ অনুসরণ। শিল্প-রসিক পণ্ডিতেরা জানেন, বাঁকুড়ার পুতুলের নন্দনতাত্ত্বিক গরিমা, কৃষ্ণনগরের পুতুলের তুলনায় কত গভীর, দূরপ্রসারী ও ঐতিহ্যবাহী। কৃষ্ণনগরের পুতুল —মাছ যেন সত্যি মাছ, রসগোল্লা পানতুয়া যেন সত্যি ডিসভর্তি রসগোল্লা পানতুয়া, ডাব ঠিক গাছের সবুজ কচি ডাবের মতো, টিকটিকি মাকড়সা যেন জ্যান্ত। আমাদের আলোচ্য বাঁকুড়া মৃৎমূর্তিগুলি এরকম নয়। মূল অবয়বের শতকরা শতভাগ অনুকৃতি নয়। বাঁকুড়ার মৃৎশিল্প ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন মানের এবং দেশকাল নির্বিশেষে চিরন্তন শিল্পবোধে সার্থক গুণান্বিত। বাঁকুড়ার মাটি খরা লাগা, শুকনো কাঁকুরে লাঢ়া মাটি। তবু এখানের মৃৎশিল্পবস্তু দেখতে দেখতে বলতে ইচ্ছা করে—'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'। এখানে এ গান এ ভাবেও সত্য।

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পকলা ও পুতুল প্রতিমার মধ্যে জীবন ও শিল্পরুচি যেমন মিলেমিশে গেছে, তেমনি এই ধারাকে বেগবান করে রেখেছে ধর্ম। লৌকিক ও সনাতন ধর্ম। আদিবাসীদের ধর্ম, উৎসব, আচারের সঙ্গে উচ্চবর্ণ হিন্দু ও নিম্ন-বর্ণ হিন্দুদের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ব্রত, আচার, উপাচারের সঙ্গে মৃৎশিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটেছে। একটু ভালোভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায়, ঐতিহ্যের ধারাটি এখানে ক্ষীণ নয়; ঐতিহ্য ব্যাপারটিকে এখানে খুব হাল্কা ভাবে নেওয়া যাবে না।

জাপানে বিশ্ববিখ্যাত পুতুল উৎসব হয়। সেখানে মেয়েদের পুতুল উৎসব হয়

---

prepared by women. The goddess has a strange bird-like face with a beak, a large bust and hips and children crawling all over her. Her 'vehicle' is the cat, which is generally depicted with an arched back. The Shashti figure is as ancient as the Indus Valley civilization of which similar Mother Goddess figures have been excavated, showing a continuity of the tradition which has been maintained by women." বঙ্গদেশের ষষ্ঠী পুতুল সম্বন্ধেই এই উক্তি, কিন্তু আমি এই রকম ষষ্ঠী পুতুল বাঁকুড়ায় দেখতে পাইনি।

৩-রা মার্চ, ছেলেদের পুতুল উৎসব ৫-ই মে, প্রতি বছর। বাঁকুড়ায় কোন পুতুল উৎসব হয় না। কিন্তু এখানের যে কোন পাল পার্বণ উৎসবের সঙ্গে কোন না কোন পুতুলের যোগ আছে। ভাদু পুতুল, তুষু পুতুল, ষষ্ঠী পুতুল, মাটির ঘোড়া, মাটির হাতি, মনসা পুতুল, হিঙ্গুল পুতুল—সারা বছর-জোড়া নানা উৎসব পুজা পার্বণের প্রয়োজনেই গড়া হয়। প্রাচীন সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নিদর্শনে পোড়ামাটির মাতৃকা মূর্তি পাওয়া গেছে। বাঁকুড়ার ষষ্ঠীপুতুলে সেই আদিমতার ধারা জনজীবনের আধুনিক বহির্মুখিতার নিভৃতে ঠিকই বইছে। একদিকে বোঙা হাতি ও অন্যদিকে ষষ্ঠী পুতুল—সৌন্দর্যপিপাসু গবেষকের মনকে সুদূর অতীতের সময়-সীমায় নিয়ে যায়। তাকে বিস্মিত করে, তাকে মুগ্ধ করে, তাকে পুনরায় উদাস করে দেয়। সে চিন্তা করে, যুগ যুগ ধরে সমগ্র রাঢ়-বাঁকুড়া জুড়ে মাটির বাঁশিতে যে সুরের তান উঠেছে, তার শুরু কবে, তার শেষ কোথায়॥

বাঁকুড়া হিতৈষী। ১৩৯১

শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্য

দূর থেকে প্রায়ই চোখে পড়ে। ঘুরতে ফিরতে, বাসে চেপে যেতে যেতে অথবা ট্রেনের কামরা থেকে। মাথা নিচু করে, চার পা মুড়ে বসে আছে এক বিশাল বপু দিক্‌বারণ। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন জলে বাসকারী শুশুক। তার থেকেই নাম নাকি শুশুনিয়া। গঙ্গায় বান এলে ছোটবেলায় শুশুককে হঠাৎ হঠাৎ ভেসে উঠতে দেখেছি। কিন্তু সমগ্র শুশুকমূর্তি কখনো দেখিনি। হাতির সঙ্গে তুলনা করতেই ভালো লাগে। আর শুশুক থেকে শুশুনিয়া হয়েছে, এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ শুশুনিয়া নামটি গ্রাম-নাম হিসাবে বাঁকুড়া জেলার নানা প্রান্তে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার সঙ্গে শুশুকের কোন সম্বন্ধ নেই। হয়তো শুষ্কতার সম্বন্ধ আছে। শুষ্ক স্থান অর্থাৎ শুশুনিয়া।

হাতির মতো শান্ত শুশুনিয়া পাহাড়টি সব সময় সজল শ্যামল স্নিগ্ধ। অনেক দূরের দৃষ্টিতে সামান্য কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হয়। রুক্ষ লাল মাটির দেশ বাঁকুড়ায় এমন একটি সবুজ অরণ্যঘেরা স্নিগ্ধ পাহাড় নয়নলোভন শুধু নয়, মনোমোহন। কবি আনন্দ বাগচী যখন বাঁকুড়ায় থাকতেন, তখন তাঁর বাড়ীর নাম দিয়েছিলেন 'সজল ছায়া'। ঐ সব সময়ে চোখের সামনে দেখতে পাওয়া সজল স্নিগ্ধ পাহাড়টি তাঁর কবিমনে ছায়া ফেলেছিল নিশ্চয়ই।*

ঈশ্বর-শিল্পীর সৃষ্টি বিশ্বপ্রকৃতিতে কত কত পাহাড় পর্বত। তুষারমৌলি হিমালয়ের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত নানা অংশ দেখেছি। তার তুলনায় শুশুনিয়া পাহাড় তো একটা টিলা মাত্র। কিন্তু প্রাচীন দেবশিল্প হিসাবে দেখলে এর একটা আলাদা রূপপরিচয় ধরা পড়ে। পুরুলিয়া জেলার শীতলপুরের পাহাড় আমার আর একটি প্রিয় পাহাড়। কুড়ি বছর আগে সে পাহাড়ের মাথায় উঠেছি। জয়চণ্ডী পাহাড়েও নতুনত্ব আবিষ্কারে গিয়েছি। বিহারীনাথ পাহাড়কে দূর থেকে দেখেছি। পরেশনাথ পাহাড়ের প্রধান চূড়ায় ওঠার কষ্টকর সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু এমন হাঁটুমোড়া হাতির মতো বৃহৎ দেবশিল্প সেগুলি নয়। পাঞ্চেত পাহাড় সবুজ সুন্দর ছিল, আজ তার অন্য অর্থ। মাইথনের সংগে প্রিয়সান্নিধ্যের ঘনিষ্ঠতা একাধিক বার। কিন্তু মাইথন আজ সহজসৌন্দর্য হারিয়েছে। তাছাড়া ঝিলিমিলির পাহাড়শ্রেণী এলোমেলো ; কোন শিল্পকলার হদিস দেয় না। টাটানগরের সামনে দলমা পাহাড়ের যে আকাশছোঁয়া অবরোধ, শুশুনিয়া পাহাড় বাঁকুড়ার পক্ষে সেরকম নয়। জলপাইগুড়ি শহর থেকে নির্মেঘ রোদ ঝলমল দুপুরে যেমন কবিত্বময়

---

* স্থানীয় কবিবন্ধু অবনী নাগ অবশ্য জানালেন নামকরণ হয়েছিল আনন্দ বাগচীর মায়ের নামে,—তাঁর মায়ের নাম সজলবাসিনী দেবী।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় সেরকম না হলেও বাঁকুড়া শহর থেকে শুশুনিয়ার দৃশ্য সুমহান এক শিল্পরূপ দেখার আনন্দ দেয়।

শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে এক বিখ্যাত লিপি আছে। সে লিপির পাঠ উদ্ধার করা শক্ত নয়। অনেকেই করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে মানিকলাল সিংহ পর্যন্ত বহু পণ্ডিত এই লিপিটি সম্বন্ধে নানা কথা বলেছেন। শুশুনিয়ায় আমি বহুবার গেছি, কিন্তু লিপিটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯৮১ সালের ২২ ডিসেম্বর সকালে। আমার গাইড ছিলেন একজন অতি বাক্‌পটু ব্যক্তি সুধীর কর্মকার। বাঁকুড়া-ছাতনা-দুর্গাপুর রুটের বাস থেকে নেমে পাহাড়ের পিছন দিকে, উত্তর দিকে, তারপর পূব-মুখে প্রায় দু'মাইল হাঁটতে হয়। অবশেষে চড়াই ভেঙে উঠতে হয় উপরের দিকে। সহজ চড়াই উৎরাই।

লিপির অক্ষর ব্রাহ্মী। লিপির ভাষা সংস্কৃত। ব্রাহ্মী লিপির ছাঁদ কেমন তাই দেখার ইচ্ছা। তখনও পর্যন্ত উড়িষ্যার উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখিনি। দেখিনি সেখানের শিলালিপি। লিপিবিজ্ঞান আজকাল খুবই আকর্ষণীয় বিষয়। লিপিকলা অর্থাৎ ক্যালিগ্রাফির (Calligraphy) অপূর্ব নমুনা দেখেছিলাম দিল্লীর লালকেল্লা মিউজিয়মে নানা পুঁথিতে। আরবী ফারসী পুঁথির অপূর্ব লিখনসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। গ্রামবাংলার মৌলিক পুঁথিপত্রও কিছু দেখেছি। মহেঞ্জোদড়োর ছাপাই ছবিতে নানা লিপি। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষাতত্ত্বের বইয়ে দেখেছি ফিনিসিয় লিপি, পারসিক বাণমুখ লিপি, মেসোপটেমিয়ার লিপিচিত্র, মিশরীয় লিপিচিত্র। খ্রীশ্চান কলেজে বাংলা অনার্স বিভাগের ছাত্রদের নিয়ে 'লিপিবিচিত্রা' বিষয়ে প্রদর্শনীও করেছি। পর পর তিন বছর। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মশায়ের বাংলা লিপি-সংস্কারের বিষয়েও ওয়াকিবহাল হয়েছি। তাই দেখতে গিয়েছিলাম ব্রাহ্মী লিপির ছাঁদ। কারণ এই ব্রাহ্মী লিপি থেকেই ধীরে ধীরে বাংলা লিপি অক্ষরের উৎপত্তি। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রায় সমস্ত লিপির উদ্ভব হয়েছে ব্রাহ্মী লিপি থেকে। মহাস্থানগড়ের লিপি দেখার সৌভাগ্য আমার আজও হয়নি। কিন্তু শুশুনিয়ার শিলালিপি নিজের চোখে দেখেছি, তাই বা কম কি!

শুশুনিয়ার গুহালিপি অবশ্য ঠিক গুহা নয়, সম্মুখভাগ উন্মুক্ত একখণ্ড প্রশস্ত পাথরের উপর খোদাই করা লিপি। এখানে লেখা আছে তিনটি ছত্র এবং মূলতঃ ২টি অংশে বিভক্ত। আর বামদিকে আছে একছত্রের একটি 'অর্বাচীন' লিপি, যার পাঠ উদ্ধার আজও হয়নি।

এইসব লিপিছত্রের মাঝখানে খোদাই করা আছে একটি সুবৃহৎ চক্র। চক্রটি ডানদিকে ৩১" ইঞ্চি লম্বা একটি লিপি আর চক্রটির নিচে দুই ছত্রের আর একটি লিপি। যার প্রথম ছত্রটির দৈর্ঘ্য ৩৮" ইঞ্চি এবং দ্বিতীয়টি দৈর্ঘ্য ২৬' ইঞ্চি। মসৃণ বেলেপাথরের উপর খোদাই করা এই লিপিগুলির প্রাচীনত্ব প্রায় ১৬ / ১৭ শত বছরের। পুষ্করণার অধিপতি সিংহবর্মণের পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মণের রাজত্বকাল

ঐ সময়সীমায়। পুষ্করণা অর্থাৎ (বর্তমানের নাম) পোখন্নাতে তাঁর রাজধানী ছিল। পোখন্না বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া শহর থেকে মাইল দুই দূরে, দুর্গাপুর-বাঁকুড়া সড়কপথে যাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার প্রত্নক্ষেত্র হিসাবে পোখন্না আজও বিখ্যাত। তবে পর্বতগাত্রে খোদাই করা লিপির গড়ন যে খুব সুন্দর সুষমাময় তা আমার মনে হয়নি।

কিন্তু চক্রের বামদিকের (অর্বাচীন কালে?) খোদিত লিপিটি কার, কাদের বা কোন্ ভাষায়? খোদাইয়ের রঙ দেখে অর্বাচীন কালের মনে হয়েছে, পূর্ব-আলোচিত লিপিগুলির মতো কালো হয়ে যায়নি। এক ছত্রের ঐ লিপিটির কথা কিন্তু কোন পণ্ডিত বলেননি। আমার গাইড বললেন—ওটা 'অলচিকি' অর্থাৎ সাঁওতালী ভাষার লিপি। ঠাট্টা কিনা জানি না!

এবার চক্রটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। এটি সূর্যচক্র। অথবা বলা উচিত 'চন্দ্রসূর্যচক্র'। লিপিপাঠে জানা যায়—চন্দ্রবর্মণ ছিলেন চক্রস্বামীর পূজারী অর্থাৎ বিষ্ণুপূজারী। লিপির 'চক্রস্বামিন দাস' বলতে পণ্ডিতেরা তাই বুঝেছেন। শংখ চক্র গদা পদ্মধারী বিষ্ণুর হাতের চক্রের কোন বিশেষ গড়নবৈশিষ্ট্য বা নিয়ম-কানুন আছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু শুশুনিয়া পাথরের বুকে খোদাই করা ঐ চক্রটির আঁকজোক সবিশেষ লক্ষণীয়।

একটা সাইকেলের চাকা ভেবে নিন। তার গোল বৃত্ত, তার 'স্পোক', তার কেন্দ্রবিন্দু সহ। আমাদের আলোচ্য চক্রটিতে আছে বাহু বা স্পোক্। কেন্দ্রবিন্দু অংশটা অর্ধচন্দ্রাকার। বৃত্তরেখা স্পর্শ করে বাইরের দিকে আঁকা, সমদূরত্বে, ১৪টি অগ্নিশিখা। আর অর্ধচন্দ্ররূপ কেন্দ্রটি থেকে উঠেছে একটি উধর্বমুখী বৃহৎ শিখা। প্রায় এক ফুটের মতো লম্বা। মোট ১৪+১=১৫টি শিখা। বৃত্তের ঐ বাইরের দিকের ছোট শিখাগুলির দূরত্ব সমপরিমাণ। বৃত্তটির ব্যাস ৩০" ইঞ্চি। একটি শিখার ডগা থেকে ঠিক তার বিপরীত দিকের শিখার ডগা পর্যন্ত পরিসর ৬১" ইঞ্চি। আমাদের মাস বৎসরের যে হিসাব তার মধ্যে পক্ষকাল ও চান্দ্রমাসের গুরুত্ব অনেক। সূর্যের আকাশ পরিক্রমায় জ্যোতির্বিজ্ঞান নির্ধারিত কোন ইঙ্গিত ঐ চক্রের মধ্যে আছে! তাহলে এটা নিছক চক্রস্বামী বিষ্ণুবাসুদেবের হাতের চক্র নয়। এটি 'চন্দ্রসূর্যচক্র'। তাই নয় কি?

চক্রটির মূল শিখা সিন্দূরলিপ্ত। তেল সিঁদূরের আরও দাগ দেওয়া হয়েছে এখানে ওখানে। এই জায়গায় এসে মাঝে মধ্যে হরিসংকীর্তন করা হয়। দূর-দূরান্তের সমতলভূমির গ্রাম থেকে কীর্তনীয়াদের দল আসেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের দল। 'বিষ্ণুচক্র' বলেই কি? বিশেষ করে মকর সংক্রান্তিতে ও মাঘী পূর্ণিমাতে এখানে কীর্তন গাওয়া হয়, হরিনাম হয়। পৌষ সংক্রান্তি অর্থাৎ মকর সংক্রান্তি রাঢ়-বাঁকুড়ার বিখ্যাত উৎসব দিবস। ঐদিনেই তুষু ভাসান দেওয়া হয়। তুষুপরবের সঙ্গে ঐ

বিষ্ণুচক্রের যোগাযোগ আবিষ্কার করেছেন বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের বিখ্যাত পণ্ডিত মানিকলাল সিংহ।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের একটি সাবধানবাণী লেখা বোর্ড আছে ওখানে। "এই কীর্তির কোনরূপ অনিষ্ট বা প্রাচীন সৌন্দর্য নষ্ট করিলে তাহার তিন মাস পর্যন্ত কারাবাস বা ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে।" তবু অনিষ্ট হচ্ছে, প্রাচীন সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। সিঁদুর লেপা হচ্ছে। চারটি খুঁটি দিয়ে একটি একচালু টিনের চালা পূর্বতন কোন ম্যাজিস্ট্রেট করিয়ে দিয়েছিলেন। টিনের চালাটি মাঝামাঝি ফেটে গেছে। ঝর ঝর করে জল পড়ে। ফলে ক্ষতি হচ্ছে লিপি ও চক্রের। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতিকে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ তাঁরা যেন টিনের চালাটি পুনর্নির্মাণ করার ব্যবস্থা করেন। এবং যত শীঘ্র সম্ভব প্রকৃতির মার থেকে লিপি ও চক্রকে রক্ষা করেন।

এবার কিছু জটিলতর প্রশ্নের আলোচনা। শুশুনিয়া লিপির পাঠ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন পণ্ডিতেরা। 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি" গ্রন্থে (১৯৭১) অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, আলাদা আলাদা ভাবে—"প্রথম লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ: চক্রস্বামিন দাসাগ্রেণাতিসৃষ্ট পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিংহবর্মণস্য পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণ দৃতি। অর্থাৎ, চক্রধারী দেবতার প্রধান সেবক, পুষ্করণার অধিপতি শ্রীসিংহবর্মণের পুত্র শ্রীচন্দ্রবর্মণ বিশেষ কোন কীর্তি উৎসর্গ করলেন।" (পৃষ্ঠা ১১৬)। ঐ আলোচনার পরের অংশে লিখেছেন—"শুশুনিয়ার দ্বিতীয় লিপিটি একই হরফে লিখিত ও তার পাঠ নিম্নরূপ: চক্রস্বামিনো ধোসোগ্রামোতিসৃষ্ট। অর্থাৎ ধোসোগ্রাম নামক পল্লী চক্রস্বামীকে উৎসর্গ করা হল।" কিন্তু বাঁকুড়া-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত মানিকলাল সিংহ তাঁর 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' (১৩৮৪) নামক গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন প্রায় ভিন্ন পাঠ ও ভিন্ন অর্থ। তিনি লিখেছেন—"চন্দ্রবর্মা কর্তৃক প্রদত্ত লিপিটি: পুষ্করণাধিপতে মহারাজ সিংহবর্মণঃ পুত্রস্য / মহারাজ চন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ / চক্রস্বামিণং দাসাগ্রেণাতি সৃষ্ট। অর্থাৎ পুষ্করণার রাজা মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কৃতি-চক্রস্বামীর দাসমুখ্যের দ্বারা উৎসর্গীকৃত।" মানিকলাল সিংহ লিপির মূল পাঠটি একটানা লেখেননি—কবিতার মতো তিনটি আলাদা ছত্রে লিখেছেন।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন মূল পাঠে ও লিপির বঙ্গার্থে এতখানি ভেদ কেন? পরবর্তীকালে লিখিত হলেও মানিকবাবু এ সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থে কোন আলোকপাতও করেননি। অবশ্য 'দ' আর 'ধ' ব্রাহ্মী লিপিতে প্রায় এক রকম দেখায়।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, ঐ লিপির সঙ্গে খোদিত চক্রটির সম্বন্ধে। চক্রের মধ্যভাগ থেকে যে 'বৃহৎ শিখা'টি উপরের দিকে উঠেছে সেটা আগে ছিল কিনা? অমিয়বাবু যে ছবি ছেপেছেন পূর্বোক্ত গ্রন্থে, সেখানে মাঝখানের মূল শিখাটি বৃহৎ

নয় এবং চক্রের পরিধি রেখা ছাড়িয়ে উপর দিকে উঠে যায়নি। অথচ আমরা দেখলাম মূল মধ্যশিখাটি পরিধিরেখা ছাড়িয়ে উপরের দিকে বেশ মোটা হয়ে উঠে গেছে। প্রায় এক ফুটের মতো লম্বা উর্ধ্বমুখী শিখা। তাহলে ছোট মূল আদি শিখাটিকে কে বা কারা এত লম্বা করে দিল? মানিকবাবুও বলেছেন "কেন্দ্রে একটি সুবৃহৎ অগ্নিশিখার নকশা" (পৃঃ ৮১)-র কথা। তাহলে? ছোট শিখা, কেন্দ্র ছাড়িয়ে কি করে পরিধি পার হল??!

মূল লিপির পাশে অর্বাচীন কালে যাঁরা 'নতুন লিপি' খোদাই করে দিয়েছেন, একি তাঁদেরই কাজ? ঐ নতুন লিপির পাঠ যেমন উদ্ধার হয়নি, তেমনি ছোট শিখা কি করে বৃহৎ হয়ে গেল তারও কোন উত্তর পাইনি।

সুচেতনা। ১৩৯২

শুশুনিয়া পাথরের আধুনিক শিল্পকলা

যার শিল তারই নোড়া। সব সময় কথাটা সত্যি নয়। বেজোবাবু অর্থাৎ ব্রজলাল সিংদেও। তাঁর বয়স আজ প্রায় ৮০-৮৫ বছর। সারা জীবন ধরে তিনি 'হাঁসা' পাথরের নোড়া 'ছিঁচছেন'। হাঁসা পাথরকে ওঁরা 'কোঁচ' পাথরও বলেন। হাঁসা অর্থাৎ সাদা, আর কোঁচ হচ্ছে কাঁচের মতো মসৃণ। একটা নোড়া তৈরি করতে দুদিন লাগে। মাঝারি সাইজের ঐ নোড়াটার দাম ২ টাকা কি ২½ টাকা। তাহলে রোজ তাঁর আয় এক টাকা কি পাঁচ সিকে। ভাঙাজীর্ণ অতি দরিদ্র মানুষের মাটির ঘর। তাঁর ছাঁচতলায় বসে বসে, তিনি 'তিন মাথা' (মাথা ও দুই পায়ের হাঁটু) এক করে হাতুড়ি চালাচ্ছেন। ঠুক ঠুক ঠুক। ক্লান্ত হাতে মন্থর ছন্দে। পূর্বের পাহাড় থেকে নয়, গ্রামের পশ্চিম দিকের মাঠ থেকে আনা এই হাঁসা পাথর। নোড়া তৈরির কাজ এ গাঁয়ে আর কেউ করে না বেজোবাবু ছাড়া। কারণ এই ধরনের পাথর খুব শক্ত ও ভারি। গোল মতন পাথরে সামান্য সরষের তেল মাখিয়ে হাতুড়ির ঘা দিতে হয়।

শত বছরের প্রাচীন এইসব কাজ। শিল, নোড়া, থালা, বাটি, জলহরি প্রভৃতি সাধারণ প্রস্তরদ্রব্যই তখন তৈরি হত। এতকাল তৈরি হয়ে এসেছে। অবশ্য কিছুকাল আগে এক বিদেশী জার্মানীতে শুশুনিয়া পাহাড়ের পাথর থেকে 'স্ল্যাব' কেটে চালান দিতেন সিঁড়ি, পৈঠা প্রভৃতি তৈরির জন্য। চৌকা টালিও তৈরি করতেন তিনি।

ইদানীং সেই পাথরের মোটা কাজকে সুন্দর শিল্পবস্তুতে পরিণত করেছেন সহদেব কর্মকার। ছিপছিপে লম্বা একহারা চেহারার মানুষ। সামনের দুটি দাঁত পড়ে গেছে। বয়স প্রায় ৬০/৬৫ বছর। শুশুনিয়া পাথরের আধুনিক শিল্পধারার তিনিই ভগীরথ।

ঘটনাটা ঘটেছিল ভারি অদ্ভুতভাবে। তিনি পাথরের থালা বাসনের কাজ, লোহার কাজ, সোনারুপার কাজ প্রভৃতি করেছেন প্রথম জীবন থেকে। করেছেন সুযোগ সুবিধা মতো। ইতিমধ্যে জিওলজিক্যাল সার্ভের ক্যাম্প পড়লো শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে। পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সহদেবকে তিন টাকা রোজে কাজ দিলেন ক্যাম্পে। ঝাড়া মোছা এটা সেটা কাজ। সহদেব দেখতেন একজন বাবু পাহাড়ের নানা গুহা প্রভৃতির স্কেচ করে আনছেন আর মাটির ছাঁচ করে, মডেল করে কলকাতার অফিসে পাঠাচ্ছেন। সহদেব ভাবলেন পাথর কেটেও তো ঐ রকম মডেল করা যায়। একদিন নিজের বাড়িতে রাত জেগে ঐ রকম একটা মডেল

করে পরেশবাবুকে দেখালেন। তিনি খুশি হয়ে বিস্মিত বাহবা জানালেন। সেই থেকে শুরু। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে। তাঁর শিল্পকাজের জন্য সহদেব প্রথম পুরস্কৃত হন ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে। পর পর ছ'বছর প্রথম পুরস্কার। সহদেবের নিজের ছেলে যুবক মানিক ও সনাতন ছাড়াও অনেক তরুণ যুবক, কিশোর ও কিশোরী আজ এই শিল্পকাজে শ্রম ও প্রতিভা নিয়োগ করে রুজি রোজগার করছেন।

বাস রাস্তার পাশেই সহদেবের স্টুডিও 'বিষ্ণু কার্যালয়'। জেলাশাসক রামসেবক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮২ সালে উদ্বোধন করেছেন। সামান্য ছিটেবেড়া মাটির দেওয়াল, খড়ের চালের ছোট ঘর। বাবলা কাঁটা-পালার বেড়া। দেখলাম তৈরি হচ্ছে মা কালীর মূর্তি। আর তৈরি হয়ে পড়ে আছে বিরাট দুর্গাপট সহ শিবলিঙ্গ।

সবথেকে বড় যে মূর্তি তিনি করেছেন তার উচ্চতা ৬ ফুট। তাঁর তৈরি দেবদেবীর মূর্তি গেছে ডিসেরগড়, হাজারিবাগ, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে। প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন যে মূর্তির জন্য সেটি ছিল 'মা মমতা' অর্থাৎ মমতাময়ী মা ও ছেলে। দশাবতার, রাম-রাবণের যুদ্ধ, নটরাজ, দুর্গা, কালীমূর্তি প্রভৃতি ছোটবড় অর্ডারি মূর্তিও করেছেন। সাধারণতঃ কালীমূর্তির চাহিদাই বেশি। কিছুদিন আগে তাঁর তৈরি একটি শিববাহন ষাঁড়ের মূর্তি বিক্রী হয়েছে ৯০০ টাকায়। ছিন্নমস্তার ৬ ফুট উচ্চতার মূর্তিটির মূল্য ছিল ১৯০০ টাকা। তবে মানব প্রতিকৃতি তিনি তৈরি করেন না। এখানের অন্য শিল্পী করেন।

তাঁকে অনুসরণ করে সার্থক শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন বিশ্বনাথ কর্মকার। তাঁর তৈরি সাড়ে তিন ফুট উচ্চতার কালীমূর্তি দেখলাম। পাথর কেটে কালী ও পদতলে শিব তৈরি করতে সময় লেগেছে ১০ দিন। দাম পাবেন ১৮৫০ টাকা। দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেন, কিন্তু মানবমূর্তি তৈরি করার দিকেই তাঁর আগ্রহ বেশী। যে সাহস সহদেববাবু করতে পারেননি, ৩৮ বছরের বিশ্বনাথ সেই সাহস অর্জন করেছেন। গত বাইশ বছরের সাধনায় তিনি আজ খ্যাতি ও অর্থ দুই-ই পেয়েছেন। তবু দেখলাম ছোট চালাঘর, ক্ষুদ্র উঠোন। ভাত রান্না হচ্ছে। থালায় তরকারি ঢালা। এখন প্রায় দুপুর একটা। শিল্পী কাজ করছেন ভাতের হাঁড়ির পাশেই।

পরমাপ্রকৃতি সারদামণির একটা মূর্তি আছে উঠোনে। আর আছে ছাতনার ডাঃ নারান চ্যাটার্জীর মৃত পত্নীর মূর্তি। ধবনীর নীলকণ্ঠ মুখার্জী, দুর্গাপুরের আশুতোষ মুখার্জী, সুভাষ বোস প্রভৃতির মূর্তি তিনিই করেছেন। তিনি ছোট ছোট 'ইন্ডিয়ান ভেনাস' মূর্তিও তৈরি করেছেন। কালো পাথরের কাজ। দুমকা থেকে আসে এ পাথর, এখানে পাওয়া যায় না। ২/৩/৪ ফুট উচ্চতার মূর্তি করেছেন। এইসব কাজে সূক্ষ্ম শিল্প-বোধের নিদর্শন আছে।

বিশ্বনাথ সিংহবাবু, শিবরাম কর্মকার, মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার, পথিক কর্মকার প্রভৃতির কাজও ভালো। এঁরা অল্প বয়সে মূর্তিশিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছেন।

৩৫/৩৬ ঘর মূর্তিশিল্পী এখন এই শুশুনিয়া গ্রামে কাজ করছেন। আর আদি পাথরের থালা বাটি তৈরির ধারা ধরলে প্রায় শতাধিক ঘর এই পাথরের কাজে যুক্ত। ছোট ছোট শিল্পকাজে কুমারী মেয়েরাও আত্মনিয়োগ করেছে দেখলাম। বাবু পাড়ার অশ্বিনী কর্মকারের মেয়ে চন্দনা কর্মকার, চিন্তা কর্মকার, কৃষ্ণা কর্মকার তিন বোন, কাজ করতে শিখেছে। দেখলাম ষোল বছরের মেয়ে চন্দনা, চোদ্দ বছরের মেয়ে চিন্তা ছেনি হাতুড়ি নিয়ে কাজ করছে। এরা তৈরি করতে পারে পদ্মকলি ধূপদানী, পেপারওয়েট, ডানামেলা পেঁচা, শৌখীন সিঁদুর কৌটো, গলা উঁচু অলংকৃত ঘোড়া, স্ট্যান্ড প্রদীপ, খুদে শিবলিঙ্গ প্রভৃতি। ফর্সা হাসিখুশি চন্দনার সিঁদুরের কৌটোর কাজগুলি সুদর্শন মনোরম। ফোটা পদ্মের ডিজাইনে করা মাঝখানে গর্ত।

গ্রামের অন্য প্রান্তে মাঝপাড়ার ভগবান রায় ছায়াময় উঠোনে বসে পাথর ছেঁদে তৈরি করছেন 'জলহরি'। মিটসেফের চারটি পায়ায় চারটি জলহরি বসিয়ে জল ঢেলে দিতে হয়। তাহলে পিঁপড়ে উঠতে পারবে না। একপাশে ছাগল বাঁধা। দেওয়ালে দাঁড়ে ঝুলছে দুটি টিয়া। দড়ির চৌপায়াটা দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার ছায়ায় বেগুন-চারার পাশে বসে ভর দুপুরে তিনি কাজ করছেন। এমন কাজের দৃশ্য দেখলাম পাড়ায় পাড়ায়। ঘরের উঠোনে, দাওয়ায়, ছাঁচায়। গুইরাম কর্মকার (৩৮), দুর্গাদাস কর্মকার (১৭), কান্তিরাম কর্মকার (২৩), শেখর কর্মকার (১৪) এই ভাবেই শরতের দুপুরে কাজ করে চলেছেন। যে যার অর্ডারি কাজ। এঁরা সারা বছর কাজ করে চলেন নিবিষ্ট আগ্রহে।

কিন্তু নয়ন দত্ত এখানে কেন? তাঁর স্থান হওয়ার কথা রাজদরবারে, রাজ-শিল্পশালায়। সে রাজাও নেই, রাজদরবারও নেই। প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের বাস এই শুশুনিয়া গ্রামে। আমাদের বিবেচনায়, এই নয়ন দত্তই শ্রেষ্ঠ শিল্পী-সম্মানের রাজমুকুট পরার অধিকারী। কয়েক বছর আগে, ১৯৭৫ সালে, এক বছরের জন্য, মাদ্রাজ থেকে সুন্দরমূর্তি আচার্যের পুত্র এস. দরাইরাজ এসেছিলেন পাথরের সূক্ষ্ম শিল্পকারুকাজ শেখাতে। সরকারী ব্যবস্থাপনায়। তাঁর সুযোগ্য শ্রেষ্ঠ ছাত্র নয়ন দত্ত। এখানে মামাবাড়িতে আবাল্য মানুষ হয়েছেন নয়ন। সূক্ষ্ম কাজের জন্য সঠিক পাথর এই শুশুনিয়া পাহাড়ে পাওয়া যায় না। উড়িষ্যার খিচিং অঞ্চলের সবুজ জলপাই রঙের পাথরের পুরানো 'খরা'-(দেবমন্দিরে প্রসাদ রাখার জন্য পাথরের পাত্র) -ভাঙা দুটি টুকরো-পাথরে তিনি অতি সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকাজ করেছেন। যেমন দশরথের পুত্রশোক। ৩/২ ইঞ্চি পরিমাপের বাঁকা পাথরের কাজটির মূল্য ৭৫০ টাকা। জন্মাষ্টমীর দাম ৭৫০ টাকা, সাইজ ঐ একই। একটি এক ইঞ্চি বৃত্তের খয়েরি 'দুর্গা লকেট' করেছেন যার দাম ১৫০ টাকা। ৭/২ ইঞ্চি আয়তাকার ও ১ ইঞ্চি (এক ইঞ্চি) চওড়া একটি আঙুর রঙের পাথরের চারপাশে নানা মূর্তি ও জালিকার কাজ—কাজের ভিতরে কাজ। অপূর্ব, অনবদ্য! জালিকা, লতাপাতা, দলমাদল কামান, নৌকাবিলাস, শুশুনিয়া

পাহাড়ে সাঁওতালদের বাঁধনা পরব, আদিবাসী রমণী, মদনমোহন, বুদ্ধদেব, শিবদুর্গা, ব্রাহ্মণী, রাসলীলা, কৃষিমজুর, বহুল্যাড়া মন্দিরের তিন দেবমূর্তি, অশোকবনে সীতা প্রভৃতি কাজগুলি ঐ ছোট্ট টুকরো পাথরের মধ্যে করা হয়েছে। বিস্ময় এই কারণেই। এত সূক্ষ্ম ও অন্তর্বর্তী কাজ আছে যে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস চোখে লাগিয়ে দেখলে ভালো হয়। অথচ তরুণ শিল্পী এসব খোদাই করেছেন সরু ছেনি দিয়ে সাদা চোখে। মাত্র দশ বছরের সাধনায় তাঁর এই অসাধারণ সিদ্ধি। আমরা তাঁর এই কাজটি দেখে এসেছি ১৮/১০/৮৪ তারিখে। সরকারী হ্যাণ্ডিক্রাফট অফিসের কল্যাণ দে মশায় শিল্পীকে ঐ পাথরের টুকরোটি উপহার দিয়েছিলেন। সার্থক হয়েছে তাঁর ঐ দান। এ কাজটির বাৎসরিক প্রতিযোগিতার জন্য যাবার কথা।

লাজুক বিনয়ী শিল্পী নয়ন দত্ত ১৯৮১-৮২ সালের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার পান। সেই থেকে পর পর ক'বছর পুরস্কৃত হয়েছেন। পুরস্কার পেয়েছেন ৫00 টাকা। আর মানপত্র পেয়েছেন রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রলয় তালুকদারের কাছ থেকে।

অন্ধকারময় ছোট মাটির ঘর। তার সামনে অপরিসর নড়বড়ে খড়ের চালা। তার সামনে এঁদো পচা পুকুর। তার ওপাশে আদিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের মাঠ। শিল্পী এরকম এক নির্জন স্টুডিওতে বসে কাজ করেন। ভিতরের উঠোন-ঘেরা ঘরে থাকেন তাঁর দুঃখী বৃদ্ধা মা, অথর্ব দিদিমা। নয়ন দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম সারা রাজস্থান জুড়ে উদয়পুরের পাথরের চারুশিল্পকলার কথা। নয়ন দত্ত কী জানেন, তিনি ঐ রাজশিল্পীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন? তিনি কী জানেন, তিনি আমাদের বাঁকুড়ার গৌরব? তিনি কি জানেন, বেজোবাবুর পাথর-ছেঁচা নোড়ার যুগ থেকে তুলে এনে শুশুনিয়া পাথরের শিল্পকলাকে কোন্ স্বর্গ-সুষমায় পেঁছে দিয়েছেন? তিনি হয়তো জানেন না। আমরা বাঁকুড়াবাসীরাই বা কজন জানি নয়ন দত্তকে!

দেব-দেবী বা মানব-মানবীর মূর্তি ছাড়াও এখানে আর কি কি শিল্পবস্তু তৈরি হয় তার একটা প্রায় সামগ্রিক হদিশ প্যাওয়া যায়—বাসস্ট্যান্ডের পাশের দোকান-গুলিতে। নন্দ কর্মকারের দোকানে দেখলাম বিক্রীর জন্য সাজানো আছে নানাবিধ পাথুরে শিল্পদ্রব্য। নানা গড়ন ছাইদানী—মাছের, ময়ূরের, হাঁসের, ব্যাঙের, টিয়া-পাখীর ছাইদানী। আর আছে উর্ধ্বমুখ পদ্মকলি ধূপদানী, চ্যাপ্টা প্রজাপতি ধূপদানী। ছোট ছোট কালো কালো শিবলিঙ্গ। উৎকর্ণ ঘোড়া। জোড়া ময়ূর। গণেশ, কালী, দশহাত দুর্গা, লক্ষ্মীনারায়ণ, বংশীধারী কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-সরস্বতী, বীর হনুমান, বর্ণরঞ্জিত নিতাই-গৌর। আরও আছে দেওয়াল সাজাবার জন্য চ্যাপ্টা দেবদেবী মুখ। ডানামেলা পেঁচা, ফাইটিং বুল, স্ট্যান্ড-সহ প্রদীপ, খলনুড়ি, বেলনচাকি, দলমাদল কামান, পঞ্চরত্ন মন্দির, পাথরের শাঁখ, জলহরি প্রভৃতি।

শুশুনিয়া পাহাড়ের বুকের উপর, চূড়ায় বা অঙ্গে অঙ্গে বা সানুদেশে যেসব পাথর জেগে আছে তা দিয়ে মূর্তিশিল্পের কাজ হয় না। কারণ সেগুলি কঠিন পাথর,

শক্ত। কাজ হয় শ্বেতপাথর অথবা খড়িপাথরে। অবশ্যই সেগুলি অতি নরম বেলেপাথর নয়। সেগুলি ভীষণ কঠিন গ্রানাইট বা লাল মাকড়া পাথরও নয়। তার মাঝামাঝি খড়িপাথর তুলতে হয় পাহাড়ের গায়ে গায়ে মাটির ভিতর থেকে খুঁজে খুঁজে। বয়ে নিম্নভূমিতে এবং ঘরে নিয়ে আসতে হয় পাঁচ-দশজন মজুর দিয়ে কাঁধে করে।

ছেনি বাটালির কাজ শেষ হয়ে গেলে, বড় বড় মূর্তি তৈরি সমাপ্ত হলে, তার উপর চলে রঙ তুলির কাজ। দোকান থেকে কেনা টিনের কৌটোর নামীদামী রঙ দিয়ে রঞ্জিত ও চিত্রিত করা হয় দেবদেবী মূর্তি। সাধারণ ছোট ছোট মূর্তির উপর সাদা তেলরঙ দিয়ে আস্তর করলে চকচকে হয় এবং পাথরের অমসৃণতা, কাটা বা ফাটা ঢাকা পড়ে যায়। রঙ করা মূর্তি, রঙ না করা মূর্তি, দুরকমই পাওয়া যায় এখানে।

সহদেব কর্মকার মৃদু বিষণ্ণ কণ্ঠে বলছিলেন, শুশুনিয়া এখানের মানুষজনের ভরণপোষণ যোগাচ্ছে কাঠ দিয়ে আর পাথর দিয়ে। তাঁর বিষ্ণু কার্যালয়ে এক বছরের জন্য একটা ট্রেনিং সেন্টার খোলা হবে। দশজন ছাত্রকে তিনি শেখাবেন। সরকারী বৃত্তি পাবে ছাত্ররা।

আর বলছিলেন এখানে একটা কো-অপারেটিভ হওয়া দরকার। বিক্রীর জন্য নিয়মিত বাজারও চাই। চৈত্র মাসের বারুণী মেলা আর পৌষ সংক্রান্তির মকরমেলা বসে শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে। শিল্পসামগ্রী বিক্রী হয়। শীত মরসুমে টুরিস্টবাবুরা আসেন পিকনিক করতে। তাঁরাও কিছু কেনেন। এখানে কলকাতার 'কোলে বিস্কুট কোম্পানী'র একটা গেস্টহাউস আছে শাল-মহুয়ায় ছায়ায়। আর ইদানীং তৈরি হয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েতের ছোট গেস্টহাউস। বাঁকুড়া শহর থেকে বাসে আসা যায়—পৌনে এক ঘণ্টায়। দুর্গাপুর স্টেশন থেকেও বাসে সরাসরি আসা যায়।

নয়নাভিরাম শুশুনিয়া পাহাড়, পাহাড়ী নদী গন্ধেশ্বরী, গড়ের পুকুর। পর্বত-গাত্রে সংস্কৃত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে চন্দ্রবর্মার বিখ্যাত শিলালিপি। আর আছে ভৈরব থান এবং নরসিংদেবের মূর্তি। গ্রামের ভিতরে আছেন বাবা ভৈরব। চণ্ডীতলা আর ঈশ্বরীথান। মাছ ধরার বঁড়শি কাঁটা তৈরি হচ্ছে গ্রামের দ্বিতীয় কুটিরশিল্প হিসাবে। খুঁজে পেতে ঢোকরা শিল্পীদের কাজও দেখা যায়। তবু শুশুনিয়ার আধুনিক শিল্পের গৌরব বলতে সহদেব কর্মকার, নন্দন দত্ত, বিশ্বনাথ কর্মকার। নতুন যুগের নতুন তীর্থপথিক তাঁরা। শুশুনিয়া পাহাড়ের বুকের ভিতর থেকে কারণ না জানা এক ক্ষীণ অথচ নিরন্তর জলধারা বেরিয়ে আসছে; পান স্নান চলে। শুশুনিয়া পাথরের আধুনিক শিল্পধারা কিন্তু ক্ষীণ নয় প্রবল থেকে প্রবলতর হতে চলেছে।*

অমিত্র। ১৩৯২

---

*শুশুনিয়া গ্রামসমীক্ষা ও শিল্পসমীক্ষার সময় আমার সঙ্গে ছিলেন ডঃ পংকজ সাহা।

ঢোকরা শিল্পীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ

দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়া যাবার পথে একবার নামুন। দয়া করে নামুন। বিগনা বাসস্টপেজে। ওখানে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখতে পাবেন। পিচ রাস্তার উপর ডান দিকে প্রয়াত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের পোড়ো ভিটা। তারপরে একটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠ। ঐ মঠের পাশ দিয়ে কয়েক পা অগ্রসর হলেই ঢোকরা শিল্পীদের পাড়া। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে দেখিনি। বিশ্বকর্মার কারুশিল্পের কারখানাও দেখিনি। আপনারাও দেখেননি। আপনারা ভিলাই দেখেছেন, বার্ণপুর দেখেছেন, দুর্গাপুর দেখেছেন। জামসেদজী টাটার জামসেদপুর দেখেছেন। কিন্তু ঢোকরা শিল্পীদের কারিগরী দেখেননি। তাই বিগনায় নামতে বলছি। ঢোকরা শিল্প, শিল্পী ও কারখানা দেখবার জন্য। ঢোকরা বা ডোকরা। ও'রা অচ্ছুৎ। কিন্তু আমার কাছে নমস্য। যাঁরা এত সুন্দর সব মূর্তি ও বস্তু নির্মাণ করতে পারেন তাঁরা সর্বকালে সর্বদেশে নমস্য। ও'দের সবাই ছিল যাযাবর। এখন একটু বসতি পেয়েছেন। বেশ কয়েক বছর আগে বাঁকুড়া জেলার স্মল ইণ্ডাস্ট্রি অফিসার পরিমলবাবুর আমলে ওদের জন্য কয়েকখানা পাকা ঘর করে দেওয়া হয়। নামেই পাকা ঘর। আট দশ বছরেই জল পড়ে, দরজাজানালা হীন ঘরগুলোর যা অবস্থা হয়েছে দেখলে বহু দুঃখেও হাসি পায়। এত বঞ্চনা, এত ঠকামি শিল্পীদের ভাগ্যেই কেন জোটে! তবু চোখ ভরে যায়, মন ভরে যায় শিল্পীদের হাতের কাজ দেখলে। তাইতো এত করে বলছি একটু থামুন, একবার নামুন, একবার দেখুন! এ'দের স্মৃতিতে যা আছে। প্রথমে মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ী ও খড়্গপুর অঞ্চল, তারপর বিষ্ণুপুর, তারপর সদর শহর বাঁকুড়ার পাশের এই গাঁয়ে এ'রা বাসা বেঁধেছেন।

আপাততঃ এ'দের যাযাবরত্বের অবসান ঘটেছে। তবে অন্য কোথাও অন্য কোন ধনী ব্যবসার প্রয়োজনে যদি এ'দের নিয়ে যেতে চান, এ'রা কেউ না কেউ অন্য জেলায় যান। কাজকাম সেরে ফিরে আসেন। বিগনায় প্রায় চোদ্দ পনের ঘর শিল্পীর চাকবাঁধা ঘরদোর। ছাপর বা ভাটি। নোংরা উঠোন। তরুণ বটতলা। তুলসী মঞ্চ। দুটি মনসাথান। সাঁড়াশি উখো কাটারি হাতুড়ির ছড়ানো ছিটোনো দৃশ্য। ব্যস্ত বা লাজুক মেয়েদের সহযোগিতা। শিল্পসৃষ্টির পাশাপাশি কোন চুলায় হয়তো ভাতের হাঁড়ি।

কেউ বা দড়ির চৌপায়ায় দিবানিদ্রায় মগ্ন। কিশোর কিশোরীদের হাসি, হে হে। বাচ্চাদেরও সচীৎকার খেলাধুলা। বৃদ্ধদের নির্বিকার কাজ করা ও বিড়ি ফোঁকা।

তারই মধ্যে সামান্য পিতল থেকে, পুরানো ভাঙা পিতলের টুকরো থেকে অসামান্য শিল্পসৌন্দর্য জন্ম নিচ্ছে। আমি মীরা মুখোপাধ্যায়ের স্টুডিও দেখিনি, তিনি ঢোকরা পদ্ধতিতে বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর্য তৈরি করেছেন, কিন্তু বিগনার ঢোকরা শিল্পীদের কাজ দেখেছি সেই বা কম কি ! গত আট দশ বছরের মধ্যে বারবার গিয়ে দেখে এসেছি। আলাপ করেছি। ভালোবেসেছি। ভালোবেসেছি উভয়তঃ শিল্পী ও শিল্পকারুকলাকে। ঢোকরা শিল্পসুষমাকে। কি তৈরি করছেন এঁরা ? হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, পেঁচা, সাপ, মাছ, কচ্ছপ, বাঘ, হরিণ ইত্যাদি। কত রকমের হাতি, ছোট বড়। কত রকমের ঘোড়া। ছোট ছোট ঘোড়া। পক্ষীরাজ ঘোড়া। পেঁচার খুব চল। 'ফেলাট' (Flat) পেঁচা, অর্থাৎ চ্যাপ্টা পেঁচা। দুপায়ে ভর দিয়ে পেঁচারা তৈরি হয়ে বসে আছে। সারি সারি। কারো গায়ে ছাই, কালো কয়লার দাগ। কারো চ্যাপ্টা মুখে গোল গোল চোখের কোণে পিতল নিজের রঙ হারিয়ে একটু যেন সাদা।

শুধুই কি জীবজন্তু তৈরী করেন এঁরা ? তা কেন। আরও অনেক কিছু তৈরি হয়, তৈরি হচ্ছে। গণেশ, কার্তিক, রকমারি লক্ষ্মী প্রতিমা, একক শিব, শিব-পার্বতী, দুর্গা, কালী প্রভৃতির সঙ্গে নানা দেবদেবীর শুধু মুখও এঁরা তৈরী করেন। আদিবাসী নারী ও পুরুষ, বাঁকুড়ার গ্রামীণ মা ও ছেলে এই সব পরিচিত বাস্তব বিষয়ও আছে। পৌরাণিক বিষয়ও কম কি ! রাবণ, যীশু, রাধাকৃষ্ণ, নাড়ুগোপাল —আরও কত কি। বাঁকুড়া জেলা তথা সমগ্র মধ্য রাঢ় জুড়ে মনসাপুজার বহুল প্রচলন। মনসার বারি, মনসার ঘট, মনসার চমৎকার চালি, সর্পভূষণা মনসামূর্তি প্রভৃতি টেরাকোটা শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যেমন দেখতে পাওয়া যায় বাঁকুড়ায় পাঁচমুড়ায় তেমনি পিতলের মনসার বারিঘট তৈরী করেন বিগনার শিল্পীগোষ্ঠী। ভারি সুন্দর দেখতে : পিতলের মাঝারি ঘটের গায়ে তিনদিকে তিনটি সাপের ফণা সাজানো সৌন্দর্য বড় চমৎকার। এখন ঢোকরাদের অ্যাশট্রে বা ছাইদানী খুব চলছে। ফ্ল্যাট প্যাঁচার পরই অ্যাশট্রের বাজার। প্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপ, মশলাদান, আতরদান, কলমদান, লক্ষ্মীভাঁড়, গয়নার বাক্স, পানের ডিবা প্রভৃতি যখন যেমন অর্ডার পান তখন তেমন তৈরি করেন। এঁরা যখন বৃত্তিরক্ষার প্রয়োজনে যাযাবর ছিলেন তখন পাড়ায় গ্রামে গিয়ে তৈরি করতেন মুড়ি বা চাল মাপা কনা বা কুনকে, পালি প্রভৃতি। তেলের পলা, চুঙি, সিঁদুর কৌটা, নৈবেদ্য রেকাবি, ফুলসাজি, ঘৃতপাত্র প্রভৃতিও তৈরি হত। এখনও পুরুলিয়া বাঁকুড়ার অরণ্যসংকুল কৃষিনির্ভর অঞ্চলে যাযাবর ঢোকরা শিল্পীরা কখনও কখনও দেখা দেন। পিতলের অভাবে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে প্রয়োজনীয় গৃহস্থালির ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরি করেন। বিগনার ঢোকরা শিল্পীরা যখন মেদিনীপুর জেলায় ছিলেন তখন তৈরি করতেন মাছধরা জালের কাঠি, নূপুর, গোরুর গলায় পরা ঘাঘর ঘাটি প্রভৃতি। এখন শিল্পধারা কিছুটা পাল্টে গেছে। এখন অনেক সময়েই গভর্নমেন্টের অর্ডারে

অনুযায়ী কাজ করতে হয়। শিল্পীর শখ স্বাধীনতা এখন কম, এখন লোকায়ত শিল্পমানসের কিছুটা অভাব। লোকশিল্পের একটি বড় ধারা ঢোকরা শিল্পেও এখন কিছুটা অর্থকরী মেজাজ। ঐ যে একটি কিশোর ছেলে। গাছতলায় ঠাণ্ডা ছায়ায়। কালো, পাতলা, মাথায় এক মাথা তেলহীন চুল। ওর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কী আশ্চর্য নিপুণতায়, কী অনাবিল আনন্দে ওর আঙুলগুলো কাজ করে যাচ্ছে! ধুনো বা শাল আঠার একটা ছোট তাল ওর হাতে। ওর আঙুলের চারু কৃতিত্বে এক একটি মূর্তিতে পরিণত হচ্ছে। ঐ মূর্তিটার উপর পড়বে নরম কাদা মাটির পুলটিস।

প্রথমে মাটির একটা ছাঁচ তৈরি হবে। সেটাই 'বেস'। তারপর ধুনো বা শাল আঠার আস্তর। ধুনোর অভাবে শাল আঠা। ধুনোকে গুঁড়িয়ে খলায় ভেজে নিয়ে নরম করে তার সঙ্গে সরষের তেল মিশিয়ে নিতে হবে। একে বলে 'ধুনমার'। এই কালো ধুনমারের তাল হাতে নিয়ে অল্প আগুনের আঁচ লাগিয়ে লাগিয়ে আঙুলের টিপে এক একটি শিল্পবস্তুর ছাঁচ তৈরি হয়। এটা ঠাণ্ডা হলে খুব শক্ত হয়ে যায়। তারপর এর উপর 'নুনিয়া মাটির' আস্তর পড়ে। তার উপর আবার 'মোটা মাটির' আস্তর দিতে হবে। শুকনো হলে আর একবার খুব মোটা করে মাটির আস্তর দিতে হবে। এই শেষ তিনটি মাটির আস্তরের উপর এক জায়গায় একটা চুঙ্গির মতো থাকে, যার ফুটো চলে গেছে ভেতর পর্যন্ত। ধুনমারের স্তর পর্যন্ত। এবার প্রয়োজনমতো পিতল ভেঙে টুকরো টুকরো করে ঐ চুঙ্গির মধ্যে দিয়ে চুঙ্গির মুখটা মাটির আস্তর দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। সমগ্র বস্তুটা পড়ে পড়ে শুকোয়। রাশ করে ঘুঁটে পুড়িয়ে আগুন করা হয়। ভাটি। ঐ শুকনো বস্তুটা এবার পোড়াতে দিতে হয়। দু'তিন ঘণ্টা পুড়বে। পিতল গলে গলে ছিদ্রপথে চলে যাবে ধুনমারের ছাঁচ পর্যন্ত। ধুনমার গলে বেরিয়ে যাবে অন্য একটা ছিদ্রপথে। অথবা পুড়ে ছাই হয়ে ধোঁয়া হয়ে উঠে যাবে। ঐ ফাঁকা জায়গায় চারিয়ে যাবে তরল পিতল। এই পদ্ধতিকে পণ্ডিতেরা বলেছেন 'সিরে পারদু' (cire perdue), এই রকম পদ্ধতিতে মূর্তি তৈরি হয় ফরাসী দেশে। সেখানে মোম গলিয়ে। এখানে ধুনো গলিয়ে, শাল আঠা গলিয়ে। ঢোকরা কারিগরদের হাতে মূর্তিগুলো হয় ফাঁপা, হাল্কা, শৌখীন। ধাতুশিল্পের এই রীতির উদ্ভাবন প্রাগৈতিহাসিক যুগে। এখনো চলছে।

দু'তিন ঘণ্টা আগুনে পোড়ানোর পর বস্তুটা বের করে নিতে হয় ভাটি থেকে। এবার ঠাণ্ডা হবার পালা। জল ঢেলেও ঠাণ্ডা করা যায়। ঠাণ্ডা হলে হাতুড়ির ঘা। হাতুড়ির ঘায়ে পোড়ামাটির আস্তর ভেঙে পড়ে। বেরিয়ে আসে শিল্পবস্তুটি। এবারে কাটারি ব্যবহার, উখো ব্যবহার। একটু ঘষামাজা করে নিলেই অদ্ভুত রঙের মনভোলানো শিল্পসামগ্রীর জন্ম শেষ। ঘষামাজা হয় কিন্তু পালিশ তোলা কখনই হয় না। তাই ঢোকরা শিল্পবস্তু অনেকটা আদিম শিল্পকাজের মতো। আদিবাসী অরণ্যবাসীদের গুহাচিত্র বা আফ্রিকান শিল্পবস্তুর কথা মনে পড়বে। উপেন্দ্র

কর্মকার (৭০), অবধূত কর্মকার (৬৫) দেবু কর্মকার, মণ্টু, গৌর, গোপাল, বলাই ধীরেন, যুধিষ্ঠির, চামু প্রভৃতিদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কথা বলুন আর দেখুন কোন ভাটিতে কি পুড়ছে, কোনখানে কোন মূর্তি বেরিয়ে আসছে। উপেন্দ্র দু'বার সরকারী পুরস্কার পেয়েছেন। একবার 'রাবণ' মূর্তির জন্য, অন্যবার ফ্ল্যাট প্যাঁচার জন্য। এঁরই উদ্ভাবনা পেটফাঁপা, জালিকাটা, মাছের পুতুল বড় সুন্দর। চামুও পুরস্কার পেয়েছেন ঘোড়ার জন্য। এঁরাই আপনাকে বলবেন যে নব কর্মকার, ধনু কর্মকার, যুগল কর্মকার এককালে সরকারী পুরস্কার পেয়েছিলেন। উপেন্দ্র এখনও আপনাকে ফ্রেমে বাঁধানো ছোট মানপত্রটি এনে দেখাবেন। দরিদ্র, দুঃখী, শীর্ণ মুখে একবার আনন্দের আভাস দেখতে পাবেন।

বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের ওপাশে প্রায় তিন মাইল দূরের গ্রাম নেৎকামলা। সেখানেও আছে ঢোকরা শিল্পীদের বসত। কিন্তু হতাশ হয়েছিলাম ৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে ওখানে গিয়ে। ও'রা আর কেউ ঢোকরা পিতলের কাজ করেন না। দিনমজুরী করেন, চাষে খাটেন। ঢোকরা পিতলের কাজে পেট চলে না। সেই তুলনায়, বিগনার ঢোকরা শিল্পীরা এখনো ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে আছেন সরকারী সহায়তায় কো-অপারেটিভের মাধ্যমে বিক্রি বাটার ব্যবস্থা করে। বাঁকুড়া সদর শহরের স্কুল ডাঙা পাড়ায়, রাস্তার উপরে, এঁদের অফিস—স্টোররুম। দেশ-বিদেশের বাজারে, নানা প্রদর্শনীতে, শিল্পমেলায় এঁদের শিল্পবস্তু পাঠানো হয়। কিন্তু বিক্রীবাটা ও পাওনা টাকার মধ্যে অসততা, শিল্পীদের বঞ্চিত করছে. করেছে। এঁরাই বলবেন সেসব কাহিনী। এঁরা বড় দরিদ্র, বড় দুঃখী। অনাহারে, অশিক্ষায়, রোগে, অস্বাস্থ্যে এঁরা তবু বেঁচে আছেন। লোকশিল্পের এক উজ্জ্বল ধারাকে বহমান রেখেছেন। তাই বলছি, আপনি এঁদের একবার দেখে আসুন। অন্তর থেকে ধন্যবাদ দিয়ে আসুন। দরদ আর মমতা জানান। কিছু শিল্পবস্তু কিনুন। এঁদের কথা বলুন আপনার বন্ধুবান্ধবদের।*

পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৩

* বিগনার ঢোকরা শিল্পী যুদ্ধ কর্মকার ১৮৮৯-৯০ সালের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে (১৯৮৮-৮৯) সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্পীদের জন্য পুনরায় কয়েকটি গৃহ নির্মিত হয়েছে।

দিগ্বিজয়ী লোকশিল্পের ঘোড়া

ঘোড়াটা নিশ্চয়ই ছিল সুন্দর। কারুকার্যময়। সুবৃহৎ সুবিশাল কাঠের ঘোড়াটাকে না হলে ট্রয়বাসীরা টেনে আনবে কেন নগরের অভ্যন্তরে? গ্রীকরা পরাজিত হয়ে পালিয়েছে (!)। যুদ্ধজয়ের স্মারকচিহ্ন হয়ে উঠেছিল ঐ কাঠের ঘোড়াটা। কিন্তু আমি ভাবি, বারবার ভাবি, কত বড় ছিল ঘোড়াটা—কত বড়? যার পেটের খোলের ভিতরে অতগুলো সৈনিক লুকিয়ে থাকতে পেরেছিল? ঐ কাঠের ঘোড়া অমঙ্গলের সূচনা করেছিল। কিন্তু আমাদের লোকশিল্পের ঘোড়া অমঙ্গলের প্রতীক নয়। মঙ্গলের প্রতীক, সৌন্দর্যের প্রতীক। এবং দিগ্বিজয়ী। রাঢ়-বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া এখন দিগ্বিজয় করে ফিরছে।

দাবা খেলায় ঘোড়ার চাল আড়াই ঘরের চাল। বড় বুদ্ধিনির্ভর হিসাবনিকাশের চাল। ক্ষিপ্র এবং অমোঘ। এক চালেই মাৎ হতে পারে বিপক্ষ। পুরাকালে বঙ্গীয় সৈন্যসজ্জায় 'চতুরঙ্গ' বিন্যাস ছিল। পদাতিক, অশ্ব, নৌ ও গজ সৈন্যের বিন্যাস। অশ্বারোহী রাণা প্রতাপকে নিয়ে সারা রাজস্থানে কত না মূর্তি, কত না চিত্রকল্পনা। চৈতক অমর হয়ে আছে ঘোড়া বলেই। উদয়পুরের বিখ্যাত সিটি-প্যালেস-এ চৈতকের মৃত্যুদৃশ্যের ছবিটি কি ভোলা যায়! ভোলা যায় না চৈতকের মডেল মূর্তিটিও। কলিকাতা-শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ের নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘোড়াটির নাম কি? কেউ কি জানেন? ঐ মূর্তি যখন প্রতিষ্ঠিত হল তখনকার ইতিহাস আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। ফোয়ারার জলের মতো ছুটে বেরোনো লেজটিকে নিয়ে কত ঠাট্টা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। সুনন্দর জার্নালে পর্যন্ত লেখা হল। ঘোড়ার লেজ হলেও শিল্পের বোকামি মানুষ সহ্য করে না। আর সুনীল দাসের তুলিতে ঘোড়া কী অপরূপ রূপছন্দ সৃষ্টি করতে পারে, তা গত দুই দশক ধরে দেখে দেখেও 'নয়ন না তিরপিত ভেল'।

বুদ্ধদেব গেলেন কপিলাবস্তুর রাজগৃহ ছেড়ে। গোপনে রাতের অন্ধকারে। রথ টানছিল তাঁরই প্রিয় ঘোড়া কণ্ঠক। বনপ্রান্ত। রাজবেশ ত্যাগ করে রাজকুমার বিদায় নিলেন। বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করতে পারলো না ঘোড়াটি। কণ্ঠক প্রাণত্যাগ করলো। সমুদ্র মন্থনে উঠেছিল অমৃত। উঠেছিল ঐরাবত। উঠেছিল উচ্চৈঃশ্রবা। সে ঘোড়ার অধিকারী হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। ঘোড়া যেখানে হাতিও সেখানে। শুধু পুরাণকাহিনীতেই নয়। রাঢ়-বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পেও ঘোড়া যেখানে হাতিও সেখানে। টেরাকোটার ঘোড়া, টেরাকোটার হাতি। বাঁকুড়ার ঘোড়ার দিগ্বিজয়যাত্রায় হাতিও কিছুটা সঙ্গ দিয়েছে।

পুরাকালে দিগ্বিজয়ে বার হত অশ্বমেধের ঘোড়া। দেশ জয় করে ঘোড়া রাজগৃহে ফিরে এলে রানীরা ঘোড়াটির সঙ্গে সহবাস করতেন। প্রথা সেই রকমই ছিল। শেষে ঘোড়াটিকে হত্যা করা হত। তার মাংস রান্না করে খাওয়া ও খাওয়ানো হত। মৃৎ-শিল্পের ঘোড়াও দেশজয়ে বার হয় কিন্তু ফেরে না। যে দেশে যায়, সে দেশের মানুষ বাস করে ঐ ঘোড়ার সঙ্গে। সৌন্দর্য আর শিল্প যখন দেশজয় করে তখন রক্তপাত ঘটে না। শুধু মাটির ঘোড়া নয়, কাঠের ঘোড়া এবং ঢোকরা শিল্পের পিতলের ঘোড়াও দেশ জয় করে ফিরছে। ঘোড়ার চারপায়ে নূপুর বাঁধা। বাঁশি বাদ্য-বাজনার তালে ঘোড়া নাচছে। নাচছে সামনের দু'পা তুলে। নাচছে দুলকি চালে। প্রতিযোগিতার মাঠে। পাকিস্তানে। ওস্তাদগুরু ঘোড়াকে তালিম দিচ্ছে। এ দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন। বেনজির এই দৃশ্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আরণ্যক ঘোড়া। তখন ঘোড়ার পায়ে নাকি আঙুল ছিল। খুর নয়। খুর এসেছে অনেক পরে বিবর্তনের ধারায়। ছয়-সাত কোটি বছরের আগের ঘোড়া। ঘোড়াদের আদি প্রজাতি 'ডন' ঘোড়া। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা 'ঘোড়া' নামক কথিকাটি। লিপিকা গ্রন্থে আছে কথিকাটি।

মানুষ আপন স্বার্থসিদ্ধিতে পটু। অরণ্যের প্রাণী আজ তাই গৃহপালিত পশু। ঘোড়ার সামনের দু'পায়ে শক্ত দড়ি বেঁধে দেয়। হুপ্ হুপ্ করে ঘোড়া তখন লাফিয়ে চলে। মুখ নিচু ঘোড়া ঘাস খায়। আর বোধ হয় কাঁদে। তখন ঘোড়া ডুবতে থাকে। রেসের মাঠে মানুষ যখন ঘোড়াকে ছোটায় তখন মানুষ ডোবে। কতদূর ডোবে চোখে দূরবীন লাগিয়েও তা দেখা যায় না। ঘোড়ারোগে ধরলে সহজে ছাড়ে না। দু'পায়ে দড়ি বাঁধা ঘোড়ার মর্মান্তিক গল্পটি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ভাঁড়ারে পঞ্চভূতের মধ্যে ক্ষিতি অপ্ তেজ কম পড়েছিল। তাই মরুৎ ব্যোম্ বেশি করে দিয়ে তৈরি হল দুরন্ত ছুটন্ত ঘোড়া। তখন তার তুরঙ্গম নাম সার্থক। সার্থক নামা তুরঙ্গমকে মানুষ বানিয়েছে হাটুরে ঘোড়া। বেতো পায়ে লটর পটর চলে ধুলো মাড়িয়ে। হাটের বোঝা পিঠে ঝুলিয়ে। ধুলো মাড়িয়ে আর ধুলো উড়িয়ে।

কিন্তু লোকশিল্পের ঘোড়া সব সময়েই জীবন্ত। 'আগাডোম বাগাডোম ঘোড়া-ডোম' ছড়াটা উচ্চারণ করলেই বুকের মধ্যে বাজে টগ্‌বগ্ শব্দ। কারণ এও যে এক ধরনের লোকশিল্পের ঘোড়া। 'সব্বায় ভালাই কর দয়াল মাণিকপীর'—মাণিকপীরের ঘোড়া আসে গৃহস্থের দরজায়। লাল কাপড় কালো কাপড় দিয়ে ঘোড়ার খোল তৈরি। তার পেটে ও পিঠে বড় ফুটো। একটি কিশোর নিজেকে গলিয়ে নেয় সেই ফুটোয়। ঘুরে ঘুরে নাচে আর গায় তালে তালে। পুতুলনাচের খোড়া যেন। 'হাতির পিঠে হাওদা ঘোড়ার পিঠে জিন্ / জল্দি আও জল্দি আও ওয়ারেণ হেস্টিং'। শুনলেই ঘোড়ার তুরন্ত চালটা আর এক সুরে বাজে। সে সুরেও আছে জ্যান্ত ঘোড়ার জীবন্ত ঘোড়ার প্রাণবন্ত ঠমক।

রাঢ়-বাঁকুড়ায় কেন যে এত ঘোড়া তার উত্তর কে দেবে! মনসামাড়ে, চণ্ডীথানে,

লৌকিক দেবদেবীর পীঠে, অভিজাত মন্দিরের গর্ভগৃহে, প্রাচীন মৃৎমন্দিরের টেরাকোটা অশ্বলতায়, পিতলের রথের গায়ে এত ঘোড়া যে গুণে গুণে শেষ করা যাবে না। সমগ্র রাজপুতানায় ঘোড়ার ঘরাণায়, কাংড়া ও মোঘল চিত্রকলায় ও স্থাপত্য মূর্তিতেও এত ঘোড়া নেই। পুরীর মন্দিরের দেওয়ালচিত্রে অদ্ভুত এক কিংবদন্তির ঘোড়া। সেই ঘোড়া আবার আঁকা হয়েছে গোল গঞ্জিফা তাসে। মন্দিরের প্রবেশতোরণে বৃহদাকার পাথুরে ঘোড়া, কোণার্ক মন্দিরের সূর্যরথের ঘোড়া অবশ্য অভিজাত শিল্পের ঘোড়া। তার ঘরাণা আলাদা। আর ঐ সারনাথের ঘোড়া, গুপ্ত যুগের শিল্পনিদর্শন। ওকি ঘোড়া না সিংহ ?? ঘোড়ার মত লম্বা মুখ, অথচ পায়ের থাবা স্পষ্ট। ঘাড়ে কেশর। মাথায় বাঁকানো শিং। জন্তুটির পিঠে বসে আছে তরবারি হাতে মানুষ। হোক সিংহ কিন্তু গড়নটা ঘোড়ার।

এখানে এত ঘোড়া কেন, এই রাঢ়-বাঁকুড়ায়! শুধু বাঁকুড়া কেন, গোটা মধ্য রাঢ়ের ভূমিভাগে লক্ষকোটি ঘোড়ার নিঃশব্দ চলাফেরা। লোকশিল্পের ঘোড়া অর্থাৎ পোড়ামাটির লাল ও কালো রঙের ঘোড়া, ঢোকরা পিতলের সূক্ষ্ম কাজের ঘোড়া, তাজপরানো কাঠের ঘোড়া, মন্দিরগাত্রের সারিবদ্ধ ঘোড়া ও শুশুনিয়া পাহাড়ের পাথরের ঘোড়া। তার মধ্যে পাঁচমুড়োর চালই বিশ্ববিখ্যাত, বিশ্বজয়ী। শিল্পভঙ্গির বিশিষ্টতায় পাঁচমুড়োর ঘোড়াই বাঁকুড়ার ঘোড়া নামে খ্যাত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কটেজ ইনডাস্ট্রির মনোগ্রামে ঐ ঘোড়ার ছবিই গৃহীত হয়েছে। আমেরিকায় জার্মানীতে প্যারিসে রাশিয়ায় অভিজাত গৃহসজ্জায় পাঁচমুড়োর ঘোড়া সাদরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তবে বাঁকুড়ার ঘোড়া মানে শুধুই পাঁচমুড়োর ঘোড়া নয়। বাঁকুড়া জেলারই মধ্যে রাজগ্রাম, স্যান্দরা, মুরলু, সোনামুখী, কেয়াবতী প্রভৃতি অঞ্চলের ঘোড়ার হালচাল, গড়ন পেটন আলাদা আলাদা রকম। বিশ্বপথিক ঘোড়ারা এখানে এসে যেন থমকে দাঁড়িয়েছে পথেপ্রান্তরে নদীতীরে গাছের ছায়ায় মাড়ে মন্দিরে শিল্পবিপণিতে কুমোর পাড়ায়। কত তাদের ঢঙ, কত তাদের রং চং ও অঙ্গবিন্যাস। কত রকম তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গি। কত মার্জনা ও কত প্রকার ছন্দপরিকল্পনা, রীতি ও স্টাইল!

একদিকে সঙ্গীতের ঘরাণা। 'City of art' বিষ্ণুপুরের বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতের ঘরাণা। অন্যদিকে ঘোড়ার ঘরাণা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরকে 'City of art' আখ্যা দিয়েছিলেন। সঙ্গীত ছাড়াও মন্দিরমালা তাঁর চোখে পড়েছিল। কিন্তু টেরাকোটা ঘোড়ার শিল্পসুষমা কি তাঁর চোখে পড়েছিল? ঘোড়ার ঘরাণা ব্যাপারটা কি তিনি জানতেন? পাঁচমুড়োর ঘোড়া বিক্রীর বাজার ইদানীং বিষ্ণুপুর শহর। ওখানে ঘুরে ঘুরেও দেখা যায় কত ছাঁদের ঘোড়া। পা ও কান, লেজ ও গলার কত রকমফের। একই শরীরে কত তালভিন্নতা। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে কালো ও লাল রঙের চলই বেশি। মাটির ঘোড়া সাদা হয় না। এ অঞ্চলে ঘুঘুবেসের ঘোড়াপুতুলের মতো সাদা হয় না।

সাম্প্রতিক কালে লোকশিল্পের অটুট মহিমার উপর খোদকারি করা হচ্ছে। বাজার থেকে কেমিক্যাল রং কিনে আনছে হেটো শিল্পী। কালোর উপর সাদা রঙের ফুলকারি নক্‌শা এঁকে দিচ্ছে। লালের উপর সাদা রঙের আলপনা আর ছোপছাপে ভরিয়ে দিচ্ছে। লোকায়ত শিল্পের সরল অথচ বলিষ্ঠ প্রসাদগুণের উপর বাহাদুরী ফলাচ্ছে শহুরে সফেসটিকেশন্। এ যেন ভাদু টুসু গানের সঙ্গে হারমনিয়াম বেহালা বঙ্গো বাজিয়ে আকাশবাণী থেকে পরিবেশন করার মতো। বেরসিক যা চায় অর্থলুব্ধ বিপণি ব্যবসায়ীরা তাই করছে। সাইনবোর্ড আঁকা রঙ তুলিতে ঘোড়ার শরীর চিত্রিত করাচ্ছে। যে মোটিফ নিয়ে লোকশিল্পী একটি ছাঁদ ও বর্ণ দাঁড় করিয়েছিলেন তা মার খাচ্ছে এইভাবে।

কোণার্কের সূর্যরথের ঘোড়াগুলিকে আপনারা দেখেছেন। উচ্চতায়, আড়ে বহরে, সুনিপুণ অলংকরণে, বক্রগ্রীব দৃপ্ত ভঙ্গিতে, বলিষ্ঠ পৃথুলতায় সেসব ঘোড়া রাজকীয়। ঐ মন্দিরের স্তনভারানতা পৃথুলজঘনা প্রগাঢ়যৌবনবতী নারীদের মতো অশ্বগুলিও যৌবনশক্তিতে ও সৌন্দর্যে গঠিত। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশ-তোরণের ঘোড়াগুলিও যোদ্ধা ঘোড়া, রাজকীয়। এইসব প্রাচীন পাথুরে ঘোড়ার কাছে চাল শেখেনি পাঁচমুড়োর ঘোড়া। উড়িষ্যার খিচিংয়ের রেখদেউলের বা ভুবনেশ্বরের সুবৃহৎ দেউলের অনুকরণে রাঢ়-বাঁকুড়ায় বহু মন্দির নির্মিত হয়েছে। কিন্তু বাঁকুড়ার ঘোড়া নব, অভিনব সৃষ্টি, কোন অনুকৃতি নয়, কোন নকল নির্মাণ নয়। রাজগ্রাম বা স্যান্দরার ঘোড়া সম্বন্ধেও এই ধারণা সত্য।

চার পা খাড়া, সোজা। দুই কান উর্ধ্বমুখী, উৎকর্ণ। গ্রীবা অবক্র। উর্ধ্বমুখী সর্পফণার মতো। লেজ ক্ষুদ্র, বক্রাকার। বক্ষ সুঠাম। উদর কোমর পেলব সুঠাম। এই যে পোড়ামাটির পাঁচমুড়োর ঘোড়া, এ ছুটছে, না দাঁড়িয়ে আছে!? নাকি এখনি ছুট লাগাবে? এর অবয়বে গতি, না আলস্য স্থিরতা? কোন সঠিক উত্তর নেই। ছুটছে বটে, আবার দাঁড়িয়ে আছেও বটে। একই সঙ্গে গতি ও স্থিতির এমন এক আধারে সমন্বয় অদৃষ্টপূর্ব। গতি-স্থিতির ব্যঞ্জনাময় প্রতীক এই ঘোড়া। পাঁচমুড়োর ঘোড়া। কালো বা লাল রঙের ভিন্নতা কোন গড়নভিন্নতা আনেনি। এমন শিল্পকলার উদ্ভাবক কে জানি না। তবে এই ঘোড়াই 'বাঁকুড়ার ঘোড়া' নামে খ্যাত। এই ঘোড়াই বিশ্বজয়ী। এই ঘোড়াই দিগ্বিজয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। উদ্ভাবক যেই হোক, এইসব পোড়ামাটির ঘোড়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন প্রয়াত রাসবিহারী কুম্ভকার।

'National Awards For Master Craftsmen'—যাঁরা লাভ করেছিলেন, ১৯৬৮—৬৯ সালের পুরস্কার, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাসবিহারী। দিল্লীর 'বিজ্ঞান ভবন'-এ প্রেসিডেন্ট জাকির হোসেন নিজের হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দিয়েছিলেন প্রৌঢ় শিল্পীর হাতে। সেই স্মরণীয় তারিখটি হচ্ছে ২৪ জানুয়ারী, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ। তাঁর যোগ্য পুত্র পশুপতি কুম্ভকারও পরবর্তী কালে নানা পুরস্কার

লাভ করেছেন। ১৯৮২ সালে তিনি রাজ্যভিত্তিক প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৮৩ সালে দিল্লীতে Rotary Club আয়োজিত প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হয়েছেন। প্রদর্শনী হয়েছিল প্রগতি ময়দানে। 'Many forms of Mother Clay' হিসাবে অবশ্য শুধু ঘোড়া নয়, ছিল মনসার চালি, হাতি, শংখ ইত্যাদি। সবই পাঁচমুড়ার পোড়া মাটির কাজ। তার মধ্যে ঘোড়ার শিল্প সৌন্দর্য শ্রেষ্ঠ। রাসবিহারীর মানপত্রটি তাঁদের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে। আপনি গেলেও দেখতে পাবেন। রাসবিহারীর ঘরাণা অনুসরণ করে যাচ্ছেন ওখানের মৃৎশিল্পীরা। অবশ্য দু' একজন রকমফের ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। প্রশংসা পাননি।

মধ্যপ্রদেশের বস্তার অঞ্চলের পোড়ামাটির ঘোড়ার সঙ্গে পাঁচমুড়ার ঘোড়ার তুলনা করা যায়। বস্তারের ঘোড়ার সামনের দুই পা সোজা কিন্তু দুই পায়ে দুটি মালাইচাকি উঁচু হয়ে আছে। পিছনের পা ঈষৎ বাঁকা এবং খাড়া। লেজ কুকুরের লেজের মতো দ্বিবক্র। গলা উঁচু, মুখ হাঁ, কান খাড়া, চোখ গোল—দূরের দিকে দৃষ্টি সে চোখে। দেহকাণ্ড ও পর্বসন্ধিতে, গলায় মুখে পল্লবমালার কারুকাজ। পেটের নিচে ঘোড়ার পুরুষাঙ্গ প্রকট। ভালো করে দেখলে মনে হবে ঘোড়াটা এখনি ছুট লাগাবে। প্রতিপক্ষ কুকুরকে আক্রমণ করার জন্য যেমন সাহসী কুকুর টানটান হয়ে দাঁড়ায়, বস্তারের ঘোড়াও তেমনি। অন্তত পুপুল জয়াকার যেমন দেখিয়েছেন।

পাঁচমুড়ার ঘোড়ার কান ও লেজ খুলে নেওয়া যায়। বড় সাইজের ঘোড়ার গলা মুখ দেহকাণ্ড থেকে খুলে নেওয়া যায়। বস্তারের ঘোড়া সম্বন্ধে পুপুল জয়াকার বলেছেন—'To the tribal and village dweller, the horse symbolizes the free, heroic, untrammeled spirit. Offered in groves, the horse is regarded as the gurdian of the trees in the fields and forests.' পাঁচমুড়ার ঘোড়া বা বাঁকুড়ার নানা সাইজ ও প্রকরণের ঘোড়াও দেবতার স্থানে মানতের জন্য, কবরে, পীরের দরগায় দেবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আজকাল গৃহসজ্জার সৌন্দর্য-শোভা বর্ধনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, সমাদৃত হচ্ছে।

বাঁকুড়া সদর শহরের পাশে দ্বারকেশ্বর নদ। তার ওপাশে রাজগ্রাম। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ওখানের কুমোরপাড়ার কলসী হাঁড়ির সঙ্গে, টুসু খলার সঙ্গে যে ঘোড়া তৈরী হয় তার ঘরাণা আলাদা। রাজগ্রামের ঘোড়া সুখী ঘোড়া। গড়ন বাস্তব ঘেঁসা। স্থিতির আদল বেশি বক্রগ্রীব, হ্রস্বপুচ্ছ ঘোড়ায়। সামান্য অলংকৃত। মাটির বুটি দিয়ে গলার কাছে হারের কাজ। একটু ভারি গড়ন। বস্তারের ঘোড়া সব মিলিয়ে balanced বা সুমিত শিল্পসৌন্দর্যের উদাহরণ নয়। রাজগ্রামের ঘোড়া সুমিতিবোধের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অলংকৃত হলেও স্যান্দরার ঘোড়া অনেক বেশি একহারা গড়ন এবং পরিমিতিবোধে বিন্যস্ত। স্যান্দরা বাঁকুড়া সহরের অন্য প্রান্তে অবস্থিত। আমাদের মনে হয়েছে স্যান্দরার ঘোড়ার জন্য অধিক আগ্রহ দেখানো

উচিত, আর্থিক সাহায্যে পুষ্ট করা উচিত। স্যান্দরার ঘোড়ার কমনীয় ভঙ্গি মধুর, উৎকণ্ঠ কিন্তু শান্ত। উজবেকিস্তানের মাটির ঘোড়া রঙিন অলংকৃত, পিঠে বহন করছে মানুষ সওয়ার। লাগাম ধরে আছে দাড়িওয়ালা টুপিমাথা মানুষটি। পোড়ামাটির এই ঘোড়ার লেজ নিম্নমুখী ও স্বাভাবিক। বেশ বোঝা যায় 'পোয়ান' থেকে বার হবার পর আলাদা করে চিত্রিত ও অলংকৃত। পাঁচমুড়ার ঘোড়ার মতো রাজগ্রাম বা স্যান্দরার ঘোড়ার লেজ ও কান খুলে নেওয়া যায় না। এগুলি মূল শরীরের ফিকস্ড।

মুরলুর ঘোড়া ঢ্যাঙা, একানে, লম্বা লম্বা ঠ্যাঙের ঘোড়া। একেবারে আদিম মৃৎপুতুলের আদল ও সারল্য। আঙুলের টিপনিতে তৈরী। হাওড়া জেলার সীতাপুর ঘুঘুবেস গ্রামের চারচাকা লাগানো খেলনা ঘোড়াপুতুলের মতো সরল হলেও গড়ন এক নয়। ঘুঘুবেসের ঘোড়া হাত ও আঙুলের টিপনিতে তৈরী, একটু মোটা দাগের কাজ, কিন্তু পরিমিতিবোধে মণ্ডিত। চুনের পাত্রে ডুবিয়ে ঘুঘুবেসের ঘোড়াকে সাদা করা হয় এবং সাদা ঘোড়ার এখানে ওখানে লাল সবুজ হলুদ রঙের টাচ্ দেওয়া হয়। মুরলুর পোড়ামাটির ঘোড়া পোয়ানে পোড়ানো লাল। বাঁকুড়ার গ্রামেগঞ্জে দেবস্থানে যে সব একানে পুতুলপ্রতিম মানতের ঘোড়া দেখা যায়, মুরলুর ঘোড়া অনেকটা সেইরকম। তবে দৈর্ঘ্যে উচ্চতায় বড়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখার মিউজিয়ামে যে প্রাচীন টেরাকোটা ঘোড়াটি আছে সেটিও দ্রষ্টব্য। কোথা থেকে ঘোড়াটি সংগৃহীত হয়েছে জানা নেই। গড়ন সুঠাম এবং সংহত। বেশ তেজী ঘোড়ার ভাব। শিল্পীর পূর্ণায়ত অচ্যুত দৃষ্টিভঙ্গিটি এই গড়নে ধরা পড়েছে। গ্রীবা বাঁকানো এবং কেশরের কারুকাজ মনোরম। বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটায় পা-ভাগের প্যানেলে যে অশ্বলতা বা ঘোড়ার সারি তা অলংকৃত, শিকারের ঘোড়া, রাজযাত্রার ঘোড়া। তাদের নিজ নিজ অঙ্গে একই ছাঁদ এবং সারিবন্ধ চলাতেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ধারাবাহিক ছন্দ। মন্দিরগাত্র সাজানোর হংসলতা, দশাবতারের মতো অশ্বলতাও একটা বাঁধা মোটিফের অনুসরণ করেছে। কিন্তু যুদ্ধের ঘোড়ার গড়নে দিয়েছে এক নতুন ভঙ্গিমা।

মাটির ঘোড়া ভঙ্গুর। দেশ বিদেশে পাঠাতে অসুবিধা। মাঝপথে প্যাকিংয়ের মধ্যেও ভেঙে যায়। তাই কাঠের ঘোড়ার চল হয়েছে। ২০/২৫ বছর আগে কাঠের ঘোড়া বাঁকুড়ায় চল ছিল না। বাঁকুড়া শহরের রামপুরপাড়ায় পরিমল-বৌদির দোকানে, পদ্মলোচনের ছুতারশালায় অলংকৃত ও চকচকে পালিশ করা কাঠের ঘোড়া তৈরী হতে দেখেছি। দাম বেশি, বাজার ভালো। খুব বড় প্রমাণ সাইজের কাঠের ঘোড়া তিন চার হাজার টাকা দাম। ছোট ছোট ৪/৬ ইঞ্চি সাইজের ঘোড়া, লাল টুকটুকে রঙ, কালো মিশমিশে রঙ, বেশ সুন্দর দেখায়। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে পিঠের তাজ, গলায় কারুকাজ। গলা বেশ উঁচু কাঠের ঘোড়ার ছোট ছোট পায়ের জোড়, ভিন্ন গঠনের কথা বলে, বাঁকুড়ার টেরাকোটা

ঘোড়াদের তুলনায় ভিন্ন। একে ঠিক সহজাত ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প বলা যায় কিনা সন্দেহ। তবে বিদেশী আদিম শিল্পকলার অনুকরণ থাকলেও কাঠের ঘোড়ার সামগ্রিক সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর নিশ্চয়ই।

বাঁকুড়ায় বিরাট সাইজের হাঁদাগঙ্গারাম কাঠের ঘোড়াও আছে। সঠিক অর্থে ঘোড়ার ঘরাণার শিল্পনিদর্শন নয়, বেলিয়াতোড়ের গাজনের ঘোড়া। শিল্পী যামিনী রায়ের জন্মগ্রাম বেলিয়াতোড়ে ধর্মরাজের গাজন বিখ্যাত। ধর্মরাজ, মহাদানা ও স্বরূপনারায়ণ—এই তিন দেবতার জন্য তিনটি ঘোড়া চাই। চার চাকা লাগানো কাঠের ঘোড়া, অন্তত পাঁচটি দাঁড়িয়ে আছে টিনের আটচালায়। এমনি দেখতে কুশ্রী। কিন্তু গাজনের সময় রঙ চড়ে, চোখ আঁকা হয়, কেশ আঁকা হয়। সাজ-পোশাক পরানো হয়। তখন দারুণ লাগে। ধর্মরাজের ঘোড়া তখন মনে এনে দেয় ট্রয়ধ্বংসী ঘোড়ার স্মৃতি। নগ্ন, দীর্ঘপদ, ব্যাদিতমুখ ঘোড়াগুলিকে অন্য সময় দেখতে পাবেন স্থির দাঁড়িয়ে আছে। বালিগঞ্জের যামিনী রায়ের আর্ট গ্যালারিতে বহুবর্ণরঞ্জিত ঘোড়ার ছবিগুলিও মনে করিয়ে দেবে এইসব ঘোড়ার ঘরাণা।

ঢোকরা শিল্পীরা যাযাবর। সরকারী আনুকূল্যে বিগ্না গ্রামে তাদের একটা স্থায়ী বসতি হয়েছে। গন্ধেশ্বরী নদীর ওপারে বিগ্না। বাঁকুড়া শহর থেকে যাওয়া যায়। ঢোকরা শিল্পীদের ঐ পাড়ায় বোংআ হাতি, প্যাঁচা, লক্ষ্মীমূর্তি, সর্পফণা সংযুক্ত বারি ঘট, বাঘমুখ ছাইদানীর ভিড়ে পিতলের ঘোড়াও দেখতে পাবেন। সাজন, গড়ন, স্টাইল, নির্মাণকৌশল সম্পূর্ণ অন্যরকম। মাথা, কান, লাগাম, চোখ, বুক, পা, পিঠ সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অলংকৃত। তবে এ ঘোড়াও উৎকর্ণ ও উৎকণ্ঠ। পা টানটান সোজা। একটু ভারি বা বেঁটে সংহত অবয়ব। এদের ঘোড়ার ঘরাণায় রকমারি আছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার মতো রকমারি।

বনবনানী সবুজ শুশুনিয়া পাহাড়ের পাথরে আজ শিল্পীদের হাত পড়েছে। শুশুনিয়া গ্রামের প্রায় ৫০/৬০ ঘর শিল্পী তৈরী করছেন নানা দেবদেবীর মূর্তি, মানুষের মূর্তি, পারিবারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং শিল্পসম্ভার। তার মধ্যে পাথরের ঘোড়াও আছে। ছোট ছোট পাথরের ঘোড়া শিল্পকর্ম হিসাবে ব্যর্থতার নমুনা নয়। কালচে-সাদা পাথরের ঘোড়া উৎকর্ণ হলেও খুব একটা উর্ধ্বগ্রীব নয়, পা লম্বা লম্বা নয়। বেশ ধরতাই সীমিত গড়ন। এখনো অবশ্য এঁদের নিজস্ব ঘরাণা গড়ে ওঠেনি। অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এঁরা পেয়ে যাবেন এঁদের নিজস্ব শিল্পভাবনা।

রাজা মহারাজা নবাব বাদশাহদের ঘোড়ার যুগ শেষ হয়ে গেছে। আকবরের সাময়িক রাজধানী ফতেপুর সিক্রীতে ঘোড়ার আস্তাবল এখনো অটুট আছে। ঘোড়া নেই। রাঢ়-বাঁকুড়ার অরণ্যে প্রান্তরেও ঘোড়া নেই। স্বাধীন হিন্দুরাজ্য মল্লভূমের রাজধানীতেও আজ আর ঘোড়া নেই। তবু কী আশ্চর্য, অজস্র ঘোড়ার দেখা পাবেন এখানের শহরে গ্রামে মন্দিরে পথে প্রান্তরে। মাটির ঘোড়া, কাঠের ঘোড়া, পাথরের ঘোড়া, পিতলের ঘোড়া। রাঢ় বাঁকুড়ায় এত ঘোড়া কেন ? কেন !!

প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক ও. সি. গাঙ্গুলী বাঁকুড়ার ঘোড়ার শিল্পরূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'এই ঘোড়া সুন্দর ও বলিষ্ঠ যা দেখলে সত্যি একটা তেজী ঘোড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়, যদিও এ ঘোড়ার বাস্তব ঘোড়ার সঙ্গে হুবহু দৃশ্যগত মিল নেই।" আবার তিনিই লোকশিল্পের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছেন—'কিন্তু এই লোকশিল্পের শুধু আকর্ষণীয় রূপটা দেখলেই চলবে না। এর একটি মস্ত অন্তরায়—এতে গতিশীলতার অভাব রয়েছে। একই রূপকে বারবার পুনরাবৃত্তির দ্বারা অনেকখানি perfection-এর দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও—একটা সীমার পর গতিশীলতা (dynamism) হারিয়ে নিছক একঘেয়েমিতে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।' এই উক্তির সংশয়হীন পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে দেখতে পাই পাঁচমুড়ার ঘোড়া একটা perfection-এ পৌঁছেছে। তবে সেখানেই থেমে থাকেনি বাঁকুড়ার লোকশিল্পের ঘোড়ার রূপগত গতি। কাঠের ঘোড়ার ভিন্ন রূপাবয়ব যেমন সে নতুন করে অন্বেষণ করেছে তেমনি বাঁশের ঘোড়ার নতুন রূপাবয়ব ইদানীং অভিনব ও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

এদিকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে কেঞ্জাকুড়ার বাঁশের ঘোড়া। পাকা বাঁশের মোটা চেরাতি তুলে, তা কেটে কেটে এবং পা মুখ লেজ জুড়ে জুড়ে চমৎকার ঘোড়া তৈরী হচ্ছে আজ ৮/১০ বছর ধরে। বাঁশ চেরাতির ঘোড়ার উপর সামান্য রঙের কাজ অবশ্যই থাকছে। এইসব সৌখিন, স্লিম, রঙবাহারি ঘোড়াগুলিও আদর পাচ্ছে গৃহসজ্জায় এবং প্রশংসা অর্জন করছে রূপরসিকের কাছে। বাঁশের ঘোড়া ভঙ্গুর নয় এবং হাল্কা। দূরদূরান্তে পাঠানোর পক্ষেও সুবিধাজনক। বাঁকুড়ার লোকশিল্পের ঘোড়া অবয়ব পরিবর্তন করে এইভাবেই যুগের চাহিদাকে মেটাচ্ছে এবং সৌন্দর্যের অদৃশ্য ডানা মেলে দিগ্বিজয়ে চলেছে। অতীত থেকে আজ পর্যন্ত তার জয়যাত্রা কখনো থামেনি, আশা আছে থামবেও না।*

॥ রচনাকাল ১৯৮৯ ॥

* এই প্রবন্ধটি কোন পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়নি॥

চিঠিপত্রে যামিনী রায়*

যামিনী রায় বাঁকুড়ার সন্তান, বেলিয়াতোড় তাঁর জন্মভূমি। এখানেই তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর পূর্বপুরুষ সুদূর যশোর থেকে এসে মল্লরাজাদের আনুকূল্যে (ব্যলিয়াতোটক, বেলিয়াতোড়) 'বেলেতোড়ে' বসতি স্থাপন করেন। এখানের পুকুরের পাঁক মাটি বা বৃষ্টিসিক্ত ঘরের ছাঁচার মাটি নিয়েই বালক যামিনীরঞ্জন প্রথম মূর্তি গড়ার মহলা দিয়েছেন। এখানের 'পাথুরে রঙ' অর্থাৎ এলামাটি বা গেরিমাটির রঙে রঙ করেছেন কৈশোর চিত্রাবলী। না বলে দুর্গাপুরে গিয়ে জীবনে প্রথম ট্রেন দেখে চিত্র এঁকেছেন, এখানের বিদেশী জেলাশাসক তাঁর চিত্রাবলী দেখে প্রথম পুরস্কৃত করেছেন। এখানে বাঁকুড়ার রাঠী পরিবারে তাঁর আঁকা তৈলচিত্র এখনো টাঙানো আছে। বেলেতোড়ে তাঁর পৈত্রিক বাড়ী এখনো আছে। পরে তাঁর সহৃদয় পিতার আনুকূল্যে কলকাতার আর্ট স্কুলে (বর্তমানে কলেজ) চিত্রবিদ্যা গ্রহণ করতে যান। আমৃত্যু কলকাতার বাসিন্দা হয়ে থাকেন। প্রথম জীবনে ছিলেন বাগবাজারের বাসাবাড়িতে। শেষ জীবনে বালিগঞ্জে ডিহি শ্রীরামপুর লেনে বাড়ি করেন, বিশাল বাড়ি—ব্যক্তিগত বিশাল গ্যালারী সহ।

যামিনী রায় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুভো ঠাকুর, ও. সি. গাঙ্গুলী, দেবীপ্রসাদের মতো আপন অঙ্কন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে, আপন কলাদর্শন (Philosophy of Art) সম্বন্ধে কোন কিছু লেখেননি। যেমন বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখে যাননি শ্রীচৈতন্যদেব।'[১] তাঁর চিত্রাবলীই তাঁর জীবনভাষ্য, এই মৌল বিশ্বাসে অটুট ছিলেন যামিনী রায়। কালিঘাটের পটশিল্প ও রবীন্দ্রচিত্রকলার উপর যামিনী রায়ের যেদুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ বহুপরিচিত সেদুটি তিনি স্বলেখনীতে লেখেননি। আগ্রহী প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে তাঁর বক্তব্যগুলি সংহত করে প্রশ্নকারীই লিখেছিলেন। তাঁর সুভাবিত সুচিন্তিত বেশ কিছু স্মরণীয় বক্তব্য আছে তাঁর চিঠিপত্রে। এইখানেই যামিনী-পত্রাবলীর মধ্যে 'মানুষ' যামিনী রায়কেও আশ্চর্য রূপে ও স্বরূপে চেনা যায়। আমরা মানুষ যামিনী রায়কেই এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে দেখতে পাবো।

---

*যামিনী রায়ের বেশ কিছু চিঠিপত্র প্রবন্ধ-লেখক দীর্ঘ দিনের অন্বেষণে সংগ্রহ করেছেন। সেই পত্রগুলির উপর ভিত্তি করেই বর্তমান প্রবন্ধটি লিখিত। পত্রগুলি সংকলিত হয়েছে লেখকের 'শিল্পী মানুষ যামিনী রায়' (১৯৮০) নামক গ্রন্থে।

১ অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে শ্রীচৈতন্যদেব যে আটটি উপদেশ দিতেন সেই সংস্কৃত 'শিক্ষাষ্টক' কি স্বয়ং চৈতন্যরচিত না চৈতন্যপ্রচারিত ?

পত্রাবলীর মধ্যে মহাপ্রতিভাধরদের ব্যক্তিজীবনের নানা খবর যেমন পাওয়া যায়, তেমনি তাঁদের নিভৃত মানসপ্রকৃতির নিখুঁত উন্মোচন। বিবেকানন্দ, নেতাজী, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত, শেলী, কীটস, অরবিন্দ, রমাঁ রলাঁর যে-সব পত্র আমরা পড়েছি সেখানেই দেখেছি এই দুই কোটির নিদর্শন। যামিনী রায়ের পত্রাবলীও ঐ দুই জীবনকোটির ধর্মবিচ্যুত নয়।

আমরা যে-সব পত্র পেয়েছি সেগুলি সবই কলকাতা থেকে যামিনী রায় লিখেছেন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। অর্থাৎ এগুলি আধুনিক কলকাতা থেকে লিখিত তাঁর শেষ জীবনপর্বের চিঠি। পত্রগুলির কোনটি সৌজন্যমূলক, কোনটি নিছক বৈষয়িক। পত্রগুলি পড়লে মনেই হবে না তিনি একজন জগৎখ্যাত চিত্রশিল্পী। কোন পত্রই কোন অলংকরণ বা রঙীন চিত্রপ্রতীক সজ্জিত নয়।[১] শুধু চোখে পড়ে হাতের লেখার অপূর্ব ছাঁদটি।[২] স্থানীয় খেলার সঙ্গী, জীবন পথের মমতার ভাগী, সুখদুঃখের অংশীদার, আজীবন সৎ বন্ধুদের লেখা পত্রগুলির বিষয় পরিধি সীমায়িত। যেমন কপর্দ্দীশ্বর রায় (বয়স ৮৬ বছর, এখনও জীবিত),* ভবানীচরণ রায়, চারুচন্দ্র দত্তকে তিনি শতাধিক পত্র লিখেছেন। কোন কোন পত্র তাঁদের জমিজমা, দেবায়তন, বাড়িঘর দেখাশোনা করার নায়েব গোমস্তা বা Caretakerকে লিখিত। আর লিখেছেন সর্বাধিক পত্র তাঁর ভগিনী সুজনকুমারী মিত্রকে (তিনিও জীবিত, বয়স প্রায় ৮৪ বছর)।** অল্প বয়সে বিধবা এই দুঃখী অথচ শিল্পী ভগিনীটিকে যামিনী রায় আজীবন দান করেছেন স্নেহচ্ছায়া, আর্থিক উদার সাহায্য।

যামিনী রায় চরিত্রের একটি দিক ছিল রক্ষণশীল। অন্ধ রক্ষণশীলতা নয়, বহু বীক্ষণ, বিচার ও অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐ রক্ষণশীলতার সৌন্দর্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন রক্ষণশীলতার স্বভাবসংহতি ও অপার জীবনীশক্তি। নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী প্রতিকূলতার মধ্যেও যে রক্ষণশীলতা অটুট বেঁচে থাকার শক্তিতে শক্তিমান সেই রক্ষণশীলতা ছিল যামিনী রায়ের। এইভাবেই কলকাতাবাসী হয়েও তিনি আয়ত্তে রেখেছিলেন বাঁকুড়া জেলার সমন্বয়ী

---

১ যেমন দেখা যায় নন্দলাল, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, কমল সাহা, বিশ্বরূপ দত্তের পত্রে।

২ যামিনী রায়ের লেখার ছাঁদের সঙ্গে বসন্তরঞ্জন রায়ের পত্রাক্ষরের ছাঁদের বেশ মিল আছে। উভয়েই ভ্রাতৃ-সম্বন্ধে যুক্ত ও সর্বশ্রদ্ধেয় পুরুষ।

* এই প্রবন্ধ এবং যামিনী বিষয়ক গ্রন্থটি প্রকাশের পর তিনি মারা গেছেন। 'শিল্পী মানুষ যামিনী রায়' গ্রন্থটিতে তাঁর একটি ফটোছবিও দেওয়া হয়েছে।

**সুজনকুমারীও মারা গেছেন।

সংস্কৃতিপ্রবণতাকে।[১] তাই দীর্ঘদিন তৈলচিত্র ও বিদেশধর্মী পোর্ট্রেট অঙ্কনের পর, ভ্যান গগ মাতিস সেজান চিত্রশৈলী চর্চার পর তিনি বাংলা আর্টের মধ্যে মগ্ন হলেন। তাই গভীর সাধনার দ্বারা আঞ্চলিক পটশৈলীকে দিলেন আন্তর্জাতিক শিল্পধর্ম। এই রক্ষণশীলতার ভিতরের ও বাইরের লক্ষণটি বারবার লক্ষ্য করা যায় তাঁর লিখিত পত্রের সম্বোধন অংশে, শেষাংশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়, কুশল জিজ্ঞাসায়, ঠিকানা লেখার মধ্যে। ঠিকানা লেখার রীতি ছিল আমৃত্যু একই ধরণের। যেমন—প্রাপকের ঠিকানা লিখছেন—

শ্রীযুক্ত কপর্দীশ্বর রায়
পোঃ—বেলিয়াতোড়
জেলা—বাঁকুড়া
Beliatore

পত্রের শেষ অংশে ইংরাজী Beliatore লেখার ধরনটি লক্ষনীয়। এটি তাঁর পত্রের সব ঠিকানাতে একই ভাবে এসেছে। যেমন যেখান থেকে পত্র লেখা হয়েছে সে জায়গার আদি মূল নাম 'ডিহি শ্রীরামপুর লেন' পাল্টে গিয়ে বর্তমানে হয়েছে '১৮ বালীগঞ্জ প্লেস ইস্ট', কিন্তু তিনি তাঁর বসতবাড়ীর ঐ মডার্ণ ঠিকানা কখনই তাঁর পত্রশীর্ষে লিখতেন না, আদি ঠিকানাটাই আমৃত্যু লিখেছেন। তাঁর রক্ষণশীলতা কোন সুবিধাবাদী ঠুনকো জিনিস ছিল না। তা ছিল তাঁর আন্তরিক চিৎপ্রকৃতির অনুষঙ্গ। রক্ষণশীলতা ছিল তাঁর প্রাণ, তাঁর অমেয় আত্মা।

ঐ রক্ষণশীলতা যে-সব পরিবারে ভারতীয় জীবনচর্চার নিয়ামক হয়ে আছে সেই-সব পরিবার ছিল তাঁর প্রিয়তর, সেখানেই তিনি মানসসাযুজ্য লাভ করেছেন। বেলিয়াতোড়বাসী জনৈকা বৌদিকে[২] তিনি লিখছেন—

'আপনি একবার এখানে আসার ইচ্ছা করেছেন, ইহা ত পরম আনন্দের কথা। আজ সমস্ত দেশ ও দেশের প্রতি মানুষটি, এমন সভ্যতার ধাপে উঠেছে, যেখানে আত্মীয়তা, আপনজন, দেবদ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধা হারিয়েছে, এ জন্যই ত কষ্ট পাই। আপনি ও পূজনীয় দাদা পূর্বসংস্কার অনেকটা রক্ষা করে চলেন, (নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে) এই জন্যই ত আপনাদের স্থান মাথার উপরে।'

পত্রটি কলকাতা থেকে ২২-৩-৫২ (ইংরাজী) তারিখে লেখা।

পরিচিত পরিবারের সব ছোটবড় ছেলে ও মেয়ের জন্য তাঁর কী গভীর মমতা! সব পত্রেই তাঁদের সংবাদ নিচ্ছেন। যদি কোন পত্রে কারও কথা জিজ্ঞাসা করতে

---

১ 'Bankura District, where Jamini Roy was born, shows the process of revolt and assimilation more intensely than many others in Bengali.' Dr. Mulk Raj Anand.

২ শ্রীমতী দয়াময়ী দেবী (রায়)।

ভুলে যান, সঙ্গে সঙ্গে চিত্ররচনার কঠিন নিয়মশৃংখলার মধ্যেও অবকাশ করে নিয়েছেন পুনরায় একটি পত্র লেখার। যেমন—

'শ্রীচরণেষু পূজনীয়া বৌদিদি

আপনার চিঠিতে কিম্বা সবিতাদিদির চিঠিতে, হিঙ্গনমাতার কথা কিছু লিখি নাই। পরে মনে হল। সকলেরই কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছি, হিঙ্গনমাতার কথা না লিখিলে তার মনে দুঃখ হইবে তাই আজ আবার চিঠি দিলাম। হিঙ্গনমাতাকে আমার আশীর্বাদ দিবেন। নিজের মনের মধ্যেই বেশ সুস্থির হতে পাচ্ছিলাম না। শক্তিমাতার সাবুমাতার খবর দিবেন।...'

পত্রটি ঐ একই ঠিকানা থেকে ৩১-৮-৫৩ খৃষ্টাব্দে লেখা। সুযোগ্য কন্যার বিবাহ দিতে না পারার যে বেদনা সকল পিতৃহৃদয় ভোগ করে সেই বেদনার ভারে যামিনী-হৃদয়ও ভারাক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি লিখছেন—

'তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দ পেলাম। বাণীমাতার বিবাহের কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। পটল এ বিষয়ে খুব উৎসাহী। উপযুক্ত সময়ে ছেলেমেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা না হইলে মা-বাপের মনে যে অস্বস্তি ভোগ করিতে হয় তাহা অনুভব করিতে পারি। আমার সাধ্যমত যাহা করা দরকার নিশ্চয়ই করিব। আমি পটলের জন্য একটা পাত্রীর খোঁজ করিতেছি, ঠিক মতো পাইতেছি না, বড়ই অস্থিরতার মধ্যে রয়েছি। আজকাল ছেলে মেয়ে দুয়ের বিবাহ দায় স্বরূপ। পূর্ব যুগ গত হয়েছে, এই যুগ-সন্ধির, এই রূপই কষ্টদায়ক।' [৯-১২-৫২]

আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মন প্রসন্ন ছিল না। এই শান্তিবাদী শিল্পী, যিনি খাওয়া শোওয়া পোশাক সম্বন্ধে মুনিঋষিতুল্য কৃচ্ছ্রসাধন করে গেছেন, তিনি মদগর্বী সভ্যতার বস্তুবহুল ভোগবহুল কৃত্রিম ও নগ্ন জীবনচর্যাকে কোনদিনই মেনে নিতে পারেননি, মেনে নিতে পারেননি পাশ্চাত্যানুকরণপটু আধুনিক Calcuttan মানসিকতাকে। যেমন মেনে নিতে পারেননি 'idiotic exuberance of the Calcutta art-world'-কে। বৃদ্ধ অপটু শরীরেও তিনি এই যান্ত্রিক, সত্যচ্যুত, যুদ্ধবাজ সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চান। তাঁর মনে আবদ্ধ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরিয়ে আসে তাঁর কোন কোন পত্রে। কোন কোন পত্রে অসহায় যামিনী রায় ধরা পড়েন—তখন শুনতে পাই—'অবশ্য সুস্থ থাকার কথা নয়—বর্তমান সভ্যতার বিষে সকলেই ক্লান্ত। আমার জীবনে ত দুটি তাণ্ডব, একটা গতানুগতিক সংসারধর্ম, অপরটি কর্মজীবন। এত বড় পৃথিবীব্যাপী যে সংগ্রাম চলছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দেহ জীর্ণ তবু এক মুহূর্ত বিশ্রাম নাই।' (২০।৭।৫৫)। আর সব পত্রেরই মূল সুর, সিম্ফনীর মতো বেজেছে, মানবপ্রেমের সুর। প্রীতি ও প্রেমকাঙাল যামিনী রায় লিখছেন—

'প্রিয় কপর্দীশ্বর ভাই—

তোমার চিঠিটী পেয়ে বাড়ীর সকলেই বিশেষ আনন্দিত। তোমার চিঠি সব

সময়েই এমন আন্তরিকতাপূর্ণ, যা অনুভব করে তৃপ্তি পাওয়া যায়, তোমার চরিত্র এমন স্নিগ্ধ বাইরেও তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। কল্যাণীয়া বৌমা বানীমা ও চিতু আমি—সবাইকে নিয়ে তোমাকে মাঝে মাঝে মনে করি। মানুষকে আপন করে পাওয়া, এর মত সৌভাগ্য এবং সম্পদ আর কি আছে! তোমাদের ভালোবাসাই আমার একমাত্র সম্পদ। এর বিনাশ নাই।'

বাঁকুড়ার মন্দির-টেরাকোটা ও চালা-চূড়া মন্দিরের স্থাপত্য, পোড়ামাটি ও পিত্তল শিল্প, দশাবতার তাস ও পাটাচিত্রণ, তক্ষণশিল্প, পুঁথিচিত্রণ, শঙ্খশিল্প, তসর-রেশম-সুতিবস্ত্রশিল্প, জৈন ও বৈষ্ণব মূর্তিকলা, অনুষ্ঠান-ব্রত-আচার আলপনা, চণ্ডী-মনসা ভাদু-তুষু-গাজন গান, রামায়ণ ও সাঁওতালী গান, খৃষ্ট অধ্যুষিত জনমণ্ডলী, আদিবাসী ও তপশীলী হিন্দুসাধারণ, শাল পলাশ মহুয়া পিয়ালের অরণ্যানী, লাঢ়া মাটির রক্তবর্ণিমা—সর্বোপরি বৈষ্ণব ভাব-সমুত্থান ও পৌরাণিক ঐতিহ্যসম্পদ যামিনী রায়কে কতখানি অনুপ্রাণিত, সঞ্জীবিত ও সংস্কৃত করে তুলেছিল সে আলোচনা স্বতন্ত্র গবেষণার দাবী করে। কিন্তু তাঁর আলোচিত পত্রাবলী থেকে বুঝতে পারি বাঁকুড়ার মানুষের সঙ্গে, লোকসংস্কৃতি ও লোকযানের সঙ্গে তাঁর কী গভীর যোগ ছিল। দেব-দ্বিজে ভক্তি, আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আকর্ষণ দুটি বিশ্বযুদ্ধে ব্যথাহত যামিনী রায়ের মন থেকে কোনদিন মুছে যায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমাবর্ষণভীত আপামর কলকাতাবাসীর মতো তিনিও তাড়িত হয়েছেন, কয়েক মাস বা বছরের জন্য ফিরে এসেছেন বেলিয়াতোড়ে। যেমন ফিরে ফিরে আসে ক্রীড়াক্লান্ত স্নেহবুভুক্ষু মানব-সন্তান তার মায়ের কোলে। বার-ব্রত-মেলা-উৎসবের রসে ভর-ভর বাঁকুড়ায় গ্রামীণ জীবনছন্দের আবেগ তাঁর স্মৃতিতে চিরকালই মধুমৎ উৎস সৃষ্টি করেছে। দেবসেবার দায়িত্ব চিরকালই বহন করেছেন, ত্রুটি ঘটলে এইভাবে আক্ষেপ করেছেন—'আজ সুজনের নামে ২০ টাকা পাঠাইলাম, ৺ঠাকুর সেবার জন্য, তোমরা সোমবার পাইবে, টাকা পাঠাইতে দেরী হইল, আমার জ্বর হইয়াছিল। আমার মনেই ছিল না—বরাবর ধারণা আছে, অগ্রহায়ণ মাস হইতে আমার ঠাকুরসেবার পালা পড়ে।' বোন সুজন-কুমারীকে তিনি 'সুজনদিদি' সম্বোধন লিখতেন—তাঁকে একটি Money order কুপনে তিনি লিখেছেন—'বুলুর হাতে তোমার ও সুষমার কাপড় ও মঙ্গলবারের কৌটা ইত্যাদি পাঠিয়েছি। আজ এক শত টাকা আমি পাঠাইলাম। আজ গোকুলের নামে ২্ টাকা পাঠালাম।' যামিনী রায় কোন ধর্মগুরুর কাছে দীক্ষা নেননি, নিত্য প্রভাতে স্নান সেরে নিজেও কোন বিশেষ দেবদেবীর পূজায় বসতেন না। কিন্তু নিজের স্টুডিওতে যেসব রাধাকৃষ্ণ, গণেশজননী, ভোলা মহেশ্বর, লক্ষ্মী-সরস্বতী, রামসীতার স্বরচিত ছবি সাজানো থাকতো সেগুলির নিচে নিত্য ফুল দিতেন পূজারীর নিষ্ঠায়। অতি বিস্ময়কর এই সংবাদ।

আমাদের আলোচ্য পত্রগুলি আপাতদৃষ্টিতে অতিসাধারণ, প্রধানতঃ পোস্টকার্ডে লেখা। কিন্তু সন্নিষ্ঠ সন্ধিৎসু যামিনীপ্রেমিক দেখতে পাবেন এগুলি যেন তাঁর

স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে পত্রাকারে পুষ্প-নিবেদন। হৃদয়পুষ্প। অবনীন্দ্র-নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রতিভা ও চিত্রপরিধির মধ্যে থেকেও যামিনী রায় এই ভাবেই খাঁটি বাঙালী। খাঁটি বাঙালী না হলে বাংলা আর্টের বিজয় বৈজয়ন্তী তিনি ভুবনে ভুবনে এমন সিদ্ধ শিল্পীর মতো উড়িয়ে দিতে পারতেন না।**

লোকশক্তি। ১৯৭৯

** প্রবন্ধে বা পত্রের মধ্যে যে সব নাম ও ডাকনামগুলি লিখিত হয়েছে বাহুল্য ভয়ে তাঁদের পরিচয় দেওয়া হল না। তার জন্য প্রবন্ধটির রসানুভাবনার কোন অসুবিধা হবে না।

কবিতা আন্দোলন ও বাঁকুড়ার কবিগোষ্ঠী

আন্দোলন কথাটা প্রচল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবিতা আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের মতো চীৎকারধর্মী নয়। অণু-পরমাণুর চেইন-রিঅ্যাকশনের মতো কবিতা আন্দোলন ঘটে নিঃশব্দে। কিন্তু ঘটার পর তার প্রকাশ লক্ষকোটি শক্তিসত্তায়। লক্ষকোটি কবিতা প্রকাশে। কবিতার আন্দোলন চলছে সারা বাংলা দেশ জুড়ে। বাঁকুড়া অনুন্নত অবহেলিত বাংলার উদাহরণ হলেও এখানেও আছে কবিতা সম্বন্ধে চিন্তন মনন সংগঠন ও সৃজনের আবেগ অধ্যবসায় ও পারগতা। বাঁকুড়া জেলার ভূমিপরিধি ২৬৫৩ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ। বাঁকুড়া শহর নিতান্তই ছোট শহর। দ্বিতল বাড়ির ছাদে উঠলে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দেখা যায়, যার লোকসংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। অথচ কেবলমাত্র এই শহরটি থেকেই প্রকাশিত হয় অবান্তর, পথের সংগ্রহ, কস্তুরী, বিংশ শতক, সুচেতনা, নিষাদ, বৃশ্চিক, সাতরঙ, মর্মর, নির্ঝর, স্পন্দন, বোধন, অগ্নিসংকলন, অন্বেষা, লুব্ধক, ত্রিশূল, ধ্রুব, উত্তরণ প্রভৃতি ছোটবড় সাহিত্য পত্রিকা। এর মধ্যে সংবাদসেবী পত্রিকাগুলি ও স্মারকপত্রগুলি স্বাভাবিক কারণে ধরা হয়নি। অবশ্য 'বাঁকুড়া হিতৈষী' সংবাদপত্র হলেও শারদ সংখ্যার জন্য সাহিত্যের বড় পরিধিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। ৫/৬ বছর আগেও দেখেছি আনন্দ বাগচী সম্পাদিত 'পারাবত' ছাড়া আর কোন স্মরণীয় পত্রিকা বাঁকুড়ায় ছিল না। এবং 'পারাবত' তখন খুব স্বচ্ছন্দে অসীম সাহিত্য গগনে ডানা মেলে যে উড়তে পারতো তাও নয়, তবে পত্রিকাটির খ্যাতি ছিল, মান নিম্ন ছিল না! মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তুলনা করলে দেখা যাবে কবিতা আন্দোলনের ঢেউ বাঁকুড়ায় লেগেছে কিনা। পূর্ব তালিকার মধ্যে ধরা পড়েনি এমন পত্রিকাও আছে যেগুলি গত বছরও বেঁচে ছিল। বিষ্ণুপুর শহরেও সাম্প্রতিক কালে টেরাকোটা, মুহূর্ত, চেতনা, মরশুম প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকা খেলে বেড়াচ্ছে দুর্দম বেগে। সুবো আচার্য ওখানে আছেন, কিন্তু তাঁর মতো অন্য কেউ এতখানি সর্বজনীন আবেগ কবিতার জন্য কবিতাপ্রেমীর জন্য সঞ্চার করতে পারেননি। সুবো আচার্য হাংরি জেনারেশন কাব্যচিন্তার দলছুট প্রবণতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন না, তিনি তরুণ গোষ্ঠীকে পোক্ত ও প্রয়োজনীয় করে তুলছেন। আনন্দ বাগচী সেদিক থেকে সোচ্চার নন, কিন্তু বাঁকুড়ার কবিরা তাঁর নামের সম্মানেই আত্মপরিচয় দেন। আনন্দ বাগচী এখনও বাঁকুড়ার কবিচূড়ামণি। রবি গঙ্গোপাধ্যায় সুকবি খ্যাতি পেয়েছেন। যেমন খ্যাতি পেয়েছেন বা খ্যাতি চেয়েছেন রূপাই সামন্ত, শান্তি সিংহ, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, জয়ন্ত সাহা, অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, অবনী নাগ, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, দুর্গা

চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিরা। রবি ছাড়া এঁদের প্রত্যেকের এক বা একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নন্দ চোধুরী চলে গেলেন দুর্গাপুরে, দিলীপ পাত্র আসানসোলে এবং শান্তি সিংহ আছেন পুরুলিয়ায়। এঁরা তিন জনই বাঁকুড়ার ছেলে, বাঁকুড়ার তরুণ কবিজনপদের বিশেষ প্রীতি পেয়েছেন। এই আধুনিক কবিতাচর্চায় প্রবীণ কবি বেণু গঙ্গোপাধ্যায় অথবা শ্রীমুন্সীর পরোক্ষ সহযোগিতা আছে। এঁরা অন্তগামী নন, কিন্তু আন্দোলন-উপযোগী নবরূপায়ণ ঘটাতে পারেননি আপন আপন সৃষ্টি-সম্ভার। সর্বোপরি আছেন চারণকবি বৈদ্যনাথ, শুধু চারণ নয়, তিনি আধুনিকোত্তম।

বাঁকুড়া শহরের বাইরে ছোট ছোট ঐতিহ্যপীঠ শহরে যেমন ছাতনা, বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া, ইন্দপুর প্রভৃতি থেকেও পত্রপত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ চলছে। ছাতনা থেকে ভেলা নামে একটি মনোরম পত্রিকা প্রকাশ করেন তরুণ কবি মৃদুল মুখোপাধ্যায়। ইন্দপুর থেকে প্রকাশিত হয় অশনি। বেলবনি থেকে প্রকাশিত হয় সপ্তর্ষি ও চন্দ্রিকা। বেলিয়াতোড় থেকে প্রকাশিত হয় বলাকা। বড়জোড়া থেকে শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন কালকের সূর্য। এর সবগুলিই যে শুদ্ধ কবিতানির্ভর তা নয়। গল্প প্রবন্ধ প্রভৃতির ভিড়ে কবিতার জন্যই এগুলি বেশি জায়গা দেয়, বেশি সজাগ থাকে। সেসব পত্রিকা এক ফর্মারই হোক অথবা এক পেজি ফোল্ডারই হোক। বিশুদ্ধ কবিতা সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়েছে অবান্তর, নিষাদ, ত্রিশূল, কস্তুরী, বলাকা প্রভৃতি পত্রিকা। আর একটি পত্রিকা 'বিংশ শতক' নিছক কবিতার জন্য উৎসগীকৃত, যাব সম্পাদিকা তুলসী চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় তুলসী চট্টোপাধ্যায় ও প্রবীণা রাণু গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া অন্য মহিলা কাব তেমন চোখে পড়ে না। অবান্তব পত্রিকার সম্পাদক সংস্কৃতিকা, সুচেতনা প্রভৃতি পত্রিকাগুলিব সূচনা সম্পাদক ছিলেন এবং এইভাবেই আবেগ অনুপ্রেরণা জানাতে চেয়েছেন বাঁকুড়ার আধুনিক কবিদের। চাকরীর খাতিরে বাঁকুড়ায় এসে উৎপল চক্রবর্তীও এখানের কবিদের মধ্যে সপ্রাণ উৎসাহ সঞ্চার করেছেন।

আধুনিক কবিতা লিখবো, এই মনোভাবের শক্তে ঢেউ তুলে একটি অনুভববেদ্য আন্দোলনের রূপ দিয়েছেন বাঁকুড়ার তরুণরা। কিন্তু সেই ঢেউয়ের বুকে যে আলোর নাচন তা প্রধানতঃ কলকাতা থেকে বিচ্ছুরিত। শক্তি সুনীল গৌরাঙ্গ শান্তনু এবং মণীন্দ্র সুভাষ নীরেন যা করছেন বলছেন তারই শ্রদ্ধেয় অনুসরণ করেছেন এঁরা কেউ কেউ। এঁরা প্রায় সবাই কলকাতায় আত্মপ্রকাশের সাধ রাখেন, সচেষ্ট হন। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখানেও একটি তথাকথিত বামপন্থী কবিগোষ্ঠীর আভাস পাওয়া যায়। যদিও তাঁদের উচ্চারণ ক্ষীণ, খুব ক্ষীণ। ইদানীংকালে আঞ্চলিক কবিতা রচনার ধুয়া তুলেছিলেন কয়েকজন তরুণতম কবি। 'সাম্প্রতিক চারজন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা পায়ের তলায় মাটি রাখতে পারেননি। এঁদের মধ্যে রাজকল্যাণ চেল কিছু ভালো আঞ্চলিক কবিতা লিখেছেন।

বাঁকুড়ার-রাঢ় বাংলার কবিরা এখানের নিসর্গপ্রকৃতির ও মানবপ্রকৃতির স্বতন্ত্র রূপ ও স্বরূপ চোখে দেখেছেন, কবিতার মধ্যে বাণীবন্ধ করেছেন রসময় ব্যঞ্জনায় সচেতন আনন্দে। তাঁদের কেউ কেউ আঞ্চলিক শব্দে সাজিয়েছেন কবিতাকে বেশ সাহসী পারঙ্গমতার সঙ্গে। বাঁকুড়ার কাব্য-অন্দোলনের সবচেয়ে বড় লক্ষণ এর প্রাণময়তা। যে-কেউ যে-কোন একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন তিনিই অনুভব করেন এ সত্য। তাঁর দপ্তরে বহু কবিতার পাণ্ডুলিপি জমা হয়। তার মধ্য থেকে প্রতিশ্রুতিবান লেখনীর আবির্ভাব ধরা পড়ে। বাঁকুড়ার কবিরা কবিতাকে ভালোবাসেন, কবিতার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন এবং কবিতার মধ্যে বেঁচে থাকার অভ্যাস তৈরী করেন, তৈরী করেছেন।

অবশ্য এখানেও একটি ব্যাধির উৎপাত আছে। যাঁরা কবি নন, তাঁরাও কবিতা প্রকাশে লালায়িত হন। যাঁরা সাহিত্য সংস্কৃতির কিছু বোঝেন না তাঁরাও গায়ের জোরে সাহিত্যচর্চার বাজার খোলেন এবং মিটিংয়ে ফেস্টুনে প্রচারে পাকামিতে পাড়া মাত করেন। সংস্কৃত আলংকারিক বলেছিলেন—'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ'। কিন্তু এইসব কাব্যজগতের মত্তগজদের বিতাড়নের কোন উপায়ের কথা বলে যাননি। কোন উপায়ও বোধ হয় নেই॥

অনুভব। ১৯৭৫

বাঁকুড়া জেলার লিটল ম্যাগ : আত্মার সন্ধানে

প্রবণতাটা লক্ষ্য করার মতো। আত্মপ্রকাশের জন্য ছোটবড় অজস্র প্রচেষ্টা। খরাক্লান্ত বাঁকুড়া, দরিদ্র বাঁকুড়া, শস্যে ও আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় অনুন্নত, কিন্তু সংস্কৃতি-চর্চায় নয় মানস সম্পদে নয়। গত দুই দশকের বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রকাশ ও পরিণতি প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রগাঢ় যোগ রেখে এ কথাই মনে হয়েছে যে বাঁকুড়া বাংলা সাহিত্যধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে চেয়েছে এবং সাধ্যমতো তাল রেখে চলছে। গত দুই দশকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে সাহিত্যচর্চা ভিত্তিক লিটিল ম্যাগাজিনের প্রকাশপ্রাচুর্য দেখেই একথা মনে হয়েছে।

মানবধারার মতোই পত্র পত্রিকার ধারা। প্রতি মুহূর্তে কতভাবে কত মানুষ মরছে তবু পৃথিবীব্যাপী মানবধারা অটুট আছে। কারণ প্রতি মুহূর্তে জন্মলাভ করছে অসংখ্য মানুষ। 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে'—খুব সত্য কথা। কিন্তু মৃত্যুর থেকে জন্মের হার সব সময়েই বেশী। এটাই প্রাণধর্মের লক্ষণ। আবার এক-একটি মানবের জন্ম ঘিরে কত আহ্লাদ আনন্দ কত অন্তর্লীন স্বপ্নের বাস্তবায়ন! কত প্রেমফল্গুধারা, কত উচ্চকিত আলাপন। একটি লিটল ম্যাগাজিনের জন্মলগ্ন ঘিরেও তেমনি কয়েকটি তরুণের কখনো বা কজন প্রবীণের স্বপ্ন, সাধনা ও সামর্থের উত্তাল উজ্জীবন। বাঁকুড়া জেলার পত্র-পত্রিকার চলমান ইতিহাসের সঙ্গে আমি সরাসরি যুক্ত আছি প্রায় ১৬ বছর।* দেখেছি গত দুই দশক ধরে ১০০টিরও বেশী পত্র-পত্রিকা এই ছোট্ট বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বাঁকুড়া, কলকাতা থেকে অনেক দূরে, যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুব স্বচ্ছল নয়, তবু কলকাতার সাহিত্য তাপমান থেকে এইসব শুদ্ধ সাহিত্যচর্চা সম্বল পত্র-পত্রিকাগুলি খুব বেশী দূরে নয়।

গত দুই দশকে এত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তবু 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রদীপচন্দ্র বসু লিখিত 'সত্তর দশকে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন' নামক নিবন্ধে (৪৯ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ১৩ মার্চ ১৯৮২) চমৎকার আলোচনার শেষে যে জেলাওয়ারি তালিকা দেওয়া ছিল, সে তালিকায় বাঁকুড়া জেলার মাত্র একটি পত্রিকার নাম ছিল। পত্রিকাটির নাম 'অবান্তর'। মাত্র একটি নাম ?! যদিও পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ার চারটি, মেদিনীপুরের সাতটি, বীরভূমের দুটি, বর্ধমানের চারটি পত্রিকার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছিল। প্রদীপবাবু যে খোঁজখবর করেননি, তা নয়। তাঁর মানসিকতায়

---

* প্রবন্ধটি বিগত ১৯৮৩ সালে রচিত। আজও এই যোগ গভীরতর আছে।

রাঢ় বাংলার সাহিত্য চর্চার প্রতি যে কোন অনীহা ছিল তাও নয়। তাহলে কেন এই রকম ব্যাপার ঘটলো? বেশ কয়েক বছর আগে একাধিক সারা বাংলা কবি সম্মেলনের উদ্যোক্তা শ্রীদীপক দে লিটল ম্যাগাজিনের তালিকা সম্বলিত যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তাতেও বাঁকুড়া জেলার পত্র-পত্রিকার তালিকা ছিল ক্ষীণ। বর্তমানে ডঃ অশোক কুণ্ডু সম্পাদিত 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী'র যে বিশেষ লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ক সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে, সেখানেও বাঁকুড়ার স্থান খুব লক্ষণীয় নয়। কেন?

এই অতি সমীচীন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে যে পত্রিকাগুলি জমে উঠেছে ধীরে ধীরে এবং 'পঞ্চমা'র সম্পাদকের ** অনুরোধে এই প্রবন্ধ লেখার সময়ও যে পত্র-পত্রিকা আসছে তার তালিকা আগে দিই। কোন কোন পত্রিকার একাধিক সংখ্যা থাকলেও মাত্র একটি সংখ্যার প্রকাশ সালই দিলাম এবং পত্র-পত্রিকার নামগুলিকে অক্ষরানুক্রমিক করেও সাজালাম না। এই তালিকার মধ্যে এখনও জীবিত এবং অনেক দিন মৃত—উভয়বিধ নামই আছে। প্রকাশস্থানের নাম ও সম্পাদকের নামও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে দিতে চেষ্টা করছি।

১ শস্য ১৩৭৯-৮০। আধুনিক বাংলা গান বিষয়ক ক্রোড়পত্র। উৎপল চক্রবর্তী। ছান্দাড়।
২ মৌ ১৩৮৫। মধুচক্র পরিচালিত। শম্ভু চট্টোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুর
৩ শীর্ষক ১৩৮৪। গণেশ দে, সুব্রত হোড়। বাঁকুড়া*
৪ পারাবত ১৩৭৬। আনন্দ বাগচী ; অবনী নাগ। বাঁকুড়া
৫ পল্লীপল্লব ? । বেনু গঙ্গোপাধ্যায়। বাঁকুড়া
৬ অনামিকা ১৩৮৫। গৌরীশংকর গাঙ্গুলী। বাঁকুড়া
৭ কস্তুরী জুন ৭৭। জয়ন্ত সাহা। বাঁকুড়া
৮ বিংশ শতক ১৩৮৭। তুলসী চট্টোপাধ্যায়, মাণিক মল্লিক। বাঁকুড়া
৯ ত্রিবেণী ১৩৮৩। মোহন সিংহ। রামহরিপুর
১০ ভেলা ১৩৮০। মৃদুল মুখোপাধ্যায়। ছাতনা
১১ দিব্য ১৯৮০। হীরেন পাল, দ্বিজরাজ সাহানা। খাতড়া, শালবনী
১২ মরুদ্যান ১৩৭৯। রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। কোতুলপুর
১৩ পথের সংগ্রহ ১৯৬৫। ত্রৈমাসিক ছাত্র পত্রিকা। রমাপ্রসাদ পাত্রকর্মকার। বাঁকুড়া
১৪ অভিঃ ১৯৭১। দর্শন বিষয়ক মাসিক। অঞ্জন মহাপাত্র। চিতলতোড়
১৫ সোপান ১৯৭৬। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুর
১৬ দোহার ১৯৮০। বিশ্বরূপ গোস্বামী। গদারডিহি

** তেরপেখিয়া, মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত, সম্পাদক সোফিওর রহমান।

* এখানে 'বাঁকুড়া' বলতে বাঁকুড়া সদর শহরকে বোঝাচ্ছে।

১৭ শ্লোক ১৩৮৬। শেখ হারুণ, অচিন্ত্য কুন্ডু। বিষ্ণুপুর
১৮ কলশ্দাস ১৩৮৬। রাজকল্যাণ চেল, সত্যসাধন চেল। বেলবনী
১৯ খরাভূমি ১৩৮৫। অমলজ্যোতি দাস। বিষ্ণুপুর
২০ উষা ১৩৮৭। শোক সংকলন। গৌরহরি কারক, দেবীদাস মালাকার, বিষ্ণুপুর
২১ জোয়ার ১৯৭৭। অনিরুদ্ধ সাহু। বাঁকুড়া
২২ চিরন্তন ১৩৮৯। বীক্ষণ সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র। পরিমল পাল। বাঁকুড়া
২৩ ছন্দক ১৯৮০। সুরজিৎ দে প্রভৃতি। বিষ্ণুপুর
২৪ নিষাদ ১৩৮৭। রবি গঙ্গোপাধ্যায়। বাঁকুড়া
২৫ প্রতিভা ১৩৮৫। পদ্মলোচন দাস। বাঁকুড়া
২৬ সমাপ্তি ১৩৮৯। পদ্মলোচন দাস। বাঁকুড়া
২৭ দৃষ্টিকোণ ১৩৮২। ঈশ্বর ত্রিপাঠী প্রভৃতি। বাঁকুড়া
২৮ সক্রেটিস ১৯৮০। নন্দ চৌধুরী। ঐ
২৯ কুন্ধস্বর ১৩৮৬। সুব্রত হোড় প্রভৃতি। ঐ
৩০ বৃশ্চিক ১৩৮০। আনন্দ বাগচী প্রভৃতি। ঐ
৩১ সমন্বয় ১৩৮৪। তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুর
৩২ কবির চিঠি ১৯৭৯। মোফিদ আলম। বাঁকুড়া
৩৩ সিসৃক্ষা ?। শৈলেন মুখোপাধ্যায়। বাঁকুড়া
৩৪ যামিনী ১৯৭৮। আশিষ রায়। বেলিয়াতোড়
৩৫ প্রতিভাস ?। বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামসাগর
৩৬ কয়ন ১৩৮৬। অরুণ চক্রবর্তী, জীবন গোস্বামী। বাঁকুড়া
৩৭ শুধু কবিতার জন্য। ?। অসীম মুখোপাধ্যায়। ঐ
৩৮ অবান্তর ১৩৮০। রূপাই সামন্ত। বাঁকুড়া
৩৯ সৌতি ১৯৮১। অশ্বিনী কর। বাঁকুড়া
৪০ জুঁই ১৩৮৯। দিলীপ কুন্ডু। রাজগ্রাম
৪১ সাম ঋক যজু অথর্ব ১৯৮২। কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ বরাট। বাঁকুড়া
৪২ সামপান ১৩৭৬। সমীর কর্মকার, উৎপল মুখোপাধ্যায়। গঙ্গাজলঘাটি
৪৩ কাছাকাছি ১৩৮৭। সজল ঘাটা। বাঁকুড়া
৪৪ তন্বী ১৩৮৭। বিশ্বজিৎ দত্ত। বিষ্ণুপুর
৪৫ আশীর দশক ১৩৭৬। সঞ্জয় সরকার, কবিতা ঘোষাল। বিষ্ণুপুর
৪৬ সপ্তলা ১৯৭৫। আশিস চট্টোপাধ্যায়। বাঁকুড়া
৪৭ বাঁকুড়া সাম্প্রতিক ১৩৮৬। শুভ্র সোম। বাঁকুড়া
৪৮ সংস্কৃতিকা ১৩৭৯। রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। ঐ
৪৯ সৈনিক ১৩৮২। দেবাদিত্য পাল। শালবনী

৫০ ঘাসফুল ১৩৮৫। এনায়েৎ হোসেন খন্দেকার। কোতুলপুর
৫১ মর্মর ১৩৮২। দীপক দে। বাঁকুড়া
৫২ বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি ১৯৮২। শৈলেন দাস। বাঁকুড়া
৫৩ সপ্তদ্বীপা ১৩৮৬। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়। বড়জোড়া
৫৪ সুচেতনা ১৯৭২। জাতীয় নাট্যশালা শতবার্ষিকী সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। বাঁকুড়া
৫৫ অশনি। ?। অশোক মিত্র প্রভৃতি। ইন্দপুর
৫৬ অপাংক্তেয় ১৩৮৪। সুভাষ মণ্ডল। নিয়ামতপুর
৫৭ নির্ঝর। ?। পথিক সাহু। বাঁকুড়া
৫৮ পত্রপল্লব ১৩৮৩। শচীন্দ্র মুখার্জী। বাঁকুড়া
৫৯ শালতোড়া ১৩৭৭। বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়। শালতোড়া
৬০ পদক্ষেপ ১৯৭৫। রাজকুমার রায়। বাঁকুড়া
৬১ অভিনন্দন ১৩৮০। বিবেকানন্দ সিনহা। বাঁকুড়া
৬২ অগ্নি সংকলন ১৯৭৫। সুখেন ঘোষ। বাঁকুড়া
৬৩ মুহূর্ত। ?। তপন মৈত্র। বিষ্ণুপুর
৬৪ ঈথার ১৩৮৪। প্রণব হাজরা। বিষ্ণুপুর
৬৫ সপ্তর্ষি ১৯৭৩। সত্যসাধন চেল। বেলবনী
৬৬ লোকমাতা ১৩৮৪। দুর্গা চট্টোপাধ্যায়। রাজগ্রাম
৬৭ মুকুর ১৯৭৫। স্বপন দত্ত। খাতড়া
৬৮ অন্বেষা ১৯৭৫। রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়া
৬৯ স্পন্দন ১৩৮১। জগন্নাথ দত্ত, নিতাই নাগ। বাঁকুড়া
৭০ প্রান্তিকা ১৩৭৮। তারাপদ দে। গড়গড়িয়া
৭১ শতদল ১৩৮৯। শিবদাস চট্টোপাধ্যায়। জয়পুর
৭২ সৌরভ ১৩৮৮। অদ্বৈত কুণ্ডু। বাঁকুড়া
৭৩ সবুজ স্বাক্ষর ১৩৮১। সবুজ সংঘ। কোতুলপুর
৭৪ হেমলক ১৯৮১। প্রণব চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ চক্রবর্তী। বেলিয়াতোড়
৭৫ রাঢ় পরিবেশ ১৯৮১। নন্দ চৌধুরী। বড়জোড়া
৭৬ নিক্কন ১৩৮৯। সৌমিত্র পাল, সৌমিত্র চ্যাটার্জী। বাঁকুড়া
৭৭ খড়্গ ১৯৭৯। বৈদ্যনাথ পণ্ডিত। বিষ্ণুপুর
৭৮ বিবেক দর্পণ ১৯৭৬। বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল। বাঁকুড়া
৭৯ সুর ১৩৮২। প্রণব চট্টোপাধ্যায় ; আশিস রায়। বেলিয়াতোড়
৮০ অনামী ১৩৮৯। সোমনাথ পৈতণ্ডী, অর্ধেন্দু গোস্বামী। কোতুলপুর
৮১ টেরাকোটা ১৯৮৫। বিনয় মিশ্র। বিষ্ণুপুর

৮২ উষর ১৩৮৮। কিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। গেলিয়া
৮৩ পত্রকার ১৩৭৭। শক্তি লায়েক, সুশীল আঢ্য। বাঁকুড়া
৮৪ লণ্ঠন উষা ১৩৮৯। সচ্চিদানন্দ হালদার প্রভৃতি। সোনামুখী
৮৫ ইউলিসিস ১৩৮৭। ঈশ্বর ত্রিপাঠী। বাঁকুড়া
৮৬ আকাশলীনা ১৯৮২। পংকজ বন্দ্যোপাধ্যায়। মেজিয়া
৮৭ সপ্তার্ণব ১৯৮২। রাজীব হাজরা, ছন্দা ভট্টাচার্য। শালডাঙা
৮৮ মেঘরোদ্দুর। সুব্রত চন্দ্র, তুষার ঘোষাল। বাঁকুড়া
৮৯ কলাকন্যা ১৩৮৯। বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়া
৯০ নীলাভাস। ১৩৮৯। বীক্ষণ সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র। সানবান্ধা
৯১ কাঁড়বাঁশ ১৩৮৮। দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত চন্দ। বাঁকুড়া
৯২ মণিকৌস্তুভ ১৩৮৯। অদ্বৈত কুণ্ডু। ঐ
৯৩ সার্বিক ? । বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ
৯৪ পত্রিকা বাসর ১৩৮৯। দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। ঐ
৯৫ ধ্রুব ? । তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখার্জী। ঐ
৯৬ পরিক্রমা ১৩৮৯। অমর গাঙ্গুলী, মণ্টু দাস। ঐ
৯৭ জলযান ? । প্রশান্ত কুণ্ডু। রাজগ্রাম
৯৮ আতেল ১৯৮১। বিকাশ মণ্ডল। ঐ
৯৯ চালচিত্র ১৯৮১। সতু বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ
১০০ কুসুম হরনাথ ১৩৮৮। সুকুমার নন্দী। ঐ
১০১ পথিকিনী ১৯৭৩। পথিক সাহু। ঐ
১০২ প্রবাল ? । গৌরীশংকর গাঙ্গুলী। ঐ
১০৩ লুব্ধক ১৩৮৮। অমিয়কুমার সেনগুপ্ত। ঐ

এ ছাড়াও অন্যান্য সূত্রে খবর পাওয়া গেছে যে বাঁকুড়া জেলা থেকে শতাব্দীর সূর্য, বকুল, ত্রিশূল, সাতরঙ, চন্দ্রিকা, বলাকা, উত্তরণ, চেতনা, মরশুম, ঘাস মাটি (জয়কৃষ্ণপুর), জোনাকি (হাটকৃষ্ণপুর), অরণ্য লিপি (পিয়ারডোবা), মাটি, স্পন্দন, রেণেসাঁ, ধ্বনি, সমন্বয় (বিষ্ণুপুর), নিশান (ওন্দা), চিকারি (ওন্দা), নবকাকলি (ওন্দা), দীপ শিখা (ওন্দা), জোড়া সাঁকো (পিড়রাবনী), স্বকাল পুরুষ (তিলুড়ি), মম্রি (কোতুলপুর), চণ্ডীদাস (পাটপুর), আর্য (বাঁকুড়া), প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।

'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন ঃ বাঁকুড়া' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে* বাঁকুড়া জেলার সাম্প্রতিক ও প্রাচীন পত্র-পত্রিকার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে দেখতে পাই এই শতাব্দীর প্রায় প্রথম থেকেই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন এখানে হয়েছে। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার দেশবরেণ্য সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি

* তরুণদেব ভট্টাচার্য, ১৯৮২, কলিকাতা, ফার্মা কে এল প্রকাশন

বাঁকুড়ায় পত্র-পত্রিকার অভাব নেই। তাহলে পূর্বে উল্লিখিত প্রদীপচন্দ্র বসুর রচনায় মাত্র একটি পত্রিকার নাম কেন? এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। এর উত্তর খুঁজতে গিয়েই বিশেষভাবে ধরা পড়ে বাঁকুড়ার পত্র-পত্রিকার চরিত্র ও বংশগরিমা।

[২]

বাঁকুড়ায় একটি সাহিত্যপত্র যখন প্রকাশিত হয় তখন কী নিদারুণ হৈ চৈ করেই না প্রকাশিত হয়! সত্তরের দশকের লুব্ধক, সপ্তর্ষি, সোপান, সুচেতনা, শস্য, হেমলক, অপাংক্তেয়, পদক্ষেপ প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশলগ্নের হৈ চৈ আমি নিজে উপভোগ করেছি। কোন কোন পত্রিকা প্রকাশের বিশিষ্ট অনুষ্ঠানেও যোগদান করেছি। কিন্তু পারাবত কোথায় উড়ে গেল, বৃশ্চিক মরে গেল, শস্য যথানিয়মে ঝরে গেল, হেমলক নিজের বিষে নিজেই জর্জরিত হল, লোকমাতা দেহ রাখলেন। তার জন্য দুঃখ হয়েছে। কারণ বাঁকুড়ার ছোটবড় প্রায় সব পত্র-পত্রিকার সঙ্গে আমার আন্তরিক যোগ থাকেই। বাঁকুড়ার সাহিত্যপত্রের থেকে সংবাদপত্রগুলির আয়ু তুলনামূলকভাবে অনেক অনেক বেশী। কারণ তাদের সাংগঠনিক দিকটি থাকে কঠিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থকরী দিক থেকে তাঁরা বিজ্ঞাপনচর্চায় অত্যন্ত পটু। সরকার তাঁদের পৃষ্ঠপোষক, ধনী ব্যবসায়ীরা বা সমাজপতিরাও অর্থ দিয়ে তাঁদের হাতে রাখতে চান। সাংগঠনিক অভাবজনিত উচ্ছ্বাস ও পারস্পরিক মতানৈক্য সাহিত্যপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করে, অকাল বিসর্জন ঘটায়।

সাহিত্যপত্রিকাগুলি কোন্ মানসিকতা নিয়ে প্রকাশিত হয় বাঁকুড়া জেলা থেকে, তার হদিস মিলবে কয়েকটি 'সম্পাদকীয়' অনুসন্ধান করলে। যথা—

পারাবত ১৩৭৫—"দূর মফঃস্বলে, গ্রাম বাংলায় যে সমস্ত অবহেলিত গুণী প্রতিভা অগোচরে বিনষ্ট হচ্ছে, তাঁদের সসম্মানে তুলে ধরা পারাবতের অন্যতম উদ্দেশ্য।"

লোকমাতা ১৩৮৪—"পারস্পরিক প্রীতি ও মৈত্রীর সূত্রেই পত্রিকার পটভূমি। এই পত্রিকা কোন দল বা গোষ্ঠীর ক্রীড়নক নয়। সত্তর দশকের কবি ও লেখকদের নিজস্ব কাগজ। সম্ভাবনাময় কবিচেতনাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় এবং লেখাগুলোকে সঠিক মূল্য দেওয়া হয়।"

অবান্তর ১৩৮০—"অবান্তর আমাদের সেই কল্পনা যার প্রাণমূর্তি আমাদের বুকে বুকে। অবান্তর আমাদের সেই স্বপ্ন যার ব্যর্থতায় আমাদের বুক জ্বলবে। দিনানুদৈনিকতায় আমরা প্রহৃত, তবু দিনাতীত বন্যার ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে দিই। রক্তমাংসের উপকূলে স্বয়ম্ভূ আমরা দুঃসাহসী আমরা অনায়ত্ত আগামীর প্রতিভূ। ভালোবাসার মন্ত্রে হৃদয় আলোড়িত করে আমরা পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। শান্ত শব থেকে নবজাত শিশু পর্যন্ত, ওঁ থেকে এটম্ পর্যন্ত আমাদের ভালোবাসা বাহাদুরী খেলা করবে। সবচেয়ে দুঃসাধ্যের সাধনায় আমাদের সকল সময় ধ্যানমগ্ন। সেই দুঃসাধ্য সাহিত্য!! সাহিত্যের পাখীর

নীড়, সাহিত্যের সমুদ্র, সাহিত্যের বৈশাখী ঝড়, সাহিত্যের দীপদীপ্তি প্রভৃতির জন্য আমরা পণ করেছি।"

সপ্তদ্বীপা ১৩৮৬—"তার চেয়ে আসুন আত্মবিশ্বাসী হই। প্রতিভাকে খণ্ডীকৃত করে অপচয়ের সুযোগ করে দেওয়ার চেয়ে একত্রিত হয়ে তাকে রক্ষা করি। মরীচিকার মোহে না ভুলে চারপাশের প্রান্তরের দিকে তাকাই। অনেক সম্পদ সেখানে ছড়িয়ে যা সংগ্রহ করতে পারলে বাংলাসাহিত্য হয়তো সত্যিকারের সম্পদশালিনী হবে। আমরা অন্যকিছু না পাই অন্তত তৃপ্তি পাবো।"

সপ্তর্ষি ১৯৭৬—"আর নয়। এবার ছুটবো মহানগরীর উপর পা রেখে গ্রামের চৌহদ্দিতে। মহানগরীর মাহাত্ম্য যেমন আছে ঠিক থাক। ক্রমশঃ বয়স বেড়ে যাক। ভয় নেই। পেটের ভিতরে হাত চালিয়ে দাও। দরকার হলে গোপন অঙ্গ ধরে নাড়া দাও। তবু ছুট লাগাও যোজন যোজন ব্যাপী মফঃস্বল গ্রামে। বকখালি থেকে কাকদ্বীপ, হলদিয়া থেকে মেদিনীপুর, নদীয়া থেকে চন্দননগর এমন কি বাঁকুড়া। পুরুলিয়া বর্ধমান সমস্ত মফঃস্বল গ্রাম ও শহরে এই আমাদের দৌড়। তুষু ভাদু থেকে ভাওইয়ার টানে। ছোট ঝুমুর থেকে গম্ভীরায়, বাউল সেরেণ্ড থেকে কোয়ালি গানের দেশে টেনে আনো বাংলা কবিতার নতুন মানচিত্র। এইভাবেই বাঁকুড়াকে আমরা ঘাড় ধরে নিয়ে যাবো দেশে বিদেশে, পরিণত করবো রাজধানীর দুর্ভেদ্য দুর্গে। দেখবো কাদের স্পর্ধা ভেঙে ফেলে আমাদের সাজানো দুর্গকে।"

কাড়বাঁশ ১৩৮৭—"অনেক সাধ্যসাধনা লাফ ঝাঁপের পর বাঁকুড়াতে আমরা একটি মাসিক পত্রিকা কাড়াবাঁশ বের করতে পারলাম। বহুজনে প্রশ্ন রেখেছেন 'কাড়বাঁশ' নামটি নিয়ে। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য—বাঁকুড়া পুরুলিয়ার অধিবাসীদের আঞ্চলিক ভাষায় তীর-ধনুকের নাম 'কাড়বাঁশ'। এই কাড়বাঁশ নিয়েই কুরুক্ষেত্রের মহারণাঙ্গনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সারথি করে অর্জুন লড়াই করেছেন। কাড়বাঁশ শুধু ধ্বংস করে না, সৃষ্টির নেশাও তার আছে। 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'—এই দুটো দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করে বলেই কাড়বাঁশ এত আদরের।'

সার্বিক ১৩৮৭—"সার্বিক, আপনাদের লেখা চায়—রাজনীতি ও অশ্লীলতা বর্জিত, কবিতা বারো লাইন, গল্প অনধিক দুই পৃষ্ঠা, পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠান।"

এইসব সম্পাদকীয় পড়ে বোঝা যায় তরুণদের পত্রিকার থেকে প্রবীণদের পত্রিকার লক্ষ্য স্থির, উদ্দেশ্য অনেক মহৎ। কিন্তু উচ্ছ্বাসপ্রবণ তরুণেরাই পত্রিকাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন তা নয়, প্রবীণেরাই বেঁচে গেছেন তাও নয়। পত্রিকা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে বিশেষ ব্যক্তিনির্ভর। লেখক-সম্পাদকের প্রতিভাশক্তি যাঁর আছে, সংগঠনের সুষ্ঠু মানসিকতা যাঁর আছে, তাঁর পত্রিকাই দীর্ঘায়ু হয়েছে। এই ব্যক্তিনির্ভরতার ফলেই দেখা যায়, এক এক লেখকের এক-একটি নিজস্ব পত্রিকা এবং

অধিকাংশ টিম টিম করে জ্বলছে। প্রকাশমুহূর্তে যেগুলি খুব জোরে জ্বলে উঠেছিল, তাদের নির্বাপণও অকস্মাৎ ঘটেছে, ত্বরান্বিত হয়েছে। এইভাবেই বাঁকুড়া জেলার পত্রিকা প্রকাশধারাটি অব্যাহত রয়েছে। তুলনামূলকভাবে ষাটের দশকের পত্রিকার সংখ্যা বেশী। কারণটা কি 'জরুরী অবস্থার' বাণীরোধ প্রচেষ্টা? হয়তো তাই। রোধের প্রতিক্রিয়ায় প্রবল প্রকাশের প্রচেষ্টা অসংখ্য পত্রিকার জন্মকারণ।

[৩]

আমাদের প্রবন্ধের অন্তর্গত তালিকাভুক্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে নামগত বিশেষ, পার্থক্য আছে। পত্রিকার সাইজ, পৃষ্ঠাসংখ্যা, ছাপাই বাঁধাই, অঙ্গসৌষ্ঠব, প্রচার সংখ্যা এবং মাসিক ত্রৈমাসিক বাৎসরিক ভেদে পত্রিকাগুলিকে ভাগ করা যায়। সর্বোপরি লেখার মান ও নিয়মিত প্রকাশরীতি মেনে চলার ব্যাপারটিও আছে। কোন পত্রিকা এক পৃষ্ঠা বা দু'পৃষ্ঠার ফোল্ডার। কোনটার সাইজ পোস্টকার্ড অথবা তাসের থেকে একটু বড়। প্রায় সব পত্রিকাই অনিয়মিত প্রকাশিত হয়। যদিও পত্রিকার মাথায় বা বুকে প্রকাশ্যভাবে লেখা থাকে মাসিক বা ত্রৈমাসিক। ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক অর্থাৎ বছরে দুটি বা একটিমাত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয় এমন পত্রিকার সংখ্যা কম নয়। আর লেখার মান? সে প্রশ্ন না তোলাই ভালো। তারই মধ্যে বাঁকুড়া-বাসী যেসব লেখকের লেখার যথার্থ ক্ষমতা আছে, তাঁরাই দুহাতে লেখেন বা লিখতে বাধ্য হন, এইসব পত্রিকার জন্য। যেসব পত্রিকার যোগাযোগ ও অর্থসামর্থ আছে, তাঁরা কলকাতাবাসী বা অন্য জেলাবাসী লেখকদের লেখা সংগ্রহ করেন। সংগ্রহ করেন বহু আয়াসে। এইভাবে কোন কোন পত্রিকা প্রেসটিজ বাড়াবার চেষ্টা করেন। অবশ্য বাইরের নামী লেখকদের দামী লেখা কখনই পাওয়া যায় না মফঃস্বলের গ্রামবাংলার পত্রিকার জন্য। বাঁকুড়াও পায় না। যা পাওয়া যায় তা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অথবা চতুর্থ স্তরের লেখা। শুধু নামটা প্রচারের জন্য 'বিজ্ঞাপন' মার্কা লেখা। কোন কোন প্রবাসী বাঁকুড়া-সন্তান লেখা পাঠান জন্মভূমিকে করুণা করে। পত্রিকার গেট আপ, ছাপাই, রুচিশীল সাজানো প্রভৃতি গরিমাময়, নয়ননন্দন অনেক সময়ই হয় না। প্রচ্ছদের ছবি, প্রচ্ছদের কাগজ, ব্লক, বাঁধাই কারিগরী প্রভৃতির উচ্চমান বজায় রাখাও এখানে দুষ্কর। অর্থের অভাব, যোগাযোগের অভাব, শিল্পীর অভাব। উপরন্তু মান-উচ্চ মানসিকতার অভাব। তার থেকেও বড় কথা, বাঁকুড়া জেলায় অনেক ছাপাখানা, বাঁকুড়া শহরেই ত্রিশটির মতো ছাপাখানা। কিন্তু নির্ভুল করে সাহিত্যপত্রিকা ছেপে দেবার পরিশ্রমী বা ওয়াকিবহাল প্রুফরিডিং মনোবৃত্তি ২/১টি ছাপাখানা ছাড়া অন্যের নেই বললেই চলে।

আমাদের তালিকাভুক্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে অধিকাংশই এই আশির দশকের তৃতীয় বছর পর্যন্ত আসেনি। তালিকাভুক্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে শতকরা পাঁচ / ছয় ভাগ পত্রিকাও রেজিস্ট্রিভুক্ত নয়। সরকারী বিজ্ঞাপন শতকরা এক / দুই ভাগ পত্রিকা কখনো সখনো পায়। পাঁচ / দশ / পঁচিশ টাকার বিজ্ঞাপন জোগাড় করে,

পত্রিকার পৃষ্ঠাকে বিজ্ঞাপন কলঙ্কিত করে কিছু পত্রিকা চলে। এবং বেশ কিছু পত্রিকা সম্পাদক-প্রকাশক-শুভানুধ্যায়ীদের পকেট থেকে খরচ করে চালানো হয়। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত। একটি বা দুটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়ে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে এমন পত্রিকার সংখ্যাই বেশি। আবার কোন পত্রিকা ফোল্ডারের দৈন্যদশা থেকে আরম্ভ করে বেশ চোখে পড়ার মতো স্বাস্থ্য অর্জন করেছে; এমন পত্রিকা অঙ্গুলিমেয় হলেও আছে। যেমন গোপান, অনামিকা প্রভৃতি। ভেলা পত্রিকাটিও খুব ক্ষুদ্র গড়নে আরম্ভ হয়ে সাহিত্যরুচি ও স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধ হয়েছিল। বড় সাইজে আরম্ভ করে অনেকেই হালে পানি পায়নি। এখানেও যেন সেই জীবনের নিয়ম—'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে'। আবার দেখা যায়, একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন নামে একই পত্রিকা বার করেছেন। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে। যেমন ঈশ্বর ত্রিপাঠী, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত হোড়, আশিস রায়, গৌরীশংকর গাঙ্গুলী, সুব্রত চন্দ্র প্রভৃতি। একই ব্যক্তি সকল সময়ে বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সহ-সম্পাদক রূপেও যুক্ত থেকেছেন। ফলে কোন পত্রিকারই সম্মান ও সৌভাগ্য লাভ হয়নি। কিছু পত্রিকার সম্পাদক অন্যত্র চলে গেছেন, যার ফলে পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন মৃদুল মুখোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, দিলীপ পাত্র, জয়ন্ত সাহা, সজল ঘাটা, সৌমিত্র পাল, সুভাষ মণ্ডল, শুভ্র সোম প্রভৃতি। কিছু সম্পাদক কলকাতায় বা বাঁকুড়ার বাইরে পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। যেমন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (জুনিয়ার), সুবো আচার্য প্রভৃতি। বিখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও জন্মভূমি বাঁকুড়া থেকে কোন পত্রিকা প্রকাশ করেন নি। বাইরে থেকে অধ্যাপনার সূত্রে এসে আনন্দ বাগচী ষাট-সত্তরের দশকে বাঁকুড়াবাসী ছিলেন—প্রকাশ করেছিলেন পারাবত ও বৃশ্চিক নামে দুটি পত্রিকা। 'প্রথম চোট, দ্বিতীয় দংশন : হুল কথা'—এই রকম শিরোনামায় ফোল্ডার পত্রিকাটি পাঠকের মন কেড়ে নিত। দুটি পত্রিকাই লুপ্ত হয়ে গেছে আনন্দ বাগচীর বাঁকুড়া ত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে। অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোন্দল, আদর্শগত ভেদ অনেক পত্রিকার জন্ম দিয়েছে যেমন তেমনি একটি সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার মৃত্যুর কারণও হয়েছে। যেমন ঈশ্বর ত্রিপাঠীদের গোষ্ঠীর প্রথম পত্রিকা 'অবান্তর'। তারপর এলো 'দৃষ্টিকোণ'। তারপর 'সক্রেটিস'। তারপর 'ইউলিসিস'। তারপর 'নিষাদ'। তারপর 'রাঢ় পরিবেশ'।* পত্রিকাগুলির প্রায় সব কটিই অনিয়মিত প্রকাশ। আর একটি কারণে তালিকাভুক্ত অনেকগুলি পত্রিকা ব্যাঙের ছাতার মতো প্রকাশিত হয়েছে। সে কারণটি হচ্ছে—সম্পাদক হবার বাসনা। লিটল ম্যাগাজিন দেশে গাঁয়ে প্রকাশিত হয় নতুন লেখকদের নব নব প্রকাশ সুযোগ দেবার জন্য। কিন্তু বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর ওন্দা বেলিয়াতোড় প্রভৃতি জায়গায় পত্রিকা বার হয় 'সম্পাদক' হবার জন্য। লিখতে জানেন না, লেখক হতে পারেননি চেষ্টা করেও, তাই সম্পাদক

* অবশ্য রাঢ় পরিবেশ এখনও বেঁচে আছে এবং নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে

হতে চান। নিজের পত্রিকায় নিজের রাবিশ লেখাও ছাপা যায়। পত্রিকা প্রেম নয়, পত্রিকার মান রক্ষা করা নয়, বিজ্ঞাপনঘটিত অসৎ অর্থলোভের সঙ্গে নামের লোভ যুক্ত হয়ে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাদের দশা দশ দশা হবে না তো কি!

এবং ঠিক এইসব কারণেই প্রদীপচন্দ্র বসুর নিবন্ধে একটিমাত্র বাঁকুড়া-প্রকাশিত পত্রিকা তালিকাভুক্ত হয়েছে। বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা তিন চার বছরের আয়ু না পেলে সামগ্রিক বিচারে ও দেশ-কালের গণ্ডী পেরিয়ে চোখে পড়বে কেন? ১৩৮০ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়ে এখনো সগৌরবে চলছে 'অবান্তর' নামক পত্রিকাটি। ইতিমধ্যে কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা যেমন ফুলের কবিতা সংকলন, বন্দেমাতরম্ সংকলন, যামিনী রায় সংখ্যা, কবিতার নারী সংকলনও প্রকাশ করতে পেরেছে।

১৩৮২তে ফুলের কবিতা, ১৩৮৫তে বন্দেমাতরম্ ১৩৮৭তে যামিনী রায়, ১৩৮৯এ কবিতার নারী সংকলন প্রকাশিত হয়। প্রতিটিই যোগ্য ও বৃহৎ সংকলন। প্রতিটি সুপ্রশংসিত।

'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশের প্রবণতা এখানে খুবই কম। প্রথমতঃ অর্থলগ্নীর অভাব ও যোগ্য কল্পনাশক্তির অভাব। সেদিক থেকে শস্য, হেমলক, সোপান, উষা প্রভৃতি পত্রিকা ধন্যবাদের যোগ্য। এঁরা 'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। বাঁকুড়ায় পত্রিকার প্রচারের দিকটিও অবহেলিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যার ফলে সারা বাংলা লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সঙ্গে প্রাণময় সংযোগ হারাচ্ছে বাঁকুড়ার পত্র-পত্রিকা। এখানের কোন পত্রিকাই স্থায়ী গ্রাহক, বিশ্বাসী, নির্ভরশীল গ্রাহক যোগাড় করতে পারেনি। যাঁরা পত্রিকা পড়েন ও কেনেন তাঁরা বাঁকুড়াবাসী হয়েও সবাই, হাঁ সবাই, কলকাতামুখীন। বাঁকুড়া জেলায় পত্র-পত্রিকার জন্মস্রোতটি অব্যাহত আছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য ও আয়ুষ্মান পত্রিকা দুটি / তিনটির বেশী নেই। নিচে কয়েকটি পত্রিকার আয়ুকালের তালিকা দেওয়া হল—

পারাবত—১৯৬৬তে প্রথম প্রকাশ। ১৯৭০তে বন্ধ হয়ে যায়।

লুব্ধক—১৯৭২ সালে প্রকাশিত। এখনও চলছে॥

সুচেতনা—১৩৭৯ সালে প্রকাশিত হয়ে এখনও চলছে॥

সোপান—গত বৎসর (১৯৮২) দশম বর্ষ পূর্তি উৎসব হয়েছে। চলছে॥

অবান্তর—১৩৮০ প্রথম প্রকাশ। এখনও চলছে।

পথের সংগ্রহ—১৯৬৫ সালে প্রথম প্রকাশ 'ছাত্র পত্রিকা'রূপে। এখনও চলছে 'পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকা'রূপে।

কস্তুরী—১৯৭০ ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়ে ১৯৭৭ মে পর্যন্ত চলেছিল। মোট ৬৬টি সংখ্যা, ১৭টি সাইজে বেরিয়েছে।

ভেলা—১৩৭৯তে প্রথম প্রকাশ। ১৩৮৬ পর্যন্ত সগৌরবে চলেছে।

অনামিকা—১৯৭৬ নভেম্বরে প্রথম প্রকাশ। এখনও চলছে।

[৪]

বাঁকুড়ার সব পত্রিকাই প্রায় কবিতা-নির্ভর। বাঁকুড়ার লেখকদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন কবি। শতকরা পাঁচজন প্রাবন্ধিক। শতকরা দুজন গল্পকার, শতকরা একজন নাট্যকার, এবং এক আধ জন সংগীত রচয়িতা। বাকি এক ভাগ অন্যান্য ধরনের লেখক। সম্পূর্ণ একটি উপন্যাস বাঁকুড়ার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—এরকম সংবাদ নেই। পারাবত পত্রিকায় একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে দেখেছি, কিন্তু সেটিও সম্পূর্ণ হয়নি। পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ায় 'ছত্রাক' পত্রিকায় একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এরকম ঘটনা বাঁকুড়ায় ঘটেনি। নাটক ক্বচিৎ প্রকাশিত হয়, প্রধানতঃ একাংক নাটক। ভালো গল্পের চাহিদা আছে। কিন্তু ভালো গল্পের অভাব এত বেশি যে নিজেদেরকে খুবই রিক্ত ও দুর্বল মনে হয়। অবশ্য রচনা চেষ্টার দিক থেকে কবিতার পরই গল্পের স্থান। অমরনাথ দে, নন্দ চৌধুরী, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী গল্প রচয়িতা হিসাবে নাম করেছেন। আনন্দ বাগচী বাঁকুড়ার পত্র-পত্রিকায় গল্প দিতে চাইতেন না। অবশ্য রবি গঙ্গোপাধ্যায়, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, রুপোই সামন্তরা কবিতার ফাঁকে ফাঁকে গল্প লেখেন মুখস্বাদ পাল্টাবার জন্য। বিবেকজ্যোতি মৈত্র, কান্তি হাজরাও এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

বাঁকুড়ার পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধের চর্চা অনুধাবনযোগ্য। এখানে প্রকাশিত প্রবন্ধের মান সুউচ্চ না হলেও একটি লক্ষণীয় মাত্রায় পৌঁছেছে। সম্প্রতি বাঁকুড়ায় সাহিত্যপত্র-পত্রিকায় বাঁকুড়ার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার একটা জোয়ার এসেছে। বাঁকুড়া সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের আধিক্য বাঁকুড়ার প্রবন্ধ সাহিত্যকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। বাঁকুড়ার বাইরে সারা বাংলা ভাষা ও অন্যান্য ভাষার সাহিত্য নিয়ে যে আলোচনা হতে পারে, এঁরা যেন তা বিস্মৃত হয়েছেন। ক্বচিৎ কখনো জীবনানন্দ, রামকিংকর, রবীন্দ্রনাথ, মহাভারত, বেদপুরাণ, ওমর খৈয়াম, অরবিন্দ বিষয়ে আলোচনা চোখে পড়েছে, কিন্তু তার প্রকাশ স্মরণীয় হয়ে থাকেনি। 'সুচেতনা' পত্রিকার প্রকাশকাল থেকেই বাঁকুড়া সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনার জোয়ার এসেছে মনে হয়। সুচেতনা, টেরাকোটা, পারাবত, মুকুর, ত্রিবেণী, রাঢ় পরিবেশ, পথের সংগ্রহ, সৌতি, বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি পত্রিকা এই ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির শারদ সংখ্যা বা বিশেষ কোন সংখ্যায় বাঁকুড়া বিষয়ক প্রবন্ধের প্রকাশ নিয়মিত ঘটে। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পত্রিকাটির নাম 'বাঁকুড়া হিতৈষী শারদ সংখ্যা'।* তাছাড়া হিন্দুবাণী, মল্লভূম, বাঁকুড়াবার্তা, রাঢ় বাঁকুড়া, ইন্দিরা, সরণ প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলির অবদানও কম নয়। শুধু প্রবন্ধের জন্য পত্রিকা ছিল 'দৃষ্টিকোণ'। আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ইউলিসিস, ভেলা, সংস্কৃতিকা, সোপান, লুব্ধক, অপাংক্তেয়,

---

* সম্পাদক—লীলাময় মুখোপাধ্যায়, নতুনচটি বাঁকুড়া।

সুচেতনা, সক্রেটিস, অনামিকা, রাঢ় বাঁকুড়া প্রভৃতি পত্রিকাগুলি গদ্যচর্চায়, প্রবন্ধ প্রকাশে, গ্রন্থ-সমালোচনায় সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে। ইদানীং বাঁকুড়া শহর থেকে হিন্দী / বাংলা দ্বিভাষিক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। নাম—'সংকেত'। স্মারক পত্রগুলিও প্রবন্ধ প্রকাশের স্মরণীয় ক্ষেত্র। বাঁকুড়া জেলা প্রেস ক্লাব, খৃশ্চান কলেজ প্লাটিনাম জয়ন্তী, হাড়মাসড়া পাঠাগার রজতজয়ন্তী, প্রতাপবাগান দুর্গোৎসব, অগ্রগামী নাট্যসংঘ : বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ, বাঁকুড়া পৌরসভা—প্রভৃতি স্মারকপত্রগুলি বিশেষ মূল্যবান।

[৫]

বাঁকুড়ার পত্র পত্রিকায় কবিতাই অনেকখানি অংশ জুড়ে থাকে। এখানেও কবিতার মহামারী চলছে বলা যায়। 'আমরা সবাই কবি যে যার আপন রাজত্বে'—এই রকম একটা ব্যাপার! এখানে রাজত্বের অর্থ 'পত্রিকা' করলেও অসুবিধা নেই। কবিতা লেখা সহজ যাদের কাছে, কবিতা ছাপাও তাদের কাছে সহজ। দেড় ইঞ্চি, সাত ইঞ্চি, খুব জোর এগার ইঞ্চি পরিসর পেলেই কবিরা ধন্য। তাই একটা চারপৃষ্ঠা ফুলস্কেপ ফোল্ডারে সাড়ে সাতচল্লিশখানা কবিতার আবির্ভাব ঘটে। অথবা ছয়খানা কবিতা নিয়েও একটি পত্রিকার 'বিশেষ সংখ্যা' বার হয়। কবিতা সেদিক থেকে অর্থকরী না হলেও অর্থসুরাহাকারী। কম খরচে একটি পত্রিকা করতে হলে কবিতার পত্রিকা করাই বুদ্ধিবিবেচনার কাজ আর আমিও কবি, আমিও সম্পাদক—এই রকম উচ্চভাষ জাহির করতে হলেও হাতে হাতে কবিতার কাগজ প্রচার করাই শ্রেয়!

আর কবিতা লিখলেই, কবিতাপত্র নিয়ে গালভরা হৈ চৈ ছুটোছুটি করলেই, সফল হোক অসফল হোক কবি-সম্মেলন ডাকলেই 'কবিতা-আন্দোলন' হয় না। বাঁকুড়ায় কবিতা-আন্দোলন, বিষ্ণুপুরে কবিতা-আন্দোলন, হাওড়ায় কবিতা-আন্দোলন, কাঁথিতে কি কাকদ্বীপে কি আসানসোলে কবিতা-আন্দোলন এই রকম ব্যাপার স্যাপারের বিষয়ে আমার বিশ্বাস নেই। কবিতা-আন্দোলন ও কবিতা রচনার ঢেউ—এক জিনিস নয়। আধুনিক কবিতার জন্য 'কল্লোল', কালিকলম', 'কবিতার পত্রিকা'র যে উত্তাল নিপুণ সপ্রস্তুত সক্ষম আগ্রহ তা বাঁকুড়ায় কোন কালেই দেখা যায়নি। 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠী থেকে আনন্দ বাগচী এখানে এসে পড়েছিলেন কিন্তু কবিতা-আন্দোলন করেননি। নিকটবর্তী জনকে কবিতা রচনায় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন অবশ্য। বেণু গঙ্গোপাধ্যায়, চারণকবি বৈদ্যনাথ, রবি গঙ্গোপাধ্যায় এঁরা কেউই বাঁকুড়া জেলার নিজস্ব 'কবিতা-আন্দোলন' ইত্যাদির দাবী করেননি। তাই বাঁকুড়া জেলার কবিতা রচনার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ চরিত্র নিয়ে আলাদা আলাদা কোন 'আন্দোলন' হয়েছিল তা আমি মনে করি না।** পূর্বে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দেও আমি এ সম্বন্ধে লিখেছিলাম—"আন্দোলন কথাটা প্রচল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবিতা আন্দোলন রাজনৈতিক

** সত্যসাধন চেল এবং বিশেষ করে চারণকবি বৈদ্যনাথ কবিসম্মেলন করেছেন বিশেষ আগ্রহে, কিন্তু 'সম্মেলন' আর 'আন্দোলন' এক জিনিস নয়।

আন্দোলনের মতো চীৎকারধর্মী নয়। অণু-পরমাণুর চেইন রিঅ্যাকশানের মতো কবিতা-অন্দোলন ঘটে নিঃশব্দে। কিন্তু ঘটার পর যার প্রকাশ লক্ষকোটি শক্তিসত্তায়। লক্ষকোটি কবিতা প্রকাশে। কবিতার আন্দোলন চলছে সারা বাংলাদেশ জুড়ে। বাঁকুড়া অনুন্নত অবহেলিত বাংলার উদাহরণ হলেও এখানেও আছে কবিতা সম্বন্ধে চিন্তন মনন সংগঠন ও সৃজনের আবেগ অধ্যবসায় ও পারগতা।"* আজও এই একই কথা বলি। কলকাতা কবিতার ক্ষেত্রে যা করছে তার অন্ধ অনুসরণ নয়। তারই অনুপ্রেরণায় এখান থেকে নিছক কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে হচ্ছে; কবি সম্মেলনও হয়েছে** হচ্ছে এবং হবে।

তাই পুনরায় বিনীতভাবে বলি, বাঁকুড়া জেলায় স্বতন্ত্র, তির্যক এবং কলকাতা থেকে ভিন্নমুখী কবিতা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এমন বলা যায় না। আদি-মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী সৃষ্টিক্ষেত্রে যেমন বড়ু চণ্ডীদাস, মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে যেমন রামাই পণ্ডিত, রামায়ণ রচনার ক্ষেত্রে যেমন জগৎরাম, তেমনি আধুনিক কবিতা রচনার উৎসাহে উৎসাহিত বাঁকুড়ার কবিরাও এসেছেন ঐতিহাসিক উজ্জীবনের নিয়মে।

মাণিকলাল সিংহ এককালে কবিতা লিখতেন, এখন লোকসংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করেছেন ও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। পরলোকগত বেণু গঙ্গোপাধ্যায় গত দুই দশকে প্রবীণ কবিদের মধ্যমণিরূপে বিরাজ করেছেন। চারণকবি বৈদ্যনাথ বিষ্ণুপুরের তথা বাঁকুড়ার মাটি মানুষ প্রভৃতির চারণগাথা রচনা করেছেন, বৃহত্তর বাংলা ও ভারতবর্ষের কথা বলেছেন গানে ও কবিতায় যথার্থ চারণকবির পারঙ্গম শক্তিপ্রতিভা নিয়ে। তাঁর উত্তরসূরী কেউ নেই বাঁকুড়ায়। আধুনিক কবিতা অন্দোলনের সঙ্গেও তিনি সৃষ্টিশীলভাবে যুক্ত। আনন্দ বাগচী এসেছিলেন ও চলে গেছেন। বাঁকুড়ায় রেখে গেছেন কবিতার ঐতিহ্য ও সার্থক শিষ্য। রবি গঙ্গোপাধ্যয়ের আগে এসেছেন সুবো আচার্য, পরে এসেছেন ঈশ্বর ত্রিপাঠী। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে যাদের যাত্রা শুরু তাঁদের মধ্যে আছেন অবনী নাগও। বিদেশাগত উৎপল চক্রবর্তী এখনও বাঁকুড়ায় আছেন। বাঁকুড়ার বাইরে চলে গেছেন শ্রীমুন্সী, আরতি দত্ত, প্রভাত চৌধুরী ও শান্তি সিংহ। রূপাই সামন্ত ষাটের দশকের শেষ থেকে যথাযথ শুরু করেছেন বাঁকুড়ায় অধ্যাপনার সূত্রে এসে। তারপর নন্দ চৌধুরী, তুলসী চট্টোপাধ্যায়, শান্তি রায়, অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়,

* 'কবিতা আন্দোলন ও বাঁকুড়ার কবিগোষ্ঠী' (প্রবন্ধ), পৃঃ ১৩, অনুভব (কবিতার মাসিক), সম্পাদক জয়ন্তকুমার, জানুয়ারী ১৯৭৫ সংখ্যা।

** 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ'-এর তরফ থেকে 'সুচেতনা' গোষ্ঠী নিয়মিত কবি সম্মেলন করেন। ছান্দাড় 'অভিব্যক্তি' শিল্পী গোষ্ঠী, সপ্তর্ষি পত্রিকা, রাঢ় পরিবেশ পত্রিকাও কবি সম্মেলন করেন। ইদানীং (১৯৮৮-১৯৯০) 'চিন্তাভাবনা' পত্রিকা বা 'গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সম্মেলন'ও কবি সম্মেলনের আয়োজন করে চলেছেন।

দিলীপ পাত্র, মৃদুল মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, অমিয় সেনগুপ্ত, রাজকল্যাণ চেল, জয়ন্ত সাহা, হীরেন পাল এঁরা সকলেই বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্থান থেকে লিখেছেন, খ্যাতি অর্জন করেছেন। সত্তর দশকের প্রথম থেকে এঁরা সপ্রাণ সৃষ্টি-প্রেরণায় আছেন। একেবারে তরুণদের মধ্যে এসে পড়েছেন—সুব্রত হোড়, গৌরী-শংকর গাঙ্গুলী, মোফিদ আলম, সজল ঘাটা, অশোক চট্টোপাধ্যায়, আশিস রায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মণ্ডল, চন্দন চৌধুরী, সুব্রত চন্দ, সৌমিত্র পাল, পরিমল পাল প্রভৃতিরা। এবং এসেছেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। চারণকবি বৈদ্যনাথের পুত্র স্বপন, চারণকবির ঐতিহ্য অনুসরণ করেননি। কিন্তু গত ১০/১১ বছর ধরে বিষ্ণুপুর থেকে কবিতা রচনা, সম্মেলন* পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের উদ্যমে এমন সনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত ; যা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। আর প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই কুড়িয়ে নিয়েছেন সত্যসাধন চেল—ঐ একই কায়দায় রাজ, সত্য ও সুব্রত চেল এঁরাও একটি কবিতার ঘরানা তৈরী করেছেন বৈদ্যনাথ-স্বপনের মতো। গত দুই দশকের বাঁকুড়ার কবিদের রচনা বৈশিষ্ট্যের খোঁজ নিলে দেখা যাবে, আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে তাঁদের দান খুব একটা ফেলনা নয়। লুব্ধক, নিষাদ, ত্রিবেণী, অবান্তর, সোপান, পল্লীপল্লব, কস্তুরী, অনামিকা, কবির চিঠি, পদক্ষেপ, সপ্তর্ষি, নিক্কণ প্রভৃতি পত্রিকা-গুলি কবিতাকে বড় ভালোবেসেছে। কবিতার সঙ্গে আলোচনার সমাবেশ ঘটিয়েছে। সত্তর এবং ষাটের দশকের অন্তত পনের জন কবির একাধিক কাব্যগ্রন্থ আছে এবং প্রশংসা অর্জন করেছে।

বাঁকুড়া জেলায় সত্তর দশকে আঞ্চলিক ভাষায় অর্থাৎ বাঁকুড়ি ভাষায় কবিতা লেখার একটা উদ্যমী প্রবণতা এসেছিল। রাজকল্যাণ চেল, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় এই ধরনের কবিতা রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এখনও কোন কোন আবৃত্তিশিল্পীর কণ্ঠে যেমন পার্থ ঘোষ (কলকাতা) পার্থ কুণ্ডুর (বাঁকুড়া) কণ্ঠে বাঁকুড়ি ভাষার কবিতা সময় সুযোগ মত শোনা যায়। আঞ্চলিক কবিতা একটা স্বাদবদলের কাজ করেছিল।

আলোচনার সমাপ্তিতে আমরা পাঁচটি পত্রিকার নাম ঠিকানা তুলে ধরছি, আলাদা করে, যেগুলি এখনো সগৌরবে চলছে—

১ সোপান : স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণগঞ্জ, পোঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।
২ অবান্তর : রূপাই সামন্ত, স্কুলডাঙা, পোঃ জেঃ—বাঁকুড়া।
৩ লুব্ধক : অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, বি-এস-মেডিক্যাল কলেজ, বাঁকুড়া।
৪ অনামিকা : গৌরীশংকর গাঙ্গুলী, C/o গৌতম স্বরাজ, প্রতাপবাগান বাঁকুড়া।
৫ সপ্তর্ষি : সত্যসাধন চেল, বেলবনী, পোঃ—ধবনী, বাঁকুড়া।

শারদীয়া পঞ্চমা। ১৯৮৩

* সাহিত্যসভা, কবি সম্মেলন, রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন, বিশেষ কবি সম্বর্ধনা ইত্যাদি নিয়মিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের সাহিত্যচর্চা চেতনাকে সবিশেষ সজাগ রেখেছেন। কালীপূজা উপলক্ষে কবি সম্মেলনও স্মরণীয়।